তুমি আমাদের দিয়ে গেছো স্বাধীনতা,
সে-স্বাধীনতায় দিয়েছি তোমার প্রাণ।
আপনার বলে করিলে মোদেরে বলী ঃ
আপনারে শেষে দিলে মহাবলিদান।

তোমারে যা দিই, মানুষে দি অঞ্জলি;
তোমারে প্রণাম, ভারতেরে সে প্রণাম ॥

এই সংগ্রহে বারোটি গল্প, চারটি রসরচনা, আর প্রায় পঞ্চাশটি বি
রসের কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। এই লেখাগুলি আগেকার আমার কো
বইয়ের গ্রন্থিবদ্ধ নয়, গ্রন্থাকারে এই সর্বপ্রথম এদের আত্মপ্রকাশ। আ
লেখা যাঁদের ভালো লাগে তাঁদের জন্যই আমার লেখা—এ সম্পর্কে
বেশি আর কিছু আমার বলবার নেই।

এগুলি বিভিন্নকালে নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশলাভ করেছি
আনন্দবাজার ও যুগান্তর—বিশেষ সংখ্যা ও রবিবাসরীয় সংস্করণ; সাপ্তা
দেশ এবং সোনার বাংলা—পূজা সংখ্যায়; মাসিক: বসুমতী, শনিবা
চিঠি, পূর্বাশা, মন্দিরা, চলন্তিকা, চয়নিকা, অর্চনা, অলকা ও অচলপ
বার্ষিকী: সম্প্রতি, কিছুক্ষণ, মেঘনা, দিগন্ত; কবিতা-পত্রিকা: কবি
নিরুক্ত এবং একক; অসাময়িক পত্র—পাহারা, আর অধুনালুপ্ত নাচঘ
এঁদের প্রতি আমার ঐকান্তিক ধন্যবাদ।

লিখেছি কি আমি অনেক, বন্ধু?
আমি তো সেসব লিখিনি।
ছিলো যে লেখিকা জনেক, বন্ধু,
আমি ছিনু তার লেখনী॥

সূচীপত্র

—এক—

স্বামী মানেই আসামী

বীরেনবাবু ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুক্‌লেন—চোরের মত টিপে টিপে। রাত দশটা বেজে গেছে—একজন স্বামীর দণ্ডলাভের পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ—বীরেন বাবুর তাই এই চোরের দশা।

আসল চোরের পক্ষে অবশ্যি রাত দশটা কিছুই নয়, আস্‌লে তারা যখন খুসি আসতে পারে, যাতায়াতের ব্যাপারে তারা অনেকটা স্বাধীন এবং আপ্‌খেয়ালী। একটা চোরের 'পরগৃহ প্রবেশের' বেলায় যে স্বাধীনতা আছে, অতটুকুও তার নিজ গৃহে নেই এই কথা ভেবে বীরেনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌লো।

বীরেনের বউ সেলাই করছিল, চাইল চোখ তুলে, কিছু বল্ল না। বীরেন কোটটা খুলে রেখে একটু তৈরি হয়েই বসল সোফাটায়। ঝড় যে আসন্ন, মাথার উপর দিয়ে বইবে এক্ষুণি, আবহাওয়া-তত্বে অভ্যস্ত হয়ে সেটা জানার তার বাকী ছিল না।

"আপিস্‌ফেরতা সোজা বাড়ী আসবে ভেবেছিলুম।" বৌয়ের গলায় গুমোট।—"জরুরি কোনো কাজে আটকা পড়ে আসতে দেরি হোলো বুঝি?"

"আটকা পড়েছিলাম তা সত্যি, তবে বিশেষ যে কোনো কাজে তা না—" তানা-নানায় সুর হয় বীরেনের—"অনেকদিন পরে হরিপদর সঙ্গে দেখা হোলো। হরিপদ আমার স্কুলের বন্ধু—তাই তার সঙ্গে গল্প করতে করতে—"

"বুঝেচি।" একটা ঝটকা এল নৈঋত কোণ থেকে। —"তো
মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। হরিপদ সেখানে জড়ি
আজ হরিপদ, কাল নিরাপদ, পরশু তারাপদ—পদে পদেই
রয়েছে! নাও গেলো এসে, গিলে কৃতার্থ করো।"

বীরেন বৌয়ের পিছু পিছু খাবারঘরে যায়। স্ত্রীর কাছে
কেউই নয়—বিশেষতঃ খাবারঘরে। বড় বড় বক্তৃতাবাজও ভা
গ্রাস মুখে তুলে নীরবে অপর পক্ষের বাক্যবাণ হজম করে—কর
বাধ্য হয়। প্রলয়মূর্ত্তি নটরাজও অন্নপূর্ণার কাছে এসে কি
নম্র হয়ে পড়েন (একেবারে স্পীকটিনট্!) তার দৃষ্টান্ত কে
দেখেছে?

থালাবাটির ঝনৎকার তুলে দেয় বীরেনের বৌ: "আচ্ছা, ফি দি
কি এম্নি এক একটা আপদ—হয় ইস্কুলের নয় কলেজের নয়
আপিসের—তোমার বাড়ী ফেরার পথের সামনে পড়ে হোঁচোট খা
আশ্চর্য!"

বীরেনও বিস্মিত হয়—বৌয়ের বলার ধরণে। তিলম
জিনিসকে কি করে যে ও তালমাত্রায় এনে ফ্যালে যা সামলাতে বী
দিশে পায় না—তার কানে তালা লাগে—ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

"প্রত্যেক দিন নয়।" প্রতিবাদচ্ছলে সে বলতে যায়: "কো
কোনো দিন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পথে দেখা হলে কি কর
দেখতে পাইনি ভান করে' পাশ কাটিয়ে চলে আসবো? তু
তাই বলো?"

বীরেনের বৌ কিছু বলে না, ভাতের থালা ধরে দ্যায়। বীরেন
হাতমুখের ব্যাপারে বিব্রত করে। তারপরে বলে—"মনে ক

আমিও যদি প্রত্যেক দিন এম্‌নি বেরিয়ে যেতুম আর ফিরতুম অনেক রাত করে'? আমারো কি বন্ধু বান্ধব নেই? তুমি তাহলে কী বলতে আমায় শুনি?"

বীরেন গ্রাসটা কোঁৎ করে গিলে এক ঢোঁক জল খেয়ে নেয়—"কিচ্ছু না। যাওনা কেন বেড়াতে? আমি তো তাই বলি। চুপচাপ বাড়ীতে এম্‌নি মনমরা হয়ে বসে না থেকে সইটইদের বাড়ী গেলে কি সিনেমা দেখে এলে,—মন্দ কি?"

'সিনেমায় যাবার আমার সময় কই?'

"যাবার মতো কোনা চুলো আছে নাকি আমার? থাক্‌লে আর একথা তুমি আমায় বল্‌তে না।" ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির আমেজ দেখা দেয় এবার।

বীরেন অস্থির হয়ে ওঠে—"ওই তো! মেয়েদের ধরণই ওই! একটুতেই কান্না!" বীরেন বৌয়ের বায়না সইতে পারে, রান্না সইতেও রাজি, কিন্তু কান্না ওর অসহ্য। গর্জনে সে কাহিল নয়, কিন্তু বর্ষণে কাতর।

বীরেনের বৌ উদ্গত অশ্রু দমন করে অন্য ভূমিকা নেয়:

"তাছাড়া যাবো যে সিনেমায় তার সময় কই আমার? সেই
থেকে এই এতটা রাত অব্দি তো তোমাদের দাস্যবৃত্তিই করছি!
সিনেমায় গেলে গুষ্টীর পিণ্ডি কে রাঁধবে শুনি? ছেলে মে
ইজের ফ্রক্—এ সবই বা সেলাই করবে কে? তারপর ঘর
ঝাড়া মোছা—"

"আমি বলি কি, এর কিছু কিছু বাদ দিলে বোধহয় ভালো
বড্ড যেন বেশি বেশি করা হচ্ছে। তাই নাকি?" বীরেন
দিয়ে জানায়: "এই যেমন ধরো, ঘর-দোর ঝাড়ামোছার কাজ!
যেন একটু বাড়াবাড়ি করা হয় আমার ধারণা। এই সেদিন
দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম হয়তো তুমি দেখতে পাওনি, তুমি
ঝাড়া ঝাড়নটা দিয়ে মায় দরজা আমার আগাপাশতলা ঝেড়ে দি
তাতে আপাদমস্তকে আমার অনেক আবর্জনা সাফ হয়ে গেল তা স
কিন্তু মানুষ পরিষ্কার করার রীতি বোধহয় ও নয়।"

বৌকে এবার নিরুত্তর হতে হয়—তার বধূ-জীবনে বোধহয়
প্রথম এবং জীবনের এই প্রথম সুযোগে বীরেনও আরো কিছু
নেয়—"তাছাড়া সেলায়ের কাজ বলছ, তার জন্য বাজারের
আছে—তাদের অন্ন মারা কেন? আর পিণ্ডি রাঁধার কথা যা ব
কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলোনি। আমার মনে হয় ঠিকে ঝিকে অ
গোটা কয়েক টাকা বেশি দিলে সে রেঁধে দিয়ে যাবে এবং
চেয়ে বেশি খারাপ সে রাঁধতে পারবে বলে' আমি আশা করি নে।

"তাতো বলবেই। তাতো বলবেই তুমি।" বৌয়ের চো
বিদ্যুৎ এবার বর্ষা হয়ে নামল। "আমি যা করি সব খারাপ,
অকাজ! আমার রান্না মুখে তোলা যায় না। আমি কিছু না কর

তোমার ভালো হয়। ঘরদোর গোল্লায় যাক, কী হবে ঝেড়ে মুছে, বেশ, তবে আর আমি কিচ্ছুটি করব না।" ঝমাঝম্ বর্ষা।

বর্শাবিদ্ধ হয়ে বীরেনকে এবার চুপ করতে হয়। রোরুদ্যমানাকে কে রুধবে? বৌ বলেই চলে—"কেন যে তুমি আর সবার স্বামীর মতো নও আমি তাই ভাবি আর সব স্বামীরা নিজের ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলে খুসি হয়, বাড়ীতে থাকতে ভালোবাসে, নিজের বৌ ছেলে মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে চায় মিশতে চায়—তুমি

'ও-বাড়ীর নিবারণবাবুকে ছাখো দেখি!'

তাদের মতন নও। পাশের বাড়ীর নিবারণবাবুকে ছাখো তো? কেমন চমৎকার লোক! সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফিরবেন, কেবল আপিসটুকুই যা বাইরে, নইলে বাড়ীতেই সারাক্ষণ। আর কিরকম

বৌয়ের বাধ্য !—সর্বদা কাছে কাছে রয়েছেন ! নিবারণবাবুর মত হতে কেন যে তুমি পারো না, কোথায় যে তোমার আটকায়—”

বীরেনের গলায় আটকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি জল খেয়ে বাধাকে তলায় পাঠিয়ে, অন্নগ্রাসমুক্ত হয়ে চট্ করে সে উঠে পড়ল। নিবারণ বাবুর প্রসঙ্গ ওঠার প্রায় সময় হয়েছে সে টের পেয়েছিল, সে-ঢেউ একবার উঠলে শ্রীমতীকে নিবারণ করা অসম্ভব সে জানত। কথার চেয়ে দৃষ্টান্ত তীক্ষ্ণ। কথার খোঁচা তবু সওয়া যায়, কিন্তু দৃষ্টান্তের খোঁচ অসহ্য। তার সূচিমুখ থেকে বাঁচতে হলে কান হাতে করে দৃষ্টির বাইরে যেতে হয়। বীরেন হাত মুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার দিকে পালিয়ে গেল। যতক্ষণ না বৌ ঠাণ্ডা হয়, সে নাহয় এই ঠাণ্ডাতেই কাটাবে।

খোলা বারান্দাটার ওধারেই নিবারণদের বাড়ী। একেবারে কোণঘেঁষা—কানঘেঁষা ! বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে যে একটুকরো আকাশের দেখা মেলে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বীরেন। তারাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো সে—মেয়েদের মন পাওয়া দায়। তার বৌয়ের কথাই ধরা যাক্ না ! অতি তুচ্ছ কারণে, এমন অকারণে সে উত্তাল হয়ে ওঠে যে ভাবতেই পারা যায় না। হয়তো সব দোষটাই বৌয়ের নয়, তার নিজেরও কিছু আছে। বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, দিনের পর দিন একঘেয়ে খালি ঘরকন্না চালিয়ে কতোটা আমোদ পেতে পারে মানুষ ? মেয়ে হলেও মানুষ তো ! পুরুষের তবু একটা পা বাড়ীর বাইরে থাকে, এই একঘেয়েমির অরণ্য থেকে তবু তার বেরুবার পথ আছে, সারাদিনের কোনো না কোনো সময়ে সে মুক্তির স্বাদ পায়। একবারও অন্তত ঘরোয়া বানপ্রস্থ থেকে

বেরিয়ে বাইরের জনারণ্যে সে নিজেকে হারাতে পারে। প্রতিদিনই সিনেমা, রেস্তরাঁ, প্রিয়সঙ্গ—অতটা না হোক্ তবু রাস্তায় বেরুলে অনেক নতুন মুখ চোখে পড়ে তো। নতুন মুখ আর অচেনা মুখ যতো! সব মুখই কিছু অসুন্দর নয়। ফিরে দেখবার মতও কেউ কেউ থাকেই বইকি তার মধ্যে—ফিরে দেখা আর নাও যদি হয়! শুধুই মুখ দেখা—পাকা দেখায় নাই বা পাকলো, তাই কি কম?

তার বৌও তো ইচ্ছে করলে বেরুতে পারে! এধার ওধার ঘুরেটুরে আসতে পারে এক আধটু। তার দিকে তো কোনোই বাধা নেই। লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তে পারে, কতো নাচগানের জলসা হয়, সিনেমায় কতো ভালো ভালো ছবি আসে—গিয়ে দেখতে পারে তো! একলাই বা কাউকে সঙ্গে নিয়ে—কে আপত্তি করছে? তা না, কেবল সেলাই আর সেলাই! কে বলেছে তাকে এত এত সেলাই করতে আর দিনরাত কেবল ঘর দোরের ঝুল ঝাড়তে—শুনি?

অবশ্যি, তার বৌ যে আরো অনেক বৌয়ের মতো নয় এজন্যে সে মনে মনে খুসীই। তার বৌ যে ঘরকন্না নিয়ে জড়িয়ে থেকে সুখী থাকে সেটা একপক্ষে ভালোই। কোনো কোনো মেয়ে যেমন প্রজাপতির মত খালি উড়ছেই, দিন রাত্তই কেবল ফুর্তি—স্বামীর দিকেও নজর নেই, গেরস্থালির দিকেও না, কেবল তাঁর কষ্টার্জিত টাকা উড়িয়েই খালাস—তার বৌ তেমন নয়। হ্যাঁ, এর জন্য তার বৌকে ধন্য বলতে হয়—বীরেন নিজের মনে মনে বলে। সে নিজেও কম ধন্য নয় একথাও সে মানতে বাধ্য হয়।

এতদূর ভেবে এতক্ষণে বীরেনের বিবেক টন্ টন্ করতে থাকে। দূরের তারকালোকের দিকে তাকিয়ে একটু আগেই নিজের গৃহকে সে

তাড়নালোক জ্ঞান করেছে, কিন্তু এখন দেখল, না তা নয়, অতটা নয়। দূরবীণ না লাগিয়েও অদূরে যাকে দেখা যায় সে নিছক্ তাড়কারাক্ষুসী না, বরং ধ্রুবতারার সগোত্রীয়াই তাকে হয়তো বলা চলে।

না, এরপর থেকে সে বৌয়ের কথামতই চলবে। আর তার অবাধ্য হবে না। আপিসের ফেরৎ সোজা বাড়ী এসে তার সান্ধ্যকৃত্য! তারপর আর বাড়ীর বার নয়। বৌয়ের রূপসুধা, কথামৃত, শ্রীহস্ত-লাঞ্ছিত খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির পানাহারশেষে লক্ষ্মীছেলের মত শুতে যাওয়া, তারপরে ঘুম থেকে উঠে বাজার সেরে নেয়ে খেয়েই ফের আপিস! এবার থেকে এই হোলো তার নিত্যক্রিয়া। এবং নৃত্যক্রীড়া।

বৌয়ের খাতিরে বন্ধুবান্ধব সব সে বর্জন করবে। রাস্তায় তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই পাওনাদারের মত না দেখার ভাণ দেখাবে, তাতেও যদি তারা না মানে, ঘাড়ে পড়ে জমাতে আসে, সে চোখ তুলে না চেয়ে ব্রীড়াবনত মুখে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। যদি তবু কেউ তাড়া করে—তাকে উপদেশ দেবে, যাও, নিজের বৌয়ের কাছে যাও। আমাকে বখিয়ো না।···সত্যি, বৌয়ের চেয়ে আপনার তার কে আছে? কার কে আছে?

এইরূপ সমাধানে পৌঁছে, অনুতাপ-বিদগ্ধ বীরেন বৌয়ের কাছে মার্জনা-ভিক্ষা করে আরও মার্জিত হবার আশায় যখন বারান্দা ত্যাগ করতে যাচ্ছে সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আরেক সমস্যা দেখা দিল! আরেক দাম্পত্য সমস্যা।

পাশের নিবারণবাবুর ঘর থেকে শ্রীমতী নিবারণীর কলকণ্ঠ কানে এল। তিনিও স্বামীকে সায়েস্তা করতে লেগেছেন।

"বলিহারি যাই তোমায় (বল্‌ছিলেন নিবারণের বৌ) কি করে যে দিনের পর দিন এম্‌নি করে বাড়ী কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌তে পারো তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি! এমন ঘরকুণো মানুষ আমি জন্মে দেখিনি! কেন, সন্ধ্যের পরে একটু বেড়ালে, হাওয়া খেতে বেরুলে কী হয়? বন্ধুবান্ধব পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে, আড্ডা দিলে, এখানে ওখানে গল্পগুজব করলে খানিক—তাও কি তোমার ভালো লাগে না? কেবল আপিস আর ঘর, ঘর আর আপিস। আপিস থেকে ফিরে নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়লে! এমন করলে বাতে ধরবে যে!—"

"কেয়াবাৎ!" বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে বীরেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—"বেচারা নিবারণেরও দেখছি সেই দশা। তারও স্বস্তি নেই। যদিও তার অপরাধ আমার ঠিক উলটো বলেই যেন বোধ হচ্ছে।"

নিবারণ কী সদুত্তর দেয় জানবার জন্য, পরের কথায় আড়ি পাতা অন্যায়—এবং আড়ি পাততে গিয়ে অধঃপতন লাভ আরো অন্যায়—তা জেনেও, বারান্দা থেকে অনেকখানি সে ঝুঁকল। কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়েও কোনো লাভ হোলো না। প্রত্যুত্তরে নিবারণ আমতা আমতা করে কী যে বল্ল কিচ্ছু বোঝা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে ওর বৌয়ের গর্জন তেড়ে এল।—"বৌয়ের এত আঁচল ধরা হওয়া কি ভালো? এরকম ন্যাওটা মানুষ মোটেই আমি ভালো বাসিনে। আমার দুচক্ষেব বিষ! সারাটা সন্ধে বাড়ীতে বসে থেকে আমার প্রত্যেক কাজে বাগড়া না দিয়ে একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে এলে কি হয় না? তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। একটু পুরুষ মানুষের মত নাহয় হলেই! পাশের বাড়ীর বীরেনবাবুকে

ছ্যাখো দিকি। ওরকম কি তুমি হতে পারো না? না কি, ওরকম না হবার জন্যে কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে পায়ে ধরে সেধেছে?…”

এই পর্যন্ত শুনেই বীরেনের মাথা ঘুরতে লাগল। বারান্দা থেকে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ফিরল সে, কিন্তু বৌয়ের কাছে মার্জনা-লাভের সঙ্কল্প নিয়ে নয়। সে সাধু ইচ্ছা তার উড়ে গেছে তখন। কী লাভ? মেয়েদের রহস্য তার সামান্য বুদ্ধির বাইরে। তবে এটুকু সে বুঝেচে যে, মেয়েদের কাছে মার্জনা নেই; কখনই না, কোনো ক্ষেত্রেই নয়। আছে সম্মার্জনা, সর্বদা এবং সর্বত্র; এবং এই বোঝাই তার যথেষ্ট। সেই বোঝা আরও বাড়িয়ে আর কী লাভ হবে তার?

—দুই—

স্বামী হওয়ার সুখ

সন্ধ্যেয় যখন চারুর সঙ্গে আমার কফি হাউসে দেখা, তখন তাকে খুব সুচারু বলে' মনে হোলো না। দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে —কিন্তু আগের সে-চারু যেন নয়। কোথায় যেন কী গলদ্ ঘটেচে। আরাম-চেয়ারে বসে কফি পান করছে বটে, কিন্তু কফি পেলেও আরাম পাচ্ছে না। বিলক্ষণ বোঝা যায়।

চারুর চেহারা সুচারু নয়!

তার ওপরে আরেকটা বৈলক্ষণ্য, বসেছে না বলে' বসে গেছে বল্লেই যেন ঠিক হয়। ভূমিকম্পের দ্বারা ধরণী দ্বিধা হয়ে বাড়ীঘর যেমন বসে যায়, প্রয়োপবেশনের ফলে কয়েদীরা বসে যায় যেমন, অনেকটা সেই রকমের চেহারা আমাদের শ্রীচারুর।

অপরের বিপদ-আপদে অকাতরে উপদেশ-প্রবণ আমার মত লোক এরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় কাউকে দেখতে গেলে অযাচিতই এগিয়ে যায়। তাছাড়া, আরো বড়ো কারণ ছিল। ওই বর্বরটাই আবার আমার মাস্তুত বোন শেফালীর বর।

"ভারী মুস্কিলে পড়েছি ভাই!" চারু বল্ল আমায়ঃ "আর কি করে যে এই মুস্কিল থেকে আসান্ পাবো ভেবে পাচ্ছিনে।"

"শেফালী?" আন্দাজ করে' আমি ঢিল্ ছুড়ি।—"শেফালী বুঝি?"

"শেফালীই।" মাথা নেড়ে ও সায় দেয়।

"ও!" এই বলে' ওর আরো বলার আমি অপেক্ষা রাখি।

"আজকেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।" বল্ল চারুঃ "রোজ যেমন দুপুরে আপিস থেকে বেরিয়ে টিপিন করতে যাই আজো তেমনি গেছি আর সেই সময়েই এই বিনামেঘে বজ্রাঘাত!"

"কিরূপ বজ্রাঘাত?" আমি জিগেস করি।

ব্যাকরণের সীমা লঙ্ঘন করে' ভাষার সে অপপ্রয়োগ করছে বলেই আমার মনে হয়। দধিচীর অস্থিতেই বজ্র, এই তো আমি জানি। কিন্তু এখানে যখন তা নয়, তার বদলে ঘৃতাচীর অস্তিত্বই টের পাওয়া যাচ্ছে, তখন বিনা আগুনে ঘি পড়লো, এই জাতীয় কোনো উপমা নির্বাচন করলেই কি সুষ্ঠু হোতো না?

কিন্তু ভাষার কারুকার্যে নজর দেবার মতন মনের অবস্থা চারুর নয় তখন। অলঙ্কার এবং লঙ্কার মধ্যে ঝালের প্রাচুর্য থাক্লেও, আর সব বিষয়েই যে বৈষম্য, এতখানি বোঝার মতো সূক্ষ্ম বোধশক্তি তার কাছে তখন আশা করা অন্যায়।

"সেই কথাই তো বল্‌তে যাচ্ছি।" বিষণ্ণ সুরে ও সুরু করলঃ

"যখন আমি টিফিন করতে বেরিয়েছি সেই সময়ে শেফালী এসেছিল আমার আপিসে।"

"ও!" সমঝদারের মত আমি মগজ নাড়ি।

"আমার জন্যে আপিসের বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষাও করেছিলো নাকি!" চারু জানালো: "ওকে নিয়ে কেনাকাটার বেরুবার কথা ছিলো কিনা আমার।"

"আর তুমি বুঝি তা বেমালুম ভুলে বসেছিলে?"

চারু কোনো উত্তর না দিয়ে মুখখানা মুমূর্ষুর মত করে' রাখে। আমার মত ভাবগ্রাহীর পক্ষে রূপবাণীর আধখানাই যথেষ্ট। সমস্ত সিনেমাটা না হলেও চলে; সীনের একটুখানিই ঢের। ঐরূপ দেখেই, মুখ ফুটে ও কিছু আর না বল্লেও, ওর অবস্থা জানার আমার কোনো বাধা হয় না।

আমি বল্লাম: "কাজটা ভালো করোনি ভায়া।"

সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ-তত্ত্বের একজন বড়ো অথরিটির, কথা আমার স্মরণে আসে। অপরাধীরা জন্মায় না, তাদের তৈরি করা হয়ে থাকে। একবার আসামী হবার ফলেই তাদের অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়।

স্বামীদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। স্বামীরাও কিছু জন্মগত নয়। বিবাহের দ্বারা তাদের বানানো হয়, এবং তার পরেই তারা চিরদিনের মত অপরাধী হয়ে পড়ে।

"আমার আফিসের পবিত্রর সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল। পবিত্র ওকে বলেছিল কোথায় আমি টিফিন্ করতে যাই সে জানে এবং তাকে সঙ্গে করে' আমার সন্নিধানে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরিও হয়েছিল নাকি।

কিন্তু শেফালী নাকি বলেছে যে, কোনো দরকার নেই, ও একাই বাজার করতে পারবে।”

“কথাগুলো কি খুব রূঢ় ভাবে বলেছিল? বেশ রেগেমেগে?··· পবিত্র কী বলে?” গোগবীজানুর ন্যায় যাবতীয় সভ্য মানুষের অন্তর্গত আমার শার্লক্ হোম্‌স্‌ও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবার। এই অকূলে উত্তীর্ণ হবার দুরাশায় তৃণবৎ ‘ক্লু’-র অনুসন্ধান করে।

“পবিত্র তো বলে যে—না, তার মতে শেফালী খুব মধুর ব্যবহার করেছে। মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে যেমন নাকি করে’ থাকে—”

“উঁহু, আবার ভাষার শ্রাদ্ধ করচো—তুমি কিম্বা পবিত্র কে করচো জানি না।” বাধা দিয়ে আমি বলি, “কথাটা ঘুরিয়ে বলা দরকার। পরস্ত্রীরা যেমন সুমধুর ব্যবহার করে’ থাকে—এম্‌নি করে’ বল্‌লে ঠিক হবে।”

“পবিত্র কী বুঝবে? আমি তো নিজস্ত্রীর মাধুর্য জানি। এবং তোমার বোন যখন, তখন এই মাধুর্যের কী অর্থ তা বোধহয় তোমায়ও অজানা নয়।”

“হুঁ। মেয়েরা যখন ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকে, তখনই তাদের মুখে মিষ্ট হাসির উজ্জ্বল আভা দেখা যায়।” প্রাজ্ঞের মত আমি মাথা নাড়ি।—“এই অদ্ভুত কর্ম্ম মেয়েরাই পারে। মেয়েরাই পারে কেবল।”

“ঠিক।” চারু যোগ দেয়, “আর হয়তো মোমবাতিরাও কিছুটা।”

ওর মুখে আবার আমি চালচিত্র দেখি।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে কফি পানের পর আবার ওর আরম্ভ হয়—“পবিত্রর কথা শুনে তখন আমার মনে পড়ল আজ আপিস বেরুবার মুখে কেনাকাটার কী একটা কথা যেন ও বল্‌ছিল। কিন্তু তাড়া-

তাড়িতে আমি তাতে ভালো করে' কান দিইনি। কান দিতে পারিনি বলাই উচিত। দশটার সময় আপিস যখন কান ধরে টান লাগায়, তখন একটা কান কজনকে দেয়া যায়, বলো না?"

"আরেকটা তো ছিল!" আমি বলি। অঙ্গুলিনির্দেশই যথেষ্ট, না-কি, টেনে দেখাতে হবে, ঠিক করতে পারি না।

"এ পাড়ায় ও বাজার কর্‌তে এলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ে আমরা মিলিত হই। বরাবরের মত এই আমাদের পাকাপাকি ব্যবস্থা। কিন্তু—ওযে আজ কেনাকাটায় আসবে তা আমি একদম্ খেয়ালই রাখিনি।"

"যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না।" ওর মনের বোঝা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার আমার আয়াস।

মুখে কিছু বলে না, কিন্তু ওর মাথা আরো ঝুঁকে পড়ে।

"সেই জন্যেই বুঝি আপিস্ ফেরতা আর বাড়ী যাওয়া হয়নি? কফি হাউসে রয়েছো এখনো? কিন্তু এমন করে' পালিয়ে পালিয়ে কদিন থাক্‌বে? এই ভাবে কি বাঁচা যায়? আমি তোমায় বাড়ী যেতে বলি।" খুনের আসামী থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করুক্ এই আমার সাধু ইচ্ছা।

"বাড়ী তো যেতেই হবে।" কাঁদ-কাঁদ-সুরে ও বলে, "বাড়ী তো যাবই, কিন্তু গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেব তাই আমার ভাবনা।"

"কী আবার দেবে? স্রেফ্ হেসে উড়িয়ে দেবে। অনেকটা দ্বিজেন্দ্রলালী কায়দায়—'এই গোঁফ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মতন অনেক পাবো!'—ভাবখানা এই রকম করে'—বুঝেচ?"

"কিন্তু আমার যে গোঁফ নেই।" ও গোঁফে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেখানে ওর গোঁফ নেই সেইখানে।

অ-দ্রষ্টব্যটা দেখতে হয় আমায়। দেখে শুনে আরেকটা উপায় বার করতে হয় আমাকে,—এই আমাকেই।

"সে একটা কথা বটে। আমারো নেই যে তোমায় ধার দেব।" আমি বাৎলাই: "তবে পরচুলার মত চেষ্টা করলে কি পরের গোঁফ

'এই গোঁফ জোড়াতে দিলে চাড়া—?'

একটা ভাড়া পাওয়া যায় না? যোগাড় করে' দিতে পারে না কেউ?"

এ-প্রস্তাব ওর মনঃপূত নয়। ও ঘাড় নাড়ে আর বলে: "আমি যে বল্‌বো, তোমার মতো অনেক পাবো, সেকথা কি মিথ্যে কথা বলা হবে না? সে কথা কি এখানে খাটে?"

ওর সত্যাগ্রহ আমাকে বিস্মিত করে। আমি বল্লাম—"সত্যবাদীদের

তাহলে বিয়ে করাই উচিত নয়। যুধিষ্ঠিরও একলা বিয়ে করতে হলে এতবড়ো দুঃসাহস করতেন কিনা সন্দেহ।"

"ভয়ানক মিথ্যে বলা হবে। শেফালীর মত মেয়ে অনেক পাওয়া যায় না। খুঁজে বার করো দেখি একটা। অমন দুর্দ্ধর্ষ মেয়ে ওই একটিই আছে।"

স্বামীগত সার্বজনীন সমস্যাকে ও ব্যক্তিগত করে' দেখে সকাতর হচ্ছে এই দৃশ্যে আমার হাসি পায়। ঐ ধরণের কলত্রাণি কেবল দেশে দেশে বা প্রদেশে প্রদেশে নয়, গৃহে গৃহে বিরাজমান—এবম্প্রকার আশ্বাসে ওর দুঃখভার লাঘব করার চেষ্টা করি—কিন্তু বৃথা! ওর দীর্ঘনিশ্বাসের তোড়ে আমার সমস্ত যুক্তি আর পটাটো চিপ্‌স্ উড়ে যায়।

"তুমি বুঝতে পারছ-না, বন্ধু!"—আমার সমস্ত কথার পরেও ভদ্রলোকের সেই এক কথা: "মেয়েদের বিষয়ে একটুও যদি তোমার জ্ঞানগম্মি থাকে তাহলে বুঝতে পারবে যে, যে-কাজ আমি করেচি তাদের চোখে তা অমার্জনীয়। মেয়েলী অভিধানে তার কোনো ক্ষমা হয় না। শেফালী এই ভাববে, ভাববে কি, ভেবে বসে আছে যে তার সম্বন্ধে আমার আর কোনো আগ্রহই নেই। তাকে আমি ঘরসাজানো একটা আসবাবের বেশি গণ্য করি না। সেই জন্যই তার কথা আমি অত সহজে ভুল্‌তে পেরেচি।......"

"এই বিপদে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিলে হয় না?" আমি জিগেস করি: "ভুলে থাকা নয় ভুলে যাওয়া—কবিতাটা তোড়জোড় করে' আউড়ে দিলে কেমন হয়?...না না, এখানে নয়, শেফালীর কাছেই—তাই বল্‌ছি।"

চারু সে-কথায় কান দেয় না, নিজের কথায় গড়িয়ে চলে :—"তার সঙ্গে এক সাথে বাজার করার মত এত বড় সৌভাগ্য যে কি করে' আমি হেলায় হারাতে পারি, কেন যে আমি আপিসে এসে অবধি তার প্রতীক্ষায় হাপিত্যেশে ঘড়ির কাঁটার দিকে হাঁ করে' তাকিয়ে প্রত্যেক মিনিট্ অধীর হয়ে থাকিনি, এই ভেবেই সে আরো মর্মাহত হবে। মেয়েরা ঐ রকমই! তাদের মিলনের অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করা ছাড়া আমাদের যে আর কোনো কাজ নেই, থাক্‌তে পারে না এবং থাকা উচিত নয়, শেফালীর এই নারী-সুলভ ধারণায় অজান্তে আমি কতো বড়ো আঘাত যে হেনেছি তা তুমি ভাবতে পারো না।"

আমি ভেবে দেখি। দেখে বলি—"হুম্।"

"শেফালী একথা কিছুতেই বুঝতে পারবে না," চারু বল্‌তে থাকে : "আপিস বেরুবার মুখে কি করে ট্রামে চাপ্‌বো শুধু এই এক সমস্যা ছাড়া আর কোনো চিন্তা আমাদের মনে স্থান পায় না। এমন কি সেই ভাবনায় ভালো করে' আমরা দুটি খেতেও পারি নে। আর তার-পর আমরা যন্ত্রচালিতের মত ট্রামের নির্দিষ্ট ষ্টপেজে গিয়ে অপেক্ষা করে', পর পর কয়েকটা কেরানী-ভর্তি ট্রামে-বাসে পাত্তা না পেয়ে অবশেষে মরীয়া হয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে একটাকে পাকড়াতে পারি। তারপর ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে কি করে' যে সশরীরে আপিস-ঘরে পৌঁছে নিজের টেবিলটিতে গিয়ে বসি সে একটা মন্ত্রমুগ্ধ ব্যাপার! এমন কি, চোখ বুজে থাক্‌লেও, এই কাজগুলি দিনের পর দিন একটানা ঘটে যায়—এর মধ্যে অন্য কিছু ভাববার এতটুকু ফাঁক্ কোথাও থাকে না, যেখানে রঙীন স্বপ্নদের কিম্বা স্বপ্নের রঙ্গিণীদের একটুখানি স্থান দেয়া চলে। কিন্তু এসব কথা শেফালী বুঝবে না। এ জন্মে নয়।"

"রাণীর জীবনে তো না।" আমি ওর সঙ্গে একেবারে একমত: "বুঝতে হলে তার জন্যে ওকে কেরানী-জন্ম লাভ করতে হবে।"

"বলো তো ভাই, আমি কী করি এখন?" চারু ভেঙে পড়ে—ওর কণ্ঠস্বরের মতই ভগ্নদশা দেখা যায় ওর।

"এক কাজ করো।" আমি উপদেশ দিই; "মেয়েরা ভারী ফুল ভালোবাসে। কথায় যখন কুলিয়ে ওঠা যায় না, তখন সৌরভে ওদের কূল মেলে। সামান্য কিছু ফুলের তোড়াটোড়া কিনে নিয়ে যাও—সেই সঙ্গে দু' একটা মুখরোচক গল্প বানিয়ে রাখো—দরকার হলে তাক্‌মাফিক্‌ তখন ছাড়বে।"

"উঁহু! কিচ্ছু হবে না তাতে। শেফালীকে তুমি জানো না।" চারুর সেই এক সুর।

শুনে শুনে আমার রাগ হয়। আমার মাস্তুতো বোন—জন্মো থেকে দেখচি—আমি জানিনে! আর দুদিনের পরিচয়ে উনি জানেন। রেগে মেগে বলি: "তাহলে যাও, সটান্‌ গিয়ে লেকে ডুবে মরো গে। তাহলেই সে এই অবহেলার দুঃখ ভুলবে। ভুলতে পারবে আমি আশা করি। পা কাটা গেলে আর কাঁটার ব্যথা থাকে না।"—এই বলে' আমার কফির দামটাও ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চটেমটে আমি উঠে আসি। শোকের বোঝা যে বইছে, বোঝার ওপর এই শাকের আঁঠিও তার সইবে।

কিন্তু যথার্থই বলেছিল চারু, শেফালীকে সত্যিই আমি চিনিনে। তার এক ফালিই আমি দেখছিলাম, শেফালী আর সে নেই। মাস্তুতো বোনরূপে যার বন্যরূপ একদা দেখেছি, কিছুদিনের সংসার-যাত্রায়

তার এখন অন্যরূপ—শেফালীর দাম্পত্যচেহারা একেবারে আলাদা অচিরেই তা জানা গেল।

শেফালী বেড়াতে এসেছিল আমাদের বাড়ী। তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরানো যায় না।

'ভালো লাগ্‌ছে তোমার ?'

"বাঃ! কী দিব্যি যে তোকে মানিয়েছে!" আমি বলি। লেটেস্‌ট্‌ ডিজাইনের বাজারের সেরা শাড়ীটা তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে যে কথা বল্‌ছিল তার উচ্চস্বরের সঙ্গে আমার তুচ্ছ স্বর পাল্লা দিতে পারে না, বলাই বাহুল্য।

"ভালো লাগ্‌ছে তোমার ?" . শেফালী শাড়ী এবং আমার দিকে তাকায়।

"ভয়ঙ্কররকম।"

"তাহলে যেয়ো আমাদের বাড়ী। আরগুলোও দেখাবো। এর চেয়েও সেগুলো আরো চমৎকার। ছরকমের ছ'খানা কিনেচি, শাড়ী আর ব্লাউজে জড়িয়ে।"

ভালো করে' ওকে তাকিয়ে দেখি।—"চারু কিছু বল্ল না ?" আমি জানতে চাই।

"উনি ?" বল্‌তে গিয়ে চল্‌কে উঠলো শেফালী। "উনি বল্লেন বই কি! উনিই তো বল্লেন!"

আমার ভুরু কড়িকাঠে গিয়ে ঠ্যাকে—আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

"উনিই তো বল্লেন কিনতে।" শেফালী আরো খোলসা করে দেয়, "না কিনিয়ে ছাড়লেন না তাই বরং বলা উচিত।"

"না না। এ হতেই পারে না।" আমার প্রতিবাদ।

শেফালী হেসে কুটি কুটি হয়ে যায়। "সত্যি, ভারী মজার ব্যাপার। বলি তাহলে। কদিন আগে এক আধটা টুকিটাকি কেনার জন্য ধর্মতলায় যাবার আমার দরকার পড়ে। আমার ধারণা ছিল আপিসে বেরুবার মুখে কথাটা ওঁকে বলেছিলাম—তাই ভেবে বাজার করতে হলে যেখানটিতে যেসময়ে আমরা গিয়ে মিলে থাকি সেইখানে গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। কিন্তু দশ মিনিট ওঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার মনে পড়ল, ওই যাঃ! ওঁকে তো বলাই হয়নি। বল্‌তে ভুলেই গেছি একদম্‌। তখন ওঁর আপিসে গিয়ে

হাজির হলাম ; গিয়ে জানলাম, জানবো আর কি, একটু আগেই উনি টিফিন করতে বেরিয়েছেন।”

“ও!” আমি বলি। একই গল্পের অপরার্দ্ধ আত্মপ্রকাশ করে’ আমার ওকারের মত গোলাকার হয়ে দেখা দেয়।

“তারপর উনি যখন বাড়ী ফিরলেন”—বল্‌তে বল্‌তে শেফালী হেসে গড়িয়ে পড়ল—“দেখলাম উনি ফুলের বাজার সবটা উজাড় করে’ নিয়ে এসেছেন—”

“ফুল্‌স্‌ প্যারাডাইস্‌—!” আমি বলি।

“এবং যথাসময়ে যথাস্থানে অপেক্ষা না করার জন্যে সে কী মার্জনা-ভিক্ষা! ভদ্রলোক এমন কাতরাতে লাগলেন যে তাঁকে সান্ত্বনাদানের জন্যেই বাধ্য হয়ে আমায়—”

“বুঝেচি। মানে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসিয়েছিস্‌। বেচারাকে সেই কাহিল অবস্থায় পেয়ে ওর পকেট ফাঁক করে’ ঝেড়ে ঝুড়ে বেবাক বের করে নিয়েছিস্‌। পরিস্কার করে’—এই তো?” তীক্ষ্ণকণ্ঠে আমি বলি, “আমার মত উচ্চমনা লোকের বোন হয়ে যে একাজ করতে পারলি এই ভেবে আমার ঘাড় হেঁট হচ্ছে। মাস্তুতো ভাইরা চোর হয় বলে শুনেচি কিন্তু তাই বলে কি মাস্তুত বোনদের ডাকাত হতে হবে? ছিঃ! ছলনা ছাড়া কী এ?”

“ছলনা কি প্রতারণা তা আমি জানিনে।” শেফালী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: “আমার ধারণায় আমি ঠিকই করেছি। উচিৎ দণ্ডই ওঁর হয়েছে। যদি দেখা করবার ঠিকঠাক করে’ যথাস্থানে না দেখা দিতেন, ভুলে যেতেন সেই তো এক খারাপ হোতো—ভীষণ খারাপ হোতো বল্‌তে গেলে। কিন্তু যখন দেখা করবার কোনো কথাই নেই,

এই কথাটাও উনি ভুলতে পেরেছেন তখন—বুঝতেই পারা যাচ্ছে ওঁর হৃদয়ে আমার কতটুকু স্থান। উঃ, এমন লাঞ্ছনা—এতখানি দুঃখ জীবনে আমি কখনো পাইনি।"

শেফালীর কলকল কণ্ঠ, ওর দুই চোখ ছাপিয়ে ছল ছল করে' ওঠে। বল্‌তে না বল্‌তে।
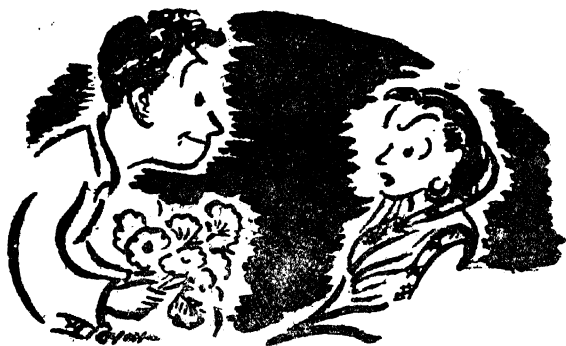
—তিন—

স্বামী-সুখ

নতুন বইটার প্রথম ম্যাটিনি শো—দর্শকের অভাব নেই। সুরমাও অসংখ্য দর্শকের একজন, তবু শ্রোতার অভাব মেয়েদের যেমন পীড়িত করে এমন আর কিছু না। সুরমা উস্‌খুস্‌ করে। পাশের মহিলাটির সঙ্গে খাতির জমিয়ে পরস্পরের কণ্ঠ এবং কর্ণের অভাবমোচন করলে হয়তো মন্দ হয় না।

"আপনি বুঝি ছবির খুব ভক্ত? প্রথম ম্যাটিনিতেই ছবি দেখতে এসেচেন?" সুরমা সুরু করে। এ-ছাড়া আর কী বলেই বা সুরু করা যায়!

"হ্যাঁ, প্রথম ম্যাটিনিতেই এলাম।" মহিলাটি বলেন। এ-ছাড়াই বা তাঁর বলবার আর কী ছিল?

"আমিও এলাম।" সুরমা গড়িয়ে চলে—আলাপের ধাপে ধাপে অবলীলাক্রমে। কলার খোসায় প্রথম পদার্পণের পর আর পিছ্‌লে চলে যাবার কোনো বাধা হয় না।—"পরিমলবাবু কেমন করেন, তাই দেখতেই এলাম আরো।"

"ওঃ! পরিমলবাবু?" মহিলাটির কথায় ঈষৎ একটু চম্‌কানিই ছিলো যেন: "হ্যাঁ, পরিমলবাবুও তো এই বইয়ে আছেন বটে।"

"কেন, আপনিও কি তাঁর অভিনয় দেখতেই আসেননি?" সুরমা অবাক্‌ হয়: "অমন প্রেমের অভিনয় আর কেউ করতে পারেন নাকি?"

"প্রেমের অভিনয়? হ্যাঁ—অভিনয়ই বটে।" ঠোঁটের কোনে একটুকরো বাঁকা হাসি ক্ষণিকের জন্যে যেন খেলা করে!

ছায়াপটের মরীচিকা!

"এদেশের স্ক্রীণে ওঁর মতো পার্‌ফেক্‌ট্‌ লাভার্‌ আর কই? নাম করুন্‌ আপনি!" নিজের প্রশংসায় অপর পক্ষ থেকে তেমন সায় না

এলেও সুরমার উৎসাহ দমতে চায়না। এমনকি, আলোকোজ্জ্বল ঘরের সাদা ছায়াপটের ওপরেই পরিমলবাবুর অনাবিল প্রেমের দুএকটি দৃশ্য তার চোখের ওপর যেন ভাসতে থাকে।

"পারফেক্ট্ লাভারদের আমি নাম করতে চাইনে।" মহিলাটি মুচ্‌কি হেসে বলেন।

"আপনি বুঝি কোনো সিনেমাষ্টার?" সংশয়ের খোঁচায় সুরমার চাহনি শানানো।

"না না!" মহিলাটি হাসেন: "তোমার ধারণা ভুল। সিনেমার ত্রিসীমানায় আমি নেই। তবে কি না—আসল কথা এই—আদর্শ প্রেমিকদের ঠিকানা তোমার মতো ছেলেমানুষের কাছে ব্যক্ত করাটা কি ঠিক হবে?"

"ব্যক্ত করার আপনার প্রয়োজন নেই। কারা পারফেক্ট্ লাভার জানি আমরা। ছবিতে দেখেই টের পাই।" সুরমা যেন উস্‌কে ওঠে: "পরিমলবাবু সত্যি একজন প্রথম শ্রেণীর প্রেমিক—কি সিনেমার পর্দায়, আর কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে।"

"বটে, এতদূর অবধি তুমি জানো?" তাঁর ঠোঁটে বক্র হাসি!

"কে না জানে? বাংলা দেশের জানে না কে?" সুরমা সিনেমা-ফ্যান্ হিসেবে অতুলনীয়া—ভারী জোর ওর হাওয়া। "আপনি দেখ্‌ছি আমার পরিমলবাবুকে মনে মনে অপছন্দ করেন। কেন করেন জানতে পারি কি?"

"তোমার পরিমলবাবু? তার মানে, পরিমলবাবু সম্প্রতি যাঁকে—"

"না না না!" সুরমা বাধা দিয়ে ওঠে; "আপনার ধারণাও ভুল। আমি বল্‌ছিলাম আমাদের পরিমল বাবু।"

"ভালো কথাই বল্‌ছিলে। তা, তোমাদের পরিমলবাবুকে আমি অপছন্দ করিনে, কিন্তু পছন্দই বা কেন করতে যাবো বলো তো?"

"ওঃ, বুঝেচি। এক বউ থাকতে আবার বিয়ে করার জন্যে আপনি পরিমলবাবুর ওপর প্রসন্ন নন্? তাই না? কিন্তু কী দুঃখে যে উনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েচেন তা কি আপনার জানা আছে?"

"কী দুঃখে? না, জানিনা তো!"

"সে কি? আমরা সবাই জানি যে! খবরের কাগজের মারফতে বাংলা দেশের সকলে জানে।"

"কী, শুনিতো? বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার—খবরের কাগজ পড়ার ফুরসৎ পাইনে! শুনিতো—কী?" মহিলার কণ্ঠস্বরে এবার কৌতূহলই অকৃত্রিম।

"ওঁর বউ পাগল। বদ্ধ পাগল। বহুদিন থেকেই।" চাপা গলায় সুরমা জানায়ঃ "কিন্তু ওঁর কী ভয়ঙ্কর ভালবাসা ভেবে দেখুন! তেমন বৌকেও এতদিন ধরে অম্লানবদনে সেবা শুশ্রূষা করে এসেচেন।"

"বদ্ধ-পাগল?" মহিলাটির বড় বড় চোখ আরো বড়ো হয়ে ওঠে।

"এক্কেবারে। তা না হলে কখনো অমন স্বামীর গলা টিপে মারতে যায়? তাই তো গেছল। আর তাইতেই তো উনি, পাগল বৌকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যেই তার চোখের সাম্‌নে থেকে সরে এসেচেন। কত বড়ো বেদনা নিয়ে যে সরেচেন তা উনিই জানেন। কেন, খবরের কাগজে সবই তো বেরিয়ে গেছে।"

"বদ্ধ-পাগল!"—যন্ত্রচালিতের মত মহিলাটি পুনরুক্তি করেন, তাঁর চোখ তেম্‌নি বিস্ফারিত। কথাটা যেন কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুক্‌তে চায় না!

"এক নম্বরের। তা না'হলে অমন চমৎকার স্বামী পেয়ে—কি রকম লম্বাচৌড়া সুশ্রী চেহারা, দেখেছেন তো?"

"তোমার কি বিশ্বাস হয়, ওর বৌ ওর গলা টিপ্‌তে গেছ্‌ল?"

"কেন হবে না? পাগলে কি না পারে। আর গেছল মানে?—ক্ষেপে গিয়ে এমন টেপা টিপে ধরেছিল যে আরেকটু হলেই ওঁর বারোটা বেজে যেত।"

"ওই লম্বাচৌড়া চেহারার কাছে? গেলেও, একটা মেয়ে পারবে কেন, পেরে উঠ্‌বে কেন, হোলোই বা পাগল? আমার মনে হয় তুমি উল্টো শুনেচ। উনিই হয়ত ওঁর বৌয়ের গলা টিপে প্রায় সাবাড় করে' এনেছিলেন, সেইটাই ঠিক হবে। তাই হওয়াই সম্ভব। ভয়ঙ্কর প্রেমিকরা তর্কে পরাস্ত হলে তাদের হাতের কাছে ওই একটি মাত্র যুক্তিই থাকে কি না। আর বাবাঃ, ওই হাত, ওই সব আঙুল কারো গলায় যদি চেপে বসে"—মনশ্চক্ষে দৃশ্যটি কল্পনা করতেই মহিলাটি শিউরে ওঠেন।

"বুঝেচি, পরিমলবাবুর ওপরে আপনি হাড়ে চটা। যাকে দেখ্‌তে পারিনে তার চলন বাঁকা!" সুরমা গড় গড় করে' বলে—বল্‌তে বল্‌তে রাগে গর্ গর্ করে: "বুঝেচি।"

সিনেমা সুরু হতে আর দেরি নেই। শেষবারের ওয়ার্নিং বেল্ পড়ে গেল। মহিলাটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, "আমি এই এলাম্ বলে'।"

সুরমা উত্তর না দিয়েই সরে' বসে। কোন উচ্চবাচ্য না করেই ওঁর যাবার পথ পরিষ্কার করে দ্যায়। মহিলাটির প্রতি তার ভাব তখন চটে গেছে…কাজেই আসন্ন অভাবের জন্যে তেমন কাতরতা তার হয় না।

মহিলাটি কিন্তু আর ফেরেন না। সিনেমার সম্মুখ হল্ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় চকিতের জন্যে একটু দাঁড়ান—না, চারিধারে শোভমানা তারকাদের ছবির দিকে তাকিয়ে নয়—প্রমাণ আয়নাটার সাম্‌নেই দাঁড়ান্ একটু। চকিতের জন্যে কাঁধের শাড়ীটা সরিয়ে গলার ধারটা আয়নার ভেতরে দেখে নেন। সুন্দর সুডৌল গ্রীবা—অন্ততঃ, কিছুদিন আগে অবধি সুন্দর সুডৌলই ছিল। কিন্তু দেখা যায় সেখানে চেপেবসা বিকৃত আঙুলের দাগ…আর, সে-দাগ এখনো মেলায়নি বুঝি।
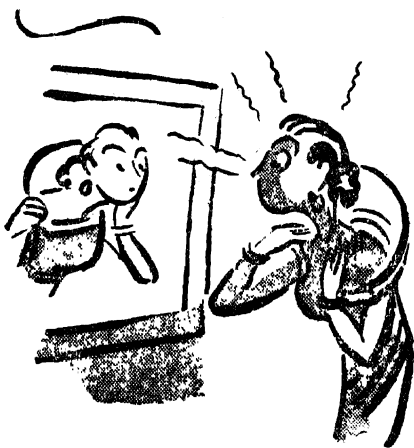
স্ত্রী-সুখ

দাম্পত্যকলহে নাকি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে থাকে। কথাটা সত্যি, কেবল আড়ম্বরটা যদি বরের দিক থেকে সুরু হয়। বৌয়ের দিক থেকে আরম্ভ হলে ক্রিয়াকাণ্ড কোথায় গিয়ে শেষ হবে বলা কঠিন, এমন কি লঘু থেকে লগুড়ে গড়িয়ে বহুতর হয়ে ক্রমে ক্রমে অবশেষে বৈধব্যে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। আজ বৈকালীন বিশ্রামকালে পার্কে যে-লোকটি আমার পাশে এসে বসেছিল তার সঙ্গে আলাপ করে' এই ধারণাই আমার বলবৎ হয়েছে।

লোকটা এধার ওধার তাকাতে তাকাতে আমার কাছে এসে খাড়া হোলো। লম্বা চৌড়া এবং মেদস্বী—চুড়িদার পাঞ্জাবির ভেতর খাসা ভুঁড়িদার চেহারা! একটু ইতস্ততঃ করে'—যেন অত্যন্ত অগত্যাই জিজ্ঞেস করল আমায়:

"আজ্ঞে, একটি লোককে দেখেচেন? কপালে জলপটি লাগানো আর চোখের কোল ভয়ঙ্কররকম ফোলা—এই রকম একটি লোককে এই ধার দিয়ে যেতে দেখেচেন আপনি?"

"না। দেখিনি তো।" আমি জানালাম।

"আজ্ঞে, আমার বন্ধুটিকে খুঁজছি। ওই চিহ্নগুলির দ্বারা আধ মাইল দূর থেকেও তাকে আজ চেনা যাবে। আর একবার সেই চেহারা দেখলে ভোলা কঠিন।"

"না, ওরকম কোনো দৃশ্য আপাতত দেখেছি বলে তো মনে পড়চে না।"

আসামীর চেহারা

"সচরাচর সে তো এমন লেট খাবার ছেলে নয়।" লোকটি ভাবিত হয়ে পড়েঃ "তাহলে নিশ্চয় তার ভালোমন্দ কিছু একটা হয়েছে।" এই বলে সে ধপ্ করে' আমার পাশে বসে পড়ল—একেবারে যেন হাল ছেড়ে দিয়েই মনে হয়।

অচেনা লোকের সম্পর্কে হলেও এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। ভালো মন্দ—নিজের বা অপরের, যারই কেন

হোক্ না, শেষ পর্যন্ত তা কাকস্য পরিবেদনা হলেও সজ্ঞানে তা শুনে চুপ করে' থাকা শক্ত।

"য়্যাঁ, বলেন কি? একেবারে এস্পার-ওস্পার—য়্যাদ্দূর?" ভবপারাবার পারাপার সহজ ব্যাপার না, সেই চেষ্টায় ইহলোক বা পরলোকে কেউ হাবুডুবু খাচ্ছে ভাবতে ভারী খারাপ লাগে।

"নাঃ, অতটা ভালো মন্দ হয়ত নয়। তবে ওর কাছাকাছি কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।" লোকটী বসে বসে ভুঁড়ি-কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে লাগলো।

"কিরকম আশঙ্কা করচেন?" জানতে আমার আগ্রহ হয়। অত্যন্ত স্বভাবতঃই।

"ওর বৌ বোধহয় বাড়ী থেকে ওকে বেরুতে দেয়নি।" লোকটি বলে।

"ও!" আমি গুঞ্জন করি। "—এই ব্যাপার!" এমন কিছু সঙ্গীন নয় তাহলে। রাজবন্দীর অন্তরীণ দশা মাত্র।

লোকটি নীরবে তার সিগ্রেট ধরায়। নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ে।

"অদ্ভুত প্রকৃতি···এই মেয়েরা! প্রকৃতির সৃষ্টি আজব জীব! কখন যে কি করে' বসে কিছুই স্থিরতা নেই। পাঁচিলের ওপরকার বেড়ালটার মতই, কোন্ দিকে যে লাফ খাবে কেউ বলতে পারে না।"

"যা—বলেছেন!" আমার সায় দিই। "এমনকি, লাফ না খেয়ে সারা পাঁচিলটা কেবল চষে বেড়াতেও পারে।"

"আপনি কি বিয়ে করেছেন—আজ্ঞে?" সে জানতে চায়।

"ঠিক না করলেও, বিবাহিত অবস্থা কল্পনা করতে আমার অসুবিধা নেই।" আমি জানাই।

"উঁহু, তাতে হয় না মশাই। অনেক মেয়েকে একটু একটু ঘাঁটলে বিবাহিত জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না; তাতে মেয়েদের কিছুই জানা যায় না। একটা মেয়েকে অনেক ঘাঁটালে তবেই যদি জানা যায়। একটু টিপলে তারা কমলা নেবুর মত—উত্তর-দক্ষিণে চাপা··· চমৎকার! যেমন অপার্থিব তেমনি উপাদেয়। অনেক কচ্‌লালে তবেই তাদের আসল রূপ বেরিয়ে আসে...সত্যিকারের তিক্ত স্বাদ টের পাওয়া যায়। ওদের আগাপাশতলা জানতে হলে আগে বিয়ে করা দরকার।"

এত বড়ো দার্শনিক তত্ত্ব হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। তাহলেও নারীদের ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি একথা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয়। কোথায় যেন বাধে।

"ধরুন না কেন, আমিও বিবাহিত।" আমি বলি।

"তবে তো," লোকটি বলে: "আমিও ওদের বিষয়ে যতখানি জানি আপনারও তা জানা আছে। আপনাকে আর আমি বেশি কী জানাবো?"

"যতখানি? তার মানে যতটা বেশী, না যতটা কম? কী আপনি বলতে চাইচেন?"

"ঠিক বলেচেন।" আমার বাক্যে লোকটিকে বেশ পুলকিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। "আমিও ঠিক ঐ কথাই বলি। একেবারে খাঁটি কথা। আমার কথাই ধরুন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আমাকেই ধরা যাক্। সতের সতের বছর বৌয়ের সঙ্গে ঘর করছি কিন্তু সত্যি বলতে, সেই কনে দেখতে যাবার দিন যতটুকু তার বুঝেছিলাম, আজ এতদিন বাদেও তার বেশি এতটুকুও বুঝতে পারি নি। আর সদানন্দ হালদারের

কথা যদি বলেন…তার সমঝদারি যদি মাপতে হয়…তাহলে শ্রেফ একটা বড় গোছের শূণ্য। শূণ্য ছাড়া কিছু না।"

"সদানন্দ হালদার?" আমি প্রতিধ্বনি করি: "আপনার সেই বন্ধুটির কথা বলচেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকেই তো গোরু খোঁজা করছি। চোখের কোলটা ভীষণ রকম ফুলেছে, কপালে জলপটি জড়ানো। গালে আরেক পট্টি।"

"আপনার বন্ধুর এমন পট্টিবাজ হবার কারণ?" আমি জিজ্ঞেস না করে পারি না।

"তার কারণ জানতে চান? তার বৌই হচ্ছে তার কারণ। তার বৌ হয়েছে যাকে বলে খাণ্ডার…সর্বদা খাণ্ডা খর্পর ধরেই রয়েছে। বেঁটে খাটো হলে কি হয়…সারা দেহজোড়া আগাগোড়াই তার একখানা জিভ। অনবরত লক্ লক্ করছে আর বক্ বক্ করছে। দিন রাত। কুড়ি বছর আগে বিয়ের রাতে সাতপাক ঘুরিয়ে আনার তারিখ থেকে সদানন্দ নিজের নাম ভুলে গেছে। নাম না ভুললেও নামের মানে তো বটেই। তার বিয়ের পর আর তাকে হাসতে দেখিনি একদিনও…অন্ততঃ বৌয়ের সামনে তো নয়। আর এই কুড়ি বছর ধরে সে বৌয়ের বক্তৃতা শুনছে এক নাগাড়ে। সদানন্দ যাই করুক তার বৌয়ের মতে সব খারাপ, এমন কি কিছু যদি নাও করে তাও খারাপ। তার বৌ কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। আমি স্বকর্ণে সব দেখেচি শুনেছি বলেই জানি কিনা।"

কী ভাষায় নিজের সহানুভূতি জানাব ভেবে পাই না।

"কতোবার আমি বলেচি সদানন্দকে—ব্যাটা, বৌকে তুই অতোটা

আশ্রয় দিস নে। অতো বাড় ভালো নয়। আর অমন ভয়ই বা করিস কিসের? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সমুচিত জবাব দিতে কী হয়? কিন্তু বলা বৃথা। সদানন্দ হালদার নামেই হালদার...আসলে হাল ধরবার মত মুরোদ তার নেই। হাল তার ভাঙা।"

"হাল খুব খারাপ।" আমার মনে হয়।

"চাল আরো। হালের চেয়েও চাল খারাপ আরো। বৌয়ের সাম্‌নে ও একেবারে জুজু। কিন্তু অমন কেঁচো হয়ে বেঁচে থেকে লাভ? যদি মাটির তলায় সেঁধিয়েই বাঁচতে হয় তবে আর বাঁচা কেন?"

মাধ্যাকর্ষণের জন্যই হয়ত বা, আমার ধারণা হয়। কেঁচোরাও তো বলতে গেলে একরকমের হালদার। পুরুষ বা কাপুরুষ যাই হোক, তাদের যৎসামান্য হালের দ্বারা তারাও যথাসাধ্য মৃণ্ময়ীকে কর্ষণ করে। হলধর ঠিক তাদের বলা না গেলেও, তাদেরও নিজস্ব একটা কৃষ্টি রয়েছে—নিঃসন্দেহই। কেঁচোদের মত সদানন্দেরও নিজের কৃষিক্ষেত্রের প্রতি নিজের দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক।

"দুদিন আগের কথা বলি। কী হয়েছিল শুনুন্ তাহলে।" লোকটি কঁচে গণ্ডুষ করে। বেশ জাঁকিয়ে তার আরম্ভ হয়: "সন্ধ্যে তখন হবে হব। আমি আর সদানন্দ একটা চায়ের দোকানে বসে। আমরা খাচ্ছি। আমাদের মুখোমুখি আরেকটা লোকও চা খাচ্ছিল। লম্বা লম্বা চালের গল্প করে' চায়ের দোকান গুল্‌জার করছিল লোকটা। হঠাৎ পাশের মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা ঢাক ঢোল কাড়ানাকাড়া বাজতে শুরু করে দিলো—পূজো কি আরতি কিছু একটা হচ্ছিল। সামনের লোকটা তখন ঢাকের বাদ্যি নিয়ে পড়ল। বল্ল যে এরকমের আওয়াজে

মুসলমানরা যে কেন ক্ষেপে ওঠে তা বোঝা কঠিন নয়। এমন বিটকেল বাদ্যিতে ভূত পর্যন্ত পালিয়ে যায় আর মুসলমান টিকবে? আর দেবতাই কি কখনো তিষ্ঠতে পারে? ভদ্র কানের পক্ষে একেবারে অসহ্য এইসব বিচ্ছিরি বাজনা যে কে বের করেছিল—ইত্যাদি কথা বলতে লাগল সেই লোকটা।"

এত বলে' সদানন্দ-চরিতকার থামল। কান খাড়া করে' সেদিনের ঢাক ঢাক গুড়গুড় শোনবার চেষ্টা করতে লাগল কিনা কে জানে।

"তার পরমুহূর্তে আমি এক ধাক্কা খেলাম। এমন ধাক্কা আমি এ জীবনে খাইনি। খেলাম ওই সদানন্দর কাছ থেকেই।"

"বলেন কি? আপনাকেই ধাক্কা মারলো আপনার সদানন্দ? আপনার বন্ধু হয়ে আপনাকেই—বলেন কি মশাই?" আমার তাক লাগে।

"না, আমাকে নয়। সামনের সেই লোকটাকেই। প্রচণ্ড এক ঘুষির ধাক্কায় লোকটাকে সামনের চেয়ারসমেত সে ভূমিসাৎ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দর সে কী চীৎকার! "ঢাকের তুই কি জানিসরে হতভাগা? ঢাকে কাঠি দিতে এসেছিস যে বড়ো? ফের যদি আমার কাছে ঢাকের নিন্দে করবি, হিন্দুধর্মের গ্লানি করবি, তাহলে ভালো হবে না। তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।' বল্ল সদানন্দ। এই কথাই বল্ল। তার ধাক্কাটা ঠিক আমার গায়ে না লাগলেও আমিই ধাক্কা খেলাম বইকি! ওর কাছ থেকে এতদূর বীরত্ব কোনো দিন আমি আশা করিনি!"

"সদানন্দ হিন্দুমহাসভার কোনো চাঁই টাঁই বুঝি?" আমার প্রশ্ন হয়। "ওদের এধারে ঢাক ওধারে ঢাক ঢাক কিনা! একদিকে তুমুল

বাদ্যি—অন্যদিক বেবাক ঢাকা। মাঝখানে কেবল চাঁদা করে' চাঁটি—চাঁদা বাগাও আর চাঁটি লাগাও।"

"মোটেই না। হিন্দুমহাসভার ধার দিয়েও যায়না সে। তবে ঢাকের বাদ্যি শুনলে কেমন তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তখন আর সে নিজেকে সামলাতে পারে না। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অনুতপ্ত কণ্ঠে এই কথাই সে আমাকে জানালো।"

"আর সেই লোকটার কী হোলো? সেই ধাক্কাখোরের?" আমি কৌতূহলী হলাম।

"অচেনা লোকের হাতে অকারণ মার খেয়ে সে গুম্ হয়ে গেল। একটা কথাও বল্‌ল না আর। নিজের ঢাক থামিয়ে চুপ করে চলে গেল তারপর।"

"আহা!" তার দুঃখে আমার আহাকার।

"আমি কিন্তু এই করুণ দৃশ্যের মধ্যেই আশার একটু আলো দেখতে পেলাম।" সদানন্দ-বান্ধব প্রকাশ করতে থাকে: "দেখতে পেলাম যে ঢাকের আওয়াজে সদানন্দের ভীরুতা কোথায় উপে যায়। এক নিমেষে ওর চোখ মুখ চেহারা সব বদলে যায় কিরকম! যেন আগের সদানন্দই নয়। তখন সামনে পেলে তার চেয়ে বিশগুণ জোরালো দশটা কুস্তিগীরকেও সে যেন একাই গুঁতিয়ে কাবু করে' দিতে পারে। ঢাকের কী মহিমা কে জানে!"

"দেবদেবীর পাষাণ মূর্তিতেও প্রাণ জাগিয়ে তোলে বলে যখন—" আমি বাৎলাই: "তখন আর এটা এমন অসম্ভব কি?"

"সদানন্দর কীর্তি দেখে আমি তখন ভাবতে সুরু করেছি। ভেবে-চিন্তে বলেচি তাকে—তুই এক কাজ কর্। সত্যিই যদি তোর

বৌকে শিক্ষা দিতে চাস্, তাহলে সেই শিক্ষাদানের সময়ে এক জোড়া ঢাকীকে বায়না দিয়ে তোর বাড়ীতে নিয়ে যা। আর বৌকে যদি এইভাবেও শেষ পর্যন্ত মানুষ করে তুলতে পারিস তাহলে তোদের দুজনকারই তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। সনানন্দ কথাটা আমার শুনল। শুনল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। একটি কথাও না বলে' চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সটান সে ঢাকীদের কাছে চলে গেল। গিয়ে সবকটা ঢাকীকে নগদ টাকায় বেঁধে ফেল্লে। ঠিক হোলো আর ঘণ্টাখানেক পরে আরো ঢাকীদের জোগাড় করে' সবাই মিলে তার বাড়ীর সামনে জড়ো হয়ে জোরসে পিটোবে। তারপর সদানন্দ ফের চায়ের দোকানে ঢুকে পর পর আরো তিন কাপ চা মারল। দেহ মন ভালো করে' চানিয়ে নেবার জন্যেই বোধহয়।"

"তারপর?" অধীর আগ্রহে আমি উতলা হই: "কী হোলো তারপরে?"

লম্বা চৌড়া লোকটার সর্বাঙ্গ কম্পিত হতে থাকে। ভাবতেই— ভয়ে কিম্বা হর্ষে কিসে তা বলতে পারি না।

"তারপরে? তারপরেই সদানন্দের সেই ফোলাটা ঘটল। চোখের এলাকার সেই পর্বতপ্রমাণ ফোলাটা।" জানালো লোকটি: "কপালের জলপট্টির আর আমি পুনরুল্লেখ করতে চাইনা।"

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই আমরা নীরব হয়ে রইলাম। অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের জন্যেই মনে হয়। কিম্বা নিজেদের অভিজ্ঞতার প্রতি-ফলনে সদানন্দর প্রতিফলের রসাস্বাদ করতেই আমাদের এই মৌনতা হবে হয়ত। মৌনতা অথবা মৌতাত।

"কেন হোলো এমনটা—য়্যাঁ? আপনার বন্ধুর বৌও বুঝি ঢাকের বাজনা শুনলে আরো ক্ষেপে ওঠেন—তাই বুঝি?"

ঢাক্ গুড় গুড়!

"তাই হবে হয়ত। কিসে কী হয় কেউ কি বলতে পারে? মোটে ওপর সদানন্দর কাছ থেকে যা জানা গেছে তা এই। সে যখন বৌকে শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তার বক্তৃতাটাও প্রায় তৈরি, ঠিক সেই সময়ে—ঠিক সময়টিতেই দরজার বাইরে ঢাকের কাঠি পড়ল। সদানন্দর বৌ তখন রুটি বেলছিল, হাতে ছিল তার বেল্না। সদানন্দকেই সে আর একটা ঢাক বলে' ভ্রম করল কিনা কে জানে! বিচিত্র নয় কিছু, অনেকটা ঢাকাই চেহারাই তো আমার বন্ধুটির। ঢাকের তালে তালে বেল্না দিয়ে সদানন্দকে সে বাজাতে সুরু করে' দিলে। চারধারেই বাজিয়েছিল—বেশ জোরে জোরে—যেমন বাজাতে হয়। ঢাক বাজানোর যা দস্তুর! তবে কেবল কপালের আর চোখের কাছের বাজনাটাই একটু বেশী জোরালো হয়ে গেছে। কপালের জোরে চোখটা বেঁচে গেছে বেচারার, এই রক্ষে!"

"ঢাকের বাড়ি যে ওর কপালে গিয়েই থেমেছিল সেটাও কম বাঁচোয়া নয়।" আমি বলি: "ও বাড়ি থামলে পরেই তো মিষ্টি!"

অতিথি এবং অন্যান্য কবিতা

পরবর্তী কবিতাগুলির প্রথমটি তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকালের রচনা, কয়েকটি গত মহাযুদ্ধকালীন, বাকীগুলি প্রায় অনুরূপ না হলেও, নানাবিধ অকালে লিখিত। তাহলেও এগুলিকে সর্বকালের সামগ্রী বলে দাবী করার স্পর্দ্ধা লেখকের নেই।

অতিথি

সেদিন তো যেতে যেতে দেখলাম হায়,
দুর্গত এক
শুয়ে আছে আমাদের লাটের বাড়ীর কিনারায়।
যুগান্তর-প্রদক্ষিণ যমের দক্ষিণ দরজায়।
অস্থিসার ভারতের অস্তিত্বের সীমান্ত-বজায়
দুর্গত এক—
নারায়ণ, দরিদ্র বেজায়,
শুয়ে আছে শেষ নাগে অনন্ত শয্যায়।

ধনী ও দালালে মিলে
মেরে কি করেছে ওরে লাট ?
জলে যথা জল বাধে, তদ্রূপ প্রথায়,
তাই কি ঠেকেছে এসে শেষে সে
লাটের মোহানায় ?

আরো একজন—যদি খুঁজি,
অবিকল ওর মতো এক
ছিলো বুঝি ওখানে কোথায় !
সূক্ষ্মরূপে নিরখিলে
দুর্গতই, বিকল্পে, দূরগত বলা যায়।

সাত সমুদ্রের পার্ হতে, বিচিত্র দ্যাখ্—
কালোদের ভালোবেসে,
সেও তো এসেছে বুঝি
একটু রুটির প্রত্যাশায়।

কে এলো কাহার অন্বেষণে,
তাই ভাবি মনে ॥

যথাপূর্বম্

আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমান্ হরিপ্রাণ
পত্নীর অতি বেশি বাধ্য ;
গিন্নীর ত্রাসে তিনি সদাই কম্পমান,
খাদকের মুখে যথা খাদ্য ;
মারধোর খেয়ে হায় কখন্ প্রাণ হারান্,
সাবধান রন্ যথাসাধ্য।
হঠাৎ কী হোলো ভাই, বিগত শীতে
নাম লেখালেন তিনি এ-আর-পিতে।

তারপর থেকে ভাই, কে জানে যে কি করে'
পাল্টে গেল যে তাঁর পর্তা,
এমন কি দেখা গেল তাঁর নিজের ঘরে
তিনি হয়ে বসেছেন কর্তা!

কী যে তাঁর হাঁকডাক, কিবা তাঁর গুম্ফ রে
দিচ্ছেন তাতে হর্‌দম্ তা।
গোঁফ, খাকী, হেল্‌মেট্—সব নিয়ে না
বদ্‌লে গেলেন স্রেফ, যায় না চেনা।

কিন্তু তাঁহার এই পত্নী-বিজয় ভাই,
হোলো যে ক্ষণস্থায়ী খুব ;
যে হাউই তীরবেগে উঠছিল পাঁইপাঁই,
শূন্যেই দিলো ফের ডুব ;
এক মাঘ না ফুরাতে—এই বছরেই তাই—
দেখলেন তিনি হুবহুব্—
বউ তাঁর ক্ষেপে, যেই শীত পেরুলই,
মেয়েলী এ-আর-পিতে করে' এলো সই।

তার পর থেকে ভাই সেই আগেকার জের—
চলছে তাঁদের ঘরকন্না ;
পুরানো মূষিক ফিরে পুনরাগতই ফের—
ম্যাও দেখে ভয়েই এগোন্ না ;
গোঁফ তাঁর ঝুলে গিয়ে—পতাকা নত আগের—
চিবুকের দ্বারে দেয় ধর্না।
আবার হরিপ্রাণ পত্নীর বাধ্য
প্রাণপণে, সদা ভয় করে হয় শ্রাদ্ধ॥

লক্ষ্যভেদ

অয়ি মহিয়সি রাজ্ঞি
কুইন্ ভিক্‌টোরিয়ে !
আজকের খবরে জানা গেল,
হং কং সহর থেকে
তোমার বিরাট তাম্র-মূর্তি
জাপানীরা—তাদের কী ভাগ্যি !—
স্বদেশ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে
গলিয়ে বুলেট্ বানিয়েছে।
(হায়, ঘোর বর্বর জাপান !
অপকর্মে তাদের কী ফূর্তি !)
একথা কে ভাবতে পেরেছে—
করুণায় দ্রবময়ী তুমি—
এভাবে যে দ্রবীভূতা হবে !
তোমার স্বদেশীদের হৃদয়ের ভক্তিরস থেকে
একবার বিগলিত হয়ে—
ঘোরতর তাম্ররূপ লয়ে—
আবার নতুন করে' গলে'—
ফের শক্ত হয়ে—
লক্ষ লক্ষ ভাগে ভক্ত হয়ে—

তাদের হৃদয়দেশে ফিরবে আবার
বুলেট্-আকার ?
এরই নাম, বুঝি, ভালোবাসা !
অহো, দুর্নিবার
রসের এ কোন্ রূপান্তর ?
তোমারই ঘা এ কী ফিরে আসা ?

টমের টেক্কা

ডিক্ করলো কি, ঠিক
বুকের ওপর,
উল্কিতে লিখলো সে—
'CHURCHILL :
টমের গেল এ তাল ফস্কে !
করবে কি, মুস্কিল,
বুক তার চৌকসে
কম কয় ইঞ্চিক্ !
তাই সেই আপ্সোসে
লিখলো সে 'হিট্লর্'—
টম্ কিছু নয় কম !......

এখন সে হর্দম্
হিট্লরের পর বস্ছে ॥

পূর্বরাগ এবং পশ্চাত্তাপ

ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেলে থাকে সেই মেয়ে অদ্ভুত সুন্দর।
বাসে যেতে আড় চোখে দেখে নিল বাঁকাইয়া ঘাড়
আমাদের প্রাণকেষ্ট। ঊর্দ্ধশ্বাসে কতক্ষণ আর?
সুন্দর বল্লেই হয় যথেষ্ট, তবুও অদ্ভুত
বলা চলে সে মেয়েরে—বলা চলে অদ্ভুত সুন্দর।
সামান্য সুন্দর যেন বিশেষণ নহে মজ্‌বুৎ
সে মেয়ের।—প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, আপনারে বলে
বারম্বার।
নিখুঁৎ সে মেয়েটির জন্যে মন করে খুঁৎখুঁৎ ঃ
প্রাণে তার নাড়া দেয় ডাণ্ডাস্-হোষ্টেল্-অভিসার।
কেষ্ট যতো চাড়া মারে প্রাণ ততো করে ভুৎ ভুৎ!
কেষ্টর তাড়ায় যদি প্রাণ যায় শেষে নির্ঘাৎ—
কেষ্ট-প্রাপ্তি ঘটে যায়? প্রাণের তা নয় মনঃপূত।
প্রাণকেষ্ট মনে মনে করে শুধু অগ্র ও পশ্চাৎ।

ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেলে থাকে সেই মেয়ে অদ্ভুত সুন্দর ঃ
ডাণ্ডাস্ হোসটেলে থাকে ঃ ডাণ্ডা যদি থাকে তারপর?

প্রেমের দিনপঞ্জি

(আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক অপ্রকাশিত)

গোলাপী সকাল।
ক্রমোন্নত তাপ।
উজ্জ্বল উল্লাস।
গরমের চাপ ঃ
ক্রমে কমে আসে।
মন্দ বায়ু বয়।
ঠাণ্ডার আভাসে
অপরাহ্ণ লাল।
খারাপ লক্ষণ।—
ঝড় বুঝি হয়।
সমুদ্রে তুফান।
দুর্যোগ-সময়।
নদী এল বাণ।
মেঘলা আকাশ।
তুষার-সম্পাত।
চাঁদে রাহুগ্রাস।
পূর্ণ গ্রহণ ঃ
অনেকটা রাত॥

উল্টো বুঝ্‌লি রাম ?

বলেছিলো কে যে মেয়েরা চট্‌লে পটে ?
বলেছিলো যে, সে আসল আহাম্মোক্।
বুদ্ধি তাহার ছিল না আদৌ ঘটে,
কিম্বা ছিল বা বেঘোরে মরার ঝোঁক !
তার কথা মেনে পড়েছি যা সঙ্কটে
তেমন বিপাকে পড়ে নাকো যেন লোক।
কতো যে মেয়েকে চটালাম আমি তাই :
কোথা গিয়ে তারা পটলো, কে জানে ভাই !

কে বলেছে ফের—আমার তা জানা নেই,—
মেয়েদের 'না' সে আসলে তা নাকি 'হাঁ'-ই :
বাজায়ে তাদের দেখিয়া না-না-রূপেই
বার করা নাকি এ সার বিজ্ঞতাই।
আমার বরাতে সব যায় উল্‌টেই—
মেয়েটিকে যেই পাড়া সেই কথ.টাই—
'না' বল্লে ছিলো ভালো, তা না বলে' ভাই,
হাঁ-হাঁ করে' এসে পড়লো : কোথায় যাই ?

বিপদ। সাবধান !!

বল্‌তে চাও তো বোলো সেই কথাটি হে,
ফুল দিয়ে বোলো যদি তা বল্‌তে চাও!
প্রাণ চায় যদি, বোলো চুমু দিয়ে দিয়েঃ
অন্য খাদ্যে? আরো—আরো ভালো তাও।
বল্‌তে পারো তা দিয়ে তুমি গয়নাও—
(সাধ যায় যদি বল্‌তে সালঙ্কারে,)
দুল দিয়ে কানে, দোদুল গলার হারে।
গান গেয়ে বোলো, তাতেও নেই বাধাও।
গুণ্‌ গুণ্‌ কোরো কানে কানে বারে বারেঃ
কবিতায় বোলো বরং ইনিয়ে বিনিয়ে।
যত খুসি, বোলো যতো না রকমে, তবু
কাগজে কলমে বোলো না বোলো না কভু॥

বিয়োগান্ত

আফিম আক্রা ঢের। আরো দেখিলাম বহুজন—
আফিম কিন্‌তে গিয়ে—আফিমের দোকানেতে গিয়ে—
আধমরা অবস্থায় সারবন্দী-দশায় দাঁড়িয়ে।
তাহলে কী করা যায়? লেক্‌ নয় অনেক যোজন,

তাও ভাবা গেল ঃ কতো বাস্ গেল যে পাশ কাটিয়ে।
অবশেষে মনে হোলো, মারা গিয়ে কোন্ প্রয়োজন ?...
একটি অধর তরে ধরার কি এত আয়োজন ?......
আরো কতো মৃত্যু আছে আরো কতো জনে প্রাণ দিয়ে!

অচিরাৎ দাঁড়ালাম মনোহারী দোকানের কাছে,
পুছিলাম ঃ 'হে মানসী, হে আমার একমাত্র প্রিয়ে,
লইনু চিরবিদায়!'—হেন কোনো কার্ড ছাপা আছে ?

আছে না কি ? বাঁচা গেল, দাও মোরে দু'চার ডজন ॥

রুবি দে

ছুরির ফলার মতো রয়েছে বিঁধে
আমার মর্মমূলে—সেই রুবি দে।
তোলাও যায়না তারে,
　　রাখাও তো বেদনা রে!
কোনোরূপে কোনোধারে নেই সুবিধে।
ধারালো ছুরির মতো সেই রুবি দে।

হীরের ছুরির মতো ঝক্‌মকানো—
সামনে পড়লে তার অক্কা, জানো ?

সাম্‌নে লক্ষ্য রেখো,
সাম্‌লে বক্ষ রেখো।
হীরের ছুরির বুকে বীরের খিদে ঃ
হননে নেইকো দ্বিধা—সেই রুবি দে।

যেমন ধারালো সেই হীরের ছুরি—
হৃদয় কাট্‌তে তার নেইকো জুড়ি।
কেটে কেটে এনৃতার
বেড়েছে ছুরির ধার!
হৃদয় বলিয়া কিছু নেই সে-হৃদে,
নিদয় হীরের মতো সেই রুবি দে।

তবু তার বাঁকা চোখে পড়লে ওরে,
কিছুতে যায় না রাখা হৃদয় ধরে'।
কেটে ছেঁটে চলে যায়—
হেঁটে হেঁটে চলে যায়—
বুকের ওপর দিয়ে—যায় সে সিধে।
হায় রে কোথায় যায়—সেই রুবি দে

আরেক অতিথি

বুকের কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল এক সোনার দাগ—
সেই মেয়েটি !
দূর থেকে দেখে তাই যেন মনে হোলো।
কিন্তু দূরদর্শন সব সময়ে সঠিক হয় না।
কাছে গিয়ে অণুবীক্ষণে দেখলাম,
নাঃ, তত সুন্দর নয়,
তেমন মারাত্মক নয় আদপেই।
মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল যেন—
দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝা।
বাসে উঠে চলে গেল সে,
কিন্তু কোনো দুঃখ দিয়ে গেল না।
কিন্তু সত্যিই যদি সে সুন্দর হোতো—
সেই অজানিতা, সেই অজ্ঞেয়া, সেই অলভ্যা—
কী মন খারাপই না করত আমার তাহলে !
সারাটা বিকেল নিজের অন্ধকার হৃদয় প্রত্যক্ষ হয়ে থাকত
তার উজ্জ্বল সোনার কষে।

তাজমহল

ঐ তাজ……!
সম্রাটের হুকুম্‌বর্দার্‌
অসংখ্য শিল্পীর প্রাণভয়—
অগণ্য দাসের কালঘাম—
কি করে' যে বদ্‌লায় সাজ!
কি করে' সুন্দর হয়—
'কালের কপোল তটে একবিন্দু অশ্রু হয়ে রয়'—
হয় যে প্রেমের অহঙ্কার—
আর—অহঙ্কারের আরাম!

তোমার চোখের বিস্ময়
আমার কবিতা হয় আজ!

উপসংহার

সারা জীবন করে' কাবার এখন মনে হয়—
কতক ছিলো চুমু খাবার—কতকগুলি নয়॥

প্রেম এবং দাঁত

প্রেমের দাঁত সব জায়গায় সহজে বসে না, কিন্তু একবার বসলে আর রক্ষে নেই। ঐরাবৎ ব্যতিতও—হস্তিনাপুরীর বাইরেও—দাঁতালো প্রেম দেখা দিতে পারে।

মঞ্জুলা একেবারে গালে হাত দিয়েই হাজির!—'ডলিদি যে এ কাজ করতে পারেন, আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'কি কাজ করলেন শুনি?' আমি প্রশ্ন করি: 'আর তোমার এই ডলিদিটিই বা কিনি?'

'ডলিদি? ডলিদি আমাদের পাড়ার এক মেয়ে। মেয়ে বললে ঠিক পরিচয় হয় না, এ-পাড়ার যুবতীদের তিনি অন্যতমা। যদিও বয়েসটা তাঁর সাঁইত্রিশ বছরের এক ঘণ্টাও কম না এবং যদিও সবার প্রতি তাঁর ঘৃণারও আর অবধি নেই।' মঞ্জুলা বলে।

'খুব বুঝি অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন তোমাদের?'

আমি জিজ্ঞাসা করি, একটু আশ্চর্য হয়েই বলতে কি। অন্ততঃ মঞ্জুলার মত মেয়ের প্রতি তাঁর ঘৃণার একটু অবধি থাকা উচিত ছিল—ওকে তো কোন কারণেই আমি অবজ্ঞেয় ভাবতে পারি না। অবিশ্যি অজ্ঞেয় কোনো কারণ থাক্‌লে তা আমার জানা নেই। কিন্তু তাহলেও একটি মেয়ের সম্পর্কে আমি আর ডলিদি যে সব বিষয়ে একমত হতে পারব, এতটা আশা করা অন্যায়।

'আমাদের নয় গো আমাদের নয়। তোমাদের পুরুষদের ওপরেই তাঁর অপরিসীম ঘৃণা।' মঞ্জুলা জানায়। —'অন্ততঃ আজ পর্যন্ত আমরা তাইতো জানতাম।'

'বলো কি ?' মঞ্জুলা আমাকে রীতিমত অবাক করে দেয় এবার।

'সত্যি, আমরা বড্ড শক খেয়েছি। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একেবারে বিয়ের নোটিশ। লোকটার সঙ্গে মাত্র তিন দিনের আলাপ—এর মধ্যেই—! অদ্ভুত কাণ্ড ডলিদির।'

'পূর্বজন্মের পরিচয় থাকলে এ-জীবনে তিন মিনিটের ঝালিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। তাই নয় কি?' আমি বলি। 'পাত্রটি কে শোনা যাক্।'

'ডলিদির অফিসেই কাজ করে। সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে। দেখেছি পাত্রকে। কিন্তু সে যে কী দেখেছে ডলিদির মধ্যে সেই জানে।'

প্রশ্নটা মঞ্জুলার নিকট জটিল রহস্য হলেও আমার কাছে জলবৎ। প্রেমের চক্ষু কিছুই দ্যাখে না। দেখতে সুরু করলেই তা জ্ঞানের চক্ষু হয়ে দাঁড়ায়। মাছ কি বঁড়শী দেখতে পায় ? কচুগাছ কি অসিকে চেনে ? অন্ততঃ কচুকাটা হবার আগেভাগে ? ডলিদির সুপাত্র যদি ডলিদির মধ্যে বর্ষিয়সীকে না দেখে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।

'দ্যাখো, দেখাদেখির কথাটা তুলোনা। সবাই তো আমাকে ভয়ঙ্কর বিচ্ছিরি দ্যাখে, কিন্তু তুমি—' আমি বলতে যাই।

'আমিও তাই দেখি।' মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বলে: 'কিন্তু আমার কথা আলাদা। আমার তুলনা কেন ? পুরুষ মানুষের তো একটা রুচি থাকা উচিত ?'

'তা বটে কিন্তু সবার কি থাকে ? এই যেমন—' বলে এবার আমি নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এগুই এবং আবার মঞ্জুলার তরফ থেকে ধাক্কা আসে, এবং ধাক্কার মত ধাক্কাই এবার।

'তাও যদি ডলিদির দাঁতগুলো পোকায় না খেয়ে দিতো!' মঞ্জুলা প্রাঞ্জল করে: 'ডলিদির বাঁধানো দাঁত তা জানো?'

এ-সংবাদ আমায় বিচলিত করে। সমস্যাটা আপাতদর্শনে মৌখিক মনে হলেও আসলে অতি গভীর। বাঁধানো দাঁত, ভেবে দেখলে, সর্বপ্রকার খাদ্যাখাদ্যের অন্তরায়। এমন কি যে জিনিষ লোকে স্থির হয়ে খায় এবং খেলে স্থির হয়ে যায়—জীবনের মুখ্যতম জিনিস। —কিন্তু বাঁধানো দাঁতের ব্যপদেশে তারও কোনো স্থিরতা থাকে না।

'সত্যি, খুব ভাবনার কথা।' না বলে আমি পারি না।

'আসছে হপ্তায়ই বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে।' মঞ্জুলা ব্যক্ত করে: সিভিল ম্যারেজ, কিন্তু এদিকে তো মিলিটারী তাড়া!'

'সিভিল ম্যারেজ? তাহলে আর কি। তাহলে তো বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী কিছুই নেই। তোমাকেও আর সবান্ধবে নেমন্তন্ন করছে না।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। যেখানে ভোজের আসরে আমার মঞ্জুলিত হবার আশা নেই তেমন বিয়েকে আমি ভোজবাজি বলেই মনে করি।

নেমন্তন্ন নেই!—কথাটার খোঁচা আমার কোথায় যেন লাগে। হৃদয় কিম্বা হৃদয়েরই কাছাকাছি কোথাও যেন, ঠিক বোঝা যায় না। ব্যথাটা উদরেরই হওয়া উচিত, কিন্তু সেই জন্মে অবধি ধরাধামে থাকার জন্যে, মাধ্যাকর্ষণের টানেই কি না কে জানে, আমার হৃদয় তিলে তিলে স্থানচ্যুত হয়ে ক্রমশঃ উদরে এসে বাসা বেঁধেছিল। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। এই কারণে আমি দেখেছি, একটা নেতন্তন্ন ফস্‌কে গেলে পেটের দুঃখটা আমার মনের মধ্যে লাগে। আবার কোনো কারণে হৃদয়ে আঘাত পেলে এক ভাঁড় রাবড়ি খেয়ে দেখা গেছে বেশ

মলদের কাজ করে। ওদের উভয়ের এই হরিহরাত্মা, ('হৃদয় আমার হারিয়েছি'।) এই একাকার-দশার জন্যই আমার উদরের পরিধি একটু বাড়বার দিকে কি না তা আমি বলতে পারব না। যাই হোক, মঞ্জুলার কথায় আমার মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'ডলিদির বিয়েতে কী উপহার দেওয়া যায়, আমি তাই ভাবছি।' মঞ্জুলা বলে।

ওর একেবারে অন্য ভাবনা। মেয়েদের যে হৃদয় নেই বলে থাকে কথাটা মিথ্যে নয়।

'শাড়ি-টাড়ি ?' আমি প্রস্তাব করি।

'ওরেব্ বাবা, যা দাম !' মঞ্জুলা চমকে ওঠে, 'দামের জন্যও কিছু যায় আসে না—পাবো কোথায় ? তাছাড়া, ডলিদির আবার শাড়ির অভাব ?'

চাকরি থেকে যে মোটা টাকা আসে ডলিদি তা নিজের সুখ এবং শাড়ির জন্যই উড়িয়ে দেন জানা গেল। বাড়ীতে গলগ্রহ কেউ নেই, এ পর্যন্ত হবার মত কেউ জোটেওনি (এই বিয়েটার আগে অবধি), কাজেই সুখের বিষয়ে নিশ্চয় করে' কিছু বলা না গেলেও শাড়ির ডলিদির সীমা ছিল না।

'তাহলে আর কী দেবে ? দাঁতের মাজন টাজন দিয়ে কি কোনো লাভ আছে ?' আমি জানতে চাই।

'ঠিক বলেছো ! ডলিদিকে নতুন এক সেট বাঁধানো দাঁত দিলে কেমন হয় ? খুব সারপ্রাইজ হবে, নয় কি ?' মঞ্জুলা উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

উপহাররূপে খুব আনকোরা আর চমক্দার যে হবে তাতে কোনো

ভুল ছিলনা। একাধারে উপহারিতা এবং উপকারিতার এমন চমৎকার যোগাযোগ বিরল। তবু আমি একটু খুঁৎ খাঁৎ করি—'বরের সামনে যেন উপহারটা দিয়ে বোসো না, বিয়ের আগে তো নয়ই। কনের খুঁৎ বেরিয়ে গেলে বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে।'

তখন কি করে' ডলিদিকে না জানতে দিয়ে তাঁর দাঁতের মাপ আদায় করা যাবে সেই সমস্যা দাঁড়ালো। অবশেষে ডেন্‌টিস্‌টের কাছে যাওয়া হোলো। ডলিদিকে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে একটা আস্ত আপেলে আকর্ণ-বিস্তৃত কামড় বসাতে বাধ্য করা যায় তাহলে তার ভুক্তাবশিষ্ট থেকে মাপসই এক পাটি বাঁধাবার কোনো অসুবিধা হবে না তিনি জানালেন। তবে কেবল ওপরের এক পাটিই হবে এই যা। মঞ্জুলার মতে উপহারের পক্ষে তাই যথেষ্ট। খরচটাও য অর্ধেক কমে যাবে সেটাও তো অবিবেচ্য নয়।

ডলিদিকে দিয়ে আপেল খাওয়ানো মঞ্জুলার পক্ষে তেমন কষ্টকর য়নি, পরদিন গিয়ে শুনলাম। দাঁতের ফরমাস দেয়া ছাড়াও মঞ্জুলা নানা রকমের টুথপেস্‌ট কিনে এনেছে এর মধ্যে। খানকয়েক ফ্যান্‌সী চহারার টুথব্রাশও তার ভেতর রয়েছে দেখা গেল।

মেয়েরা ঐ রকমই! কোনো কাজে হাত দিলে তার কোনো ত্রুটি াখে না, একটু নুন্‌ ঝাল্‌ কম বেশি হবার যো নেই। তবে আমাদের দি গিলতে বাধে সে নেহাৎ এই গলার দোষ! গেলবার গলদ্—া ছাড়া আর কি?

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মঞ্জুলাদের বাড়ী গেছি, দেখি সে ুম্‌ হয়ে বসে আছে। তার বদলে যে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা

জানালো সে তার সেই এক পাটি দাঁত। মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো টেবিলের ওপর মুক্তহাসি ছড়াচ্ছিল। ষোড়শীর দাঁতের মতই অনিন্দ্যনীয় ষোলোটি সেই দাঁত।

'মঞ্জুল মঞ্জরি নব সাজে!'

মঞ্জুলাও তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল—পরকীয়া দন্তরুচি!

'কী হয়েছে? এমন মনমরা কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাঁতের পাটিটা হাতে নিয়ে। ডলিদি হয়ত আজ হঠাৎ এসে পড়ায় উপহারের ব্যাপারটা বেফাঁস হয়ে গেছে আমার মনে হতে থাকে। 'ডলিদি সব জেনে ফেলেছে বুঝি? এত কষ্ট করে' এত হাঙ্গাম পোয়াবার পর এমন উপহার বুঝি ওর পছন্দ হোলো না?'

'না না, ডলিদির খুব পছন্দ হয়েছিল—' মঞ্জুলা মৃদুলা হয়ে জানায়: 'দাঁত দেখে ডলিদি নেচে উঠেছিল, বল্‌তে কি! কিন্তু-কিন্তু—' বল্‌লে গিয়ে দুঃখের ভারে ভেঙে পড়লো মঞ্জুলা।

'কিন্তু আবার কি হোলো?' আমি খোঁজ নিই।

'সমস্ত সেই নষ্ট আপেলটার কারসাজি।' সে বলে: 'সেই যে সেই আধখানা আপেল ডেন্‌টিস্‌টের কাছে নিয়ে গেছলাম মনে আছে? পথে যাবার সময়ে সে যে শুকিয়ে আরো আধখানা হয়ে যাবে তা কে জানতো? ফলে দাঁতের পাটিটাও মাপে খাটো হয়ে গেছে—ডলিদির মুখের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না।'

'ও, এই? এর জন্য এত দুঃখ কিসের? পরে কাজে লাগবে'খন। ডলিদির মেয়ের জন্য রেখে দাও। ছেলেমেয়েরা বাপমার দোষ গুণ পেয়ে থাকে বলে নাকি। উত্তরাধিকারিসূত্রে সে হয়ত দাঁত না নিয়েই জন্মাতে পারে।' এই বলে' আমি ভরসা দেবার চেষ্টা করি।

'আহা, তা নয়। মুস্কিল হয়েছে এই, আজ সকালে ডলিদির নিজের ওপরের পাটিটা মাজবার সময়ে হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে। একেবারে টুকরো টুকরো। তার মানে ডলিদির সারা ওপরের সারি ফাঁক। অথচ কাল ডলিদির বিয়ে।'

'ও, বুঝেছি। দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে বিয়েটাও ভেঙে গেল
অলক্ষ্যে আমার অশ্রুজল পড়ে। হায়, এই পৃথিবীতে দাঁত, প্রে
জীবন সবই ক্ষণভঙ্গুর। কিছুই কিছু নয়। সমস্তই বিধাতার কাঁ
কাজ—কাঁচের কাজ।

ডলিদির বর-বারত্তা!

'না, অতটা গড়ায়নি,' মঞ্জুলা বল্লে, 'তার কারণ, ডলিদির বর—
ডলিদির বর—' কি করে' যে সেই মহাভাব সে ব্যক্ত করবে ভে
পায় না।

'বড্‌ডো ভালোবাসায় পড়ে গেছে ডলিদির, এই তো ?' আমাকেই ভাষা যোগাতে হয়।

'হ্যাঁ।' মঞ্জুলা আধ হাত ঘাড় নাড়ে। 'ডলিদির দাঁতের কথা না শুনে তক্ষুনি সে তার নিজের দাঁত বার করে' ফেলল—দুপাটিই—তারও বাঁধানো দাঁত জানা গেল তখন! তারপর সেই দাঁত সে মেজের আছড়ে টুকরো টুকরো করে' ফেলল—তক্ষুনি—সেই দণ্ডেই। দু'জনের কারোই এখন কোনো দাঁত নেই। আর দুজনেই বেশ হাসি খুসি।"

'বাস্! সুখে থাকলেই হোলো। দাঁতে কি আসে যায় ?' আমি সাবাস্ দিয়ে বলি।—'গোটা কয়েক দাঁত থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি ? ভালোবাসাই হচ্ছে আসল।'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি তখন থেকে।' মঞ্জুলা বলে: 'মনে করো আমার যদি একটাও দাঁত না থাকতো তুমি কি আমায় ভালোবাসতে ?'

কথাটা ভাববার মতো। কিন্তু এখনই ভাববার মতো বোধ হয় না। কেননা দাঁত থাকতে দাঁতকে মর্যাদা না দেওয়ার কি কোনো মানে হয় ? তাই ওর দুর্ভাবনাটা অক্লেশেই আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি—

'নিশ্চয়! তোমার যদি একটাও দাঁত না থাকে তাতে আমার ভালোবাসা বিন্দুমাত্রও কমবে না। তুমি দেখে নিয়ো।'

'সত্যি বলছো ? সত্যি ? আঃ, বাঁচলাম। য়্যাতো আমার আনন্দ হচ্ছে, কী বলবো! কিন্তু—তুমি কিন্তু—তোমাকে কিন্তু তোমার সব দাঁত বজায় রাখতে হবে—সেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত। রাখবে তো আমার এই অনুরোধ ?'

প্রেমের উপর এটা যেন একটু বেশি রকমের জুলুম করা হচ্ছে বলে' আমার মনে হয়—দাবীটা একটু জবরদস্তিই যেন। তথাপি ওকে আশ্বাস দিতে আমি পেছপা হইনে—'চেষ্টা করব বই কি। প্রাণপণ চেষ্টা করব রাখবার। তবে কথা এই, দাঁতরা অনেকটা মেয়েদের মতই, অতিশয় চঞ্চলা! আমি তো রাখতে চাইব, এখন দাঁত আমাকে রাখলে হয়।'

'দাঁত নেই, এমন কারু সঙ্গে ভাব রাখা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না।' মঞ্জুলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশেষে মনের গোপন কথাটি প্রকাশ না করে পারে না।

মূকং করোতি বাচালং—

খাবারের টেবিলই হচ্ছে আমার পাকিস্থান। পাকঘর থেকে বেরিয়ে পাকাশয়ে পৌঁছে পাকাপাকি স্থান লাভ করার মাঝখানে যেখানে ওরা আশ্রয় নেয়, তারই নাম টেবিল। খাবার টেবিল, নিজে খাদ্য নয়, কিন্তু চরাচরের যাবতীয় খাদ্যাখাদ্যের বাহন।

কেউ খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানালে আমার ভারী আনন্দ হয়। পাকিস্থানলাভে রাজাগোপালাচারীর ন্যায় আনন্দ। সেখানে আমি কোনো কাঁচা কাজ করি না—কাঁচিস্থানের কোনো কাজ সেখানে নয়। কারো পকেটের দিকে না দেখে, শুদ্ধ নিজের পেটের দিকে নজর রাখি। নিজেকে রাজা বলে' মনে হয়, গোপালের মত চেটেপুটে খাই, শেষ আচারটুকু পর্যন্ত সাবাড় করি। কেবল ঐ টেবিলকে—ঐ পাকিস্থান ছাড়া আর কারুকে ছাড়ি না। পারলে পরে কাঁটা-চামচ পর্যন্ত পকেটে পুরে আনি।

কিন্তু নেমতন্নরক্ষা করতে অনুকূলের টেবিলে এসে আমি যেন অকূলে পড়লাম। সামনে এক শুকনো কাঠের টেবিল ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। টেবিলটা কাষ্ঠহাসি হাসতে লাগলো। মনে হোলো কাঁচা কাজ করেছি।

বাধ্য হয়ে আমাকে বিবৃতি দিতে হোলো।

সব শুনে অনুকূল বললে, "তাই নাকি? তোমাকে নেমতন্ন করেছিলুম বুঝি? একদম্ মনে নেইতো! কিন্তু তাইতো, না

করলে তুমিই বা কেন আসবে! এমনি তো তোমরা আসো না! ...কিন্তু করলুম্ কখন্! কোন্ অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে করে বসেছি কে জানে! কিচ্ছু মনে পড়ছে না।......"

"তবে কি এসে আমায় ফিরে যেতে বলো?" আমার কণ্ঠস্বর খুব করুণ শোনায়।

শোনাবার কথাই। অনুকূলকে স্রেফ আমার আনুকূল্য দেখানোর জন্যই এর আগে কয়েকটা (অপেক্ষাকৃত ছোটখাট) টেবিল হাতছাড়া করে' এসেছিলাম।

"না না, ফিরবে কেন! বন্ধু মানুষ ফিরে যাবে, তাও কি হয়? বন্ধুরা খেয়ে দেয়ে গিয়েই কতো নিন্দে করে, তুমি না খেয়ে গেলে কি আর রক্ষে রাখবে?"

সেও একটা কথা বটে। ভেবে দেখবার কথাই বই কি! আমিও ভেবে দেখি—বন্ধুনীতির দিক দিয়ে উদরনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি সমস্যাটা। বন্ধুর জটিলতা বলেই মনে হয়!

"কুছ্ পরোয়া নেই!" অনুকূল লাফিয়ে উঠল। লাফিয়ে উঠে গেল। চক্ষের পলকে, কোথেকে কে জানে, রকমারি ঢঙের গেলাস আর বোতল এনে টেবিলের ওপর জড়ো করল।

"কুছ্ পরোয়া নেই, জলপথেই তোমার সৎকার করা যাবে। কিচ্ছু মন্দ হবে না। একটু জলযোগ না করিয়ে অতিথিকে দেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। এসো ভাই, কিছু মনে কোরো না, পথে এসো, জলপথে চলে এসো।"

অনুকূলের আবাহন অমায়িক এবং মায়াহীন। আবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হোলো সমস্তটা। রঙ-বেরঙের বোতলে, কেবল

তাড়ি আর ভড্‌কা বাদে, শ্যাম্পেন শেরি, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন সব আমার নজরে পড়ল। এমন কি, একটাকে আমার নামের অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করতেও আড়চোখে দেখলাম। RUM—রাম!

অনুকূল গেলাসে গেলাসে ঢালতে থাকে। আমি অসহায় নেত্রে

ভোজের জলাঞ্জলি!

তাকিয়ে থাকি। বন্ধু না হয়ে শত্রুই হলাম না হয়, কিন্তু অতিথি তো! তাকে ডেকে এনে এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া অনুকূলের অভিধানে সৎকার করা হতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি অসৎকার কি আছে আমি জানি না। কে নাকি কোথায় খাদ্যের বদলে লোষ্ট্রলাভ করেছিল, কোন্ ধনঞ্জয়কে কবে গুড়ের বিকল্পে লগুড়

পেতে হয়েছিল, এই দৃষ্টান্তে সেই সব উদাদরণ আমার মনে উজ্জ্বল হতে থাকে।

"জলপথে আসব কি,—" আমি সকাতরে বলে' উঠি—"আমি যে ভাই সাঁতার জানি নে।" না বলে' পারি নে শেষ পর্যন্ত।

"নাই-বা জানলে! অল্প একটু জলে নামতে দোষ কি? হাত-পা ছুঁড়তে পারবে তো, তাহলেই হবে!" অনুকূল আমাকে আশ্বাস দেয়: "আমি সাঁতার কাটবো, তুমি দেখো। দেখবে কেমন কাটি।"

"এই বেবাক্ বোতল আমি একাই ফাঁক করব।" একটু থেমে ও আবার আমাকে অবাক্ করে।

অনুকূল কিন্তু চিরদিন এমন জলপথে ছিল না, যতোদূর আমরা জানি। কখনো সখনো এক-আধটু হয়তো থাকলেও, স্থলপথের নেশাই জোর ছিল ওর। হিল্লি-দিল্লি-বোম্বাইয়ের কোথায় না ও ভ্রমণ করেছে! এমন কি, বোম্বাই পেরিয়েও ওর বাই গেছল—আফ্রিকার কাফ্রি-মুল্লুকে পা দিতেও দ্বিধা করেনি, এরকমও শোনা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ খুব বেশি নেই, ভ্রমণকে ভ্রমের নামান্তর জ্ঞান করার লোকই বেশি, তার মধ্যে অনুকূল একটা বিরাট ব্যতিক্রম বলতে হবে।

অনুকূল একে একে দুগ্লাস উড়ালো। পাছে ও জলপথে আরও বেশিদূর গড়ায় এবং নিজের তোড়ে চাইকি আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে ওকে স্থলপথে টানবার চেষ্টা করলাম। বললাম: "তোমার শেষের ভ্রমণকাহিনীটা বলো দেখি, শোনা যাক্।"

"ভ্রমণ আর আমি করি না। করবও না। ভ্রমণকাহিনী নয়, সেসব আমার মতিভ্রমের কাহিনী—সে শুনে কি করবে!" এই বলে' অনুকূল আরেকটা বোতলের উপকূলে পৌছবার চেষ্টা করে।

"সেই যে সেবার কোথায়, ভামো না মিচিনা কোথেকে বেড়িয়ে এলে হে—?"

বলতে বলতে বোতলটাকে ওর হাতের আওতা থেকে সরিয়ে নিই।

"তুমি তো সেই এক চুমুক খেয়েই বসে আছো। আর বুঝি উৎসাহ পাচ্ছো না? বেশ, তুমি না খাও, আমিই খাই।" এই বলে' আমার সামনের টইটুম্বুর গেলাসটাকে ও টেনে নিল। "হ্যাঁ, অমৃতে আমার অরুচি নেই। সব্বাই জানে।"

এতক্ষণে বলতে কি আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম—"এবার তোমার ভামোর গল্প বলো, শুনি।"

"এই আমার একমাত্র ওষুধ। এই ওষুধ খেয়েই ভুলে থাকি ভাই, যতটা পারি এবং যতক্ষণ পারি। উঃ, কী কুক্ষণেই না মিচিনার সর্বনেশে কাচিনটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—সেই বুড়ো ডানটার সঙ্গে। ব্যাটা আশী বছর আগে মারা গেছে, কিন্তু আমার সর্বনাশ করে যেতে কসুর করেনি।"

"আশী বছর আগে, না আশী বছর বয়সে—কখন্ মারা গেছে বললে?" আমার কেমন খট্‌কা লাগে।

"কতো বছর বয়সে মরেছিল, ৮০ কি ৮০০, জানিনে। তবে মরেছে আশী বছর আগে, এটা আমি ভালোরকম জানি। আর মরেনি কেবল, সেই সঙ্গে হতভাগা আমাকেও মেরে গেছে।

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব?" আমার প্রত্যয় হয় না।

"কি করে সম্ভব হোলো, আগাগোড়া সব কথা শুনলেই তুমি বুঝবে। বুড়ো ডানটার সঙ্গে ঘনিষ্টতা করাই আমার ভুল হয়েছিল। ওর মরবার আগে পর্যন্ত, আশী বছর আগেকার কথা, মিচিনার

সবাইকে ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে। আমি সব জেনেশুনে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম। নিজের হাতে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনলাম নিজের ঘরে।" এই বলে' অনুকূল চুপ করে গেল।

"বেশ, তোমার ৮০ বছর আগের কথাই বলো, তাই শুনব।" আমি উস্‌কে দিলাম ওকে।

"আমার বছর পাঁচেক পূর্বের কথা। (অনুকূল শুরু করে।) সেবার যখন মণিপুর হয়ে কোহিমা-ইম্ফলের পার্বত্য পথে উত্তর-ব্রহ্ম ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম—তখনকার কাণ্ড। ঘুরতে ঘুরতে কাচিনদের দেশ মিচিনায় গিয়ে পড়লাম। মিচিনার এক গ্রামে এই বুড়ো ডানটার সঙ্গে আমার দেখা হোলো। আগে থেকেই অনেকের মুখে ওর পরিচয় পেয়েছিলাম। ওর গুণের কাহিনী কতো জনের কাছেই না শুনেছি। কিন্তু তাহলেও বলব, বুড়ো ডানটার কোনোই দোষে ছিল না, আমিই কৌতূহলের বশে গায়ে পড়ে ওকে দেখতে গেছলাম—ওর গাঁয়ে।

অবশ্যি এই ডানটা তখন জ্যান্ত ছিল না। আশী বছর আগেই সে অক্কা পেয়েছিল। কিন্তু তবুও, তখন পর্যন্তও সে সশরীরে ছিল একথা বলা যায়। নিজের স্থূল শরীরে বিরাজ করছিল, ঠিক একথা বলা না গেলেও একেবারে যে সূক্ষ্ম শরীর তাও নয়। প্রায় দুয়ের মাঝামাঝি।

ডাইনি কাকে বলে জানো তো? কয়েক শতাব্দি আগে ধরে বেঁধে যাদের পুড়িয়ে মারা হোতো, এটা ছিল তাদের এক পুং-সংস্করণ। তবে একে পোড়ানো বেশ একটু শক্তই ছিল। উল্টে এ-ই মিচিনার সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারত।

জীবদ্দশায় এর কাজ ছিল, ডাইনিদের মতই, শুধু তুক্-তাক্ করা।

কারো জরু কি গোরু কি কুঁড়েঘরের ওপরে তুক্ করে দিত, সে ভয়ে আর সেসব জিনিস স্পর্শ করতে সাহস পেত না এবং আশেপাশের অন্য কেউও তাদের প্রতি ফিরে তাকাত না। এমনকি, পরদ্রব্য কি পরস্ত্রী হলেও, নিতান্তই তাদের লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করত। ফলে হোলো কি, এই করে করে লোকটা অগাধ বৌ, গোরু আর কুঁড়ে-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল। সে অঞ্চলে তত্তুল্য বিত্তশালী আর কেউই রইলো না।

কিন্তু বড়লোক হওয়ার কী ঝামেলা, নিশ্চয় তুমি বোঝো। তুমি বড়লোক নও, কাজেই হাড়ে হাড়ে না বুঝলেও, তোমার কল্পনাশক্তি দ্বারা আন্দাজ করে নিতে পারবে। যে ব্যবসায় বড়লোক বানায়, স্বভাবতই সে পথে লোকের বড় ভীড়। অচিরেই এই ডাইনের লাইনেও রেষারেষি দেখা দিল। এই বুড়ো ডানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল এক নয়া ডান।

এই ছোক্‌রা ডানের কেবল মন্ত্রতন্ত্রেই নয়, গায়েও জোর ছিল বেশ এবং এর হাতেই বুড়োটার কপাল পুড়ল। কেবল কপালই নয়, কপাল থেকে সুরু করে আগাপাশতলার কিছুই পুড়তে বাকী থাকলো না।

তুষানলে দগ্ধ হওয়া কাকে বলে জানো কি? কখনো দগ্ধ হওনি, কি করে জানবে! এই কলকাতায় বাস করে কদাচ তোমার সে সৌভাগ্য হবে কি না সন্দেহ, কিন্তু মিচিনার সেই বুড়ো ডানটির হয়েছিল। তোমাদের কোনো অতি আধুনিক কবি কোনো বয়োবৃদ্ধ কবিকে একদা যেমন সমালোচনার আগুনে দগ্ধেছিলেন, এই নব্য ডানটিও তেমনি সেই প্রবীণ সম-ধর্মাকে বেশ করে ঝলসে নিল। শিক্‌কাবাব হয়ে তার চেহারার কেমন খোলতাই হয়েছিল আমি দেখিনি,

বাবুর্চিটিরও দেখা পাইনি, এইসব অগ্নিকাণ্ডের প্রায় আশি বছর পরে অকুস্থলে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম।

'একদিন কা-চিনে নেবে তারে…!'

আমি সেই বুড়ো ডানের মুণ্ডুটা কেবল দেখেছিলাম। আম শুকিয়ে যেমন আমসি হয়, তেমনি কোনো অলৌকিক কায়দায় সেটাকে খর্ব করে ফেলা হয়েছিল। ২ নম্বর ডান ১ নম্বরের মাথাটাকে দেহ থেকে ছাড়িয়ে, শুকিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কদ্‌বেলের আকারে নিজের ঘরের তাকের ওপর সাজিয়ে রেখেছিল।

আমি যখন মিচিনায় গেলাম, তখন তিন নম্বর ডানের রাজত্ব। এই তিন নম্বর ছিল দু নম্বরের শিষ্য—তবে গুরুমারা শিষ্য নয়। আমার কাছে তোমাদের আধুনিক কবিতার একখানা সংগ্রহ ছিল, তার থেকে কয়েকটা পদ্য তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। সে বললে, এই মন্ত্রগুলো আরো জবর। নিজের হরফে ছড়াগুলো সে টুকে নিল এবং

তার বিনিময়ে সেই এক নম্বরের মাথাটাকে আমাকে উপহার দিল। পেপার-ওয়েট করার মতলবে সেই মুখসর্বস্ব সওগাত আমি সঙ্গে নিয়ে এলাম।”

এত বলে’ অনুকূল চুপ করল। গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যেই, বলা বাহুল্য!

“তোমার গল্পের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর জায়গায় আসবার আগে আমায় জানিয়ো। আমি তৈরি হবো।” আমি বললাম।—“আমার হার্ট খুব দুর্বল কি না।”

“নিয়ে তো এলাম। মুখপাত্রটিকে আমার টেবিলেও স্থান দিলাম। এখন মিচিনায় একটা কিংবদন্তি ছিল, একদিন না একদিন ওই বুড়ো ডানের শুক্‌নো মুখে বোল্ ফুটবে। আবার সে কথা বলে উঠবে—যদি—কেউ তার মনের মত কথাটি কইতে পারে, তাহলে সে তার কাছ থেকে মুখের মত জবাব নিশ্চয় পাবে। আবার তাকে বাক্যবাগীশ করে তুলতে হলে কেবল যুতসই কথা বলে একবার তাকে উসকে দেওয়ার দরকার।

বলা বাহুল্য, সেদিক দিয়ে মিচিনার কেউ চেষ্টা করতে কোনো কসুর করেনি—কিন্তু তিন পুরুষ ধরে এত চেষ্টা করেও একটা কথা বার করতে পারেনি তার থেকে। আমিও আবার আমার টেবিলে সামনে রেখে কতো সাধ্যসাধনাই না করলাম—কিন্তু আধখানা অস্ফুট বাণীও কোনোদিন শোনা গেল না।”

“তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলে যে—?” বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে যাই।

“কলকাতার এই সভ্যতার অন্ধকূপে বাস করে পৃথিবীর কতটুক

তোমরা জানো ? যদি আমার মত দিগ্বিদিকে ঘুরে ঘুরে তোমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলত তাহলে জানতে যে, পৃথিবীতে অবিশ্বাস করবার মতো কিছু নেই। সব কিছুই এখানে সম্ভব।"

"তা বটে।" আমি বলি।

"হ্যাঁ—কী বলছিলাম ? কতোরকমেই না চেষ্টা করা হোলো, কিন্তু কিছুতেই তার মুখ খোলানো গেল না। বলতে কি, আমি বেশ হতাশ হয়ে গেলাম। আমার আশা ছিল, ওর মুখ থেকে ঘোড়দৌড়ের, শেয়ার মার্কেটের খবর-টবর আদায় করতে পারব। কিন্তু না, সে একেবারে, যাকে বলে, স্পীকৃটি নট্।"

"বোধহয়," আমি ব্যঙ্গের স্বরে বাৎলাই : "বিশুদ্ধ কাচিন্ ভাষায় বলা হয়নি বলে সে হয়ত গোসা করে থাকবে, তাই তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়নি। মিচিনার লোকের মত কথা পেড়ে কখনো দেখেছিলে কি ?"

"সেকথা বল্তে হয় না। ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার অভিপ্রায়ে মিচিনার কথ্য এবং অকথ্য দুরকমের ভাষাই আমি আয়ত্ত করে এসে-ছিলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। অবশ্যি ভেবে দেখলে ভাষার ইতরবিশেষে এক্ষেত্রে কিছু যায় আসে না। জানটা মারা যাবার পরে পৃথিবীর কোনো ভাষাই এখন তার অজানা নয়। সবার কথা, সব কথাই তার বোধগম্য। তবু, কোনো বিশেষ ভাষার প্রতি তার আসক্তি থাকা কিছু বিচিত্র নয়। এই কারণে কোনো ভাষাই আমি বাদ দিইনি, বাংলা, অসমিয়া, উড়ে, উর্দ্দু, হিন্দি সব কটাকেই কাজে লাগিয়েছিলাম। এমন কি, সংস্কৃত করে সুর করে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদি—হরতি দর তিমিরমতি ঘোরম্' বল্তেও

বাকী রাখিনি—কিন্তু এত করেও কোনো সুরাহা হোলো না। সে যেমন বোবা তেম্‌নি বোবাই মেরে রইলো।

আমি হাল ছাড়বার পর আমার বৌ তখন লাগলো। মেয়েরা কথায় ওস্তাদ কে না জানে—কিন্তু তার ওস্তাদিও ব্যর্থ হোলো শেষে। 'এখন কটা বেজেছে?' চিত্রায় আজ কী বই?' 'ভালো ডিজাইনের শাড়ি কোথায় পাবো?' 'কোন্‌ দোকানের গয়না সব চেয়ে চমৎকার?' ইত্যাদি থেকে সুরু করে ওর চেহারা আর স্বভাব চরিত্রের ওপর

ডান একান্তই বাম।

খোঁটা দিয়ে কথা বলতেও সে কুণ্ঠা করেনি—কিন্তু সে-মুখ তেমনি নির্বিকার। অবশেষে কথাটা চাউর হয়ে গিয়ে আমার পাড়াপড়শীরাও

এসে বাক্যালাপের চেষ্টা করলেন। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, পরচর্চা-মূলক কোনো প্রশ্নই বাদ গেল না। কিন্তু বুড়োর কোনো হুঁ হাঁ নেই।

সবশেষে একজন মনস্তাত্ত্বিকও এসেছিলেন। ফ্রয়েডীয় মতে ডানটার মনোবিকলন করে মোক্ষম্ মোক্ষম্ কত রকমের প্রশ্নই না তিনি ঝাড়লেন—এমন মোলায়েম সুরে এরূপ আদরকাড়া প্রশ্ন সব। যা কানের ভেতর দিয়ে একবার মরমে ঢুকলে, আকুল ব্যাকুল করে মর্মভেদী প্রত্যুত্তর টেনে বার করে এনে তবে ছাড়ে—কিন্তু সে সব ব্রহ্মাস্ত্রও বিফল হোলো। তাকে কথা বলানো দূরে থাক, একটু হাসানো গেল না পর্যন্ত।"

"খুবই দুঃখের বিষয়।" আমি বল্লাম। "সেই মনোবিকলনকারী এখন কোথায়?"

"রাঁচিতে বোধহয়। শেষকালে আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। ব্যাপারটা মিচিনার রসিকতা বলে মনে হতে লাগল। তারপরে আমাকে আরাকানে চলে যেতে হোলো—এই তো সেদিন—জাপানী আক্রমণের বছরখানেক আগের কথা। কিন্তু এবার পর্যটনে বেরিয়ে বেশিদিন বিদেশে থাকা গেল না। অকস্মাৎ চলে আসতে হোলো আমায়। আরাকানের এক অঞ্চলে এবার আমি মূল্যবান এক খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করেছিলাম। তাই নিয়ে এখানকার দু একজন মূলধনী বন্ধু পাকড়ে কোম্পানী ফেঁদে হঠাৎ বড়লোক হবার মৎলব আমার মাথায় খেলছিল।

যেদিন ফিরলাম সেইদিনই—সেই রাত্রেই আমার এক বন্ধুকে ফোন করলাম। একটু শুনেই সে এমন উত্তেজিত হোলো যে তক্ষুনি এসে আমার সঙ্গে কথা কইতে চাইলো। রাত তখন অনেক, কিন্তু

সে পাকা ব্যবসাদার লোক, তখন-তখনই পাকাপাকি করে ফেলতে চায়।

গোপন কথাবার্তা শলা পরামর্শের কোনো বাধা ছিল না। বৌ কোন্ সখির বাড়ি নেমতন্ন রাখতে গেছল, চাকরবাকরদেরও ছুটি দিয়েছিলাম, সারা বাড়ীতে আমি একলা। কোনো অসুবিধা ছিল না কোথাও।

মানুষ যা চায়, যা যা পেতে চায় জীবনে, তার সব—সমস্ত সাফল্য তখন আমার মুঠোয়। শরীর মনকে চান্‌কে নেবার জন্যে এক পাত্র ঢেলে পান করলাম। নিজেকে তৈরি করে নিলাম। এমন সময়ে ডানটার দিকে আমার নজর পড়ল। ওর কাছে এগিয়ে রহস্যচ্ছলেই আমি বল্লাম 'শোনো হাড়হাবাতে বুড়ো, কখনো যদি তোমার বোল্ ফোটে, আজ এখানে যা হবে তার একটি কথাও যেন কাউকে বোলো না। কক্ষণো না, বুঝেচ? আমার এক বিশেষ বন্ধু আজ রাত্রে আমার কাছে আস্‌চেন।"

অনুকূল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, বহুক্ষণ তার আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

"তারপর?"

"বল্‌ব কি, অবাক্ কাণ্ড!" বল্ল অনুকূল। "সেই ডানটা হঠাৎ ফিক্ করে' যেন হাসলো—আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারপর এক অনির্বচনীয় শুক্‌নো আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। তার মুখ খুলে গেল। আমি দিব্যি শুনলাম, সে বল্লে, 'হে বঙ্গজ, তুমি কী বল্লে, আবার বলো।'

আমার অযত্নোচ্চারিত ঐ কথার মধ্যে কি কোনো মন্ত্রশক্তি ছিল?

প্রায়.এক শতাব্দির মূক কণ্ঠ যে মুখর হয়ে উঠলো ঐ কথায় ? আমি আবার বল্লাম—যদি কখনো ফের তুমি কথা বলো তাহলে আজ এখানে যা যা ঘটবে তার একটি কথাও যেন কাউকে নয়—কক্ষণো না। আমার একজন বিশেষ বন্ধু আজ রাত্রে আমার কাছে আসচেন।

সেই ডানমুণ্ড হাস্‌তে লাগলো আবার।—"কী আশ্চর্য! হে বাঙালী, তুমিও যে দেখ্‌চি ঠিক সেই কথাই বল্‌চো! এই কথাগুলি এমনি রাত্রে তোমার বৌও যে আমায় বল্‌তো, মাঝে মাঝে যখন তুমি এখানে থাক্‌তে না—"

অনুকুল আর কিছু বল্ল না। ওর নাগালের বাইরে যে বোতলটাকে আমি সরিয়ে রেখেছিলাম তাকে হাত করার চেষ্টায় লাগল। আমি তাকে আর হাতড়াতে দিলাম না। নিজহাতে বড়ো বড়ো আরো দু গেলাস ভর্তি করে ওর হাতে তুলেদিলাম। এছাড়া ওর আর কোনো পরিত্রাণ আছে বলে আমার মনে হোলো না।

তুমি
এবং অন্যান্য কবিতা

তুমি

কোন্ আকাশে কতো লক্ষ আলোকবর্ষ আগে
ফুটেছিল একটি যে নীল তারা,
ছুটেছিল তাহার আলো কিসের অনুরাগে
কোথায় আত্মহারা।
সেই আলো কি শেষে
হারিয়ে গেল তোমার চোখে এসে ?

সেই হারাণো আলোর খোঁজে—সেই নীলিমার দ্যুতি
ধরতে কোনোকালে
আলোর পাথার সাঁতার দিয়ে আমার স্বর্গচ্যুতি
মাটির মায়াজালে—
সেই-আলো হায় নাই যদি হয় সাথী,
নেই-আলো হয় হাজার তারার বাতি।

একই সাথে যাত্রা সুরু করেছিলাম কবে
সূর্য এবং আমি।
ধূলার পথে আমার চলা, তাহার চলা নভে—
ছড়িয়ে দিবস-যামী।
যাহার তরে চলেছিলাম আমরা একা একা,
আজকে পেলাম দেখা।

এই ক্ষণটিই অনন্তক্ষণ, এইখানটিই শেষ,
এই তুমি সেই তুমি :
তোমার খোঁজে সারা আকাশ আমায় নিরুদ্দেশ—
ভূমা হলেন ভূমি !
তোমায় ধরার লাগি,
ভুবনেশ্বর সূর্য কাঁদে আমার অধর মাগি' ॥

একটি মেয়ে

একটি মেয়ের কথা বলতে পারো ?
সেই মেয়েটির ?
যার কথা শুনে শুনে জ্বলতে আরো
পরাণ অধীর !
সেই মেয়েটি, যে এলো আলোর গাঙে,
হাওয়ার চুমায় যার কপোল রাঙে,
সবারে যে ছুঁয়ে যায়, দেয় না ধরা।
কারো নয় যেই মেয়ে—
নয় আমারো।
ছল্ ছল্ ঢেউ তার ছলনাভরা—
তার আদরে-হেলায় ভাঙে,
ভাঙে দুই তীর।

সেই মেয়েটির কথা বল্‌তে পারো ?
যে নিরুদ্দেশ ?
যার পথ চেয়ে চেয়ে চলতে আরো
আঁখি অনিমেষ !
সেই মেয়েটি, যে এলে চকিতে পাশে,
লখিতে মিলায়ে যায় দীর্ঘশ্বাসে !
হৃদয়বিহীনা তবু হৃদয়হরা !
সেই মেয়ে কারো নয়,
নয় আমারো।
ভালোবাসা কারে বলে জানেনা তা সে !
তার একটি হাসির দামে
লাখো আঁখিনীর ॥

আয়না

আমার আয়নাতে ভাই আমারে যে কী খাসা দেখায় !
কেউ যদি দেখতে তা চায়
দেখুক্ না এসে মোরে আমার এ নিজের আয়নায়।
আমারো তো ভালো লাগে দেখতে আমায়—
প্রায় হয় সখ—
নিজেরে দেখতে ঘুরে ঘুরে।
তবু তাতে সুখ নাই, আরাম বৃথাই !
তবু বুঝি মোর মন ঝুরে……
কোনোদিন দেখ্‌ব কি আমার চমক্
তোমার ঐ চোখের মুকুরে ?

বায়না

সময় চলেছে ছুটে ঘূর্ণাবেগে স্রোতের মতন—
চলো না বেড়াই ততক্ষণ।

কোথায় বেধেছে যুদ্ধ রাজায় রাজায়,
ভূগোল ও ইতিহাস পাল্‌টিয়ে যায়।
সময়ের রক্ত ঝরে ক্ষতের মতন।
দূরের তারার ইসারায়
তাদের এড়াই ততক্ষণ।

তোমার শীতল হাতে সময় নিথর,
ইতিহাস-ভূগোলের থেমে গেছে ঝড়,
জীবন স্থবির।
পৃথিবী এখানে এসে হোলো বুঝি শেষ।
তোমার নয়ন দুটি অতল গভীর—
সময় সেখানে রহে স্থির ঃ
ভুবন এখানে নিরুদ্দেশ।
কালো সে গহনতলে করি না গাহন—
নিজেরে হারাই ততক্ষণ॥

সাড়া

কাল সারা রাত মোর চোখে নেই ঘুম :
বিছানায় পড়েছিলো চাঁদের আলো।
বিছানায় পড়েছিলো চাঁদের আলো,
জেগে জেগে শুয়ে শুয়ে কী শুন্‌ছিলুম !
সারা জগৎ বল্‌ছে হাঁ হাঁ—শুন্‌তেছিলুম,
বিছানায় পড়েছিলো চাঁদের আলো।

আকাশের মুখে বুঝি ভাষা যোগালো ?
'আছি আছি'—কে যে বলে, শুনি নিঃঝুম।
বিশ্বের হাঁ-হাঁ-কার শুন্‌তেছিলুম—
কোথাও নাস্তি নেই।

চোখে নেই ঘুম।
বিছানায় পড়েছিলো চাঁদের আলো ॥

ইসারা

না। যেয়ো নাকো।
না হয় কথা নাই রাখ্‌লে।
তবু তুমি কলকাতায় থাকো।
তুমি কলকাতায় থাক্‌লে
সারা কলকাতাটাই
বুঝি মিষ্টি থাকে।

একই ট্রাম লাইন্‌ গেছে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে :
তোমার সীমা ছুঁয়ে এসেছে আমার সীমানায়।
ট্রামে যেতে যদিও আমি থাম্‌ব না তোমার বাড়ীর কাছে,
জানি, তুমিও আর নামবে না আমার এখানে।
তবু তুমি কলকাতায় থাকো।....

তুমি কলকাতায় থাক্‌লে
সারা কলকাতাটাই আমার কেমন মিষ্টি লাগে॥

ভোগবতী

দ্বিধা ভয় চিন্তা ও সুবিবেচনার
শরশয্যায়
আমরা দুজন :
সূচিমুখ সহানুভূতির দক্ষিণায়নে :
আকণ্ঠ তৃষ্ণার্তি নিয়ে
অব্যর্থ মৃত্যুর অপেক্ষায়।
অথচ এখানে আছে—আছে এখানেই—
আশ্চর্য তৃষ্ণার বা।র—
অদ্ভুত আনন্দ আস্বাদের :
ভোগবতী প্রবাহিত এইখান দিয়ে—
এ-শরশয্যার তলে তলে।

যদি তুমি মুখ তোলো,
যদি আমি চাই,
বোধহয় খুঁজে পাই—
হাতের নাগালে পেতে পারি
হয়তো বা চিরদিনকার
লক্ষ্য ধানুকীর :
হাতে পাই অর্জুনের তীর—
যে-তীর টানতে পারে সে-ভোগবতীর
অমৃত-উৎসার ॥

মুহূর্তময়ী

সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে :
চঞ্চল শিশুর মত এই সময়
মার বুকে অচপল হয়ে থাকার মতই।
সমস্ত অতীত,
অনন্ত ভবিষ্যৎ,
আর অফুরন্ত বর্তমান
সেই স্থিরবিন্দুর থেকে উৎসারিত হয়ে—
অসংখ্য লোক আলোকের পাখায় ঘুরে ফিরে
সেইখানেই এসে মিলিত হয় ফের
প্রতিমুহূর্তেই।
বয়োবৃদ্ধ, সদ্যোজাত আর অনন্যতন—
মরে-যাওয়া কাল, বেঁচে-ওঠা কাল,
আর আগামী কালের ভ্রূণ—
চেনা আর অচেনারা—
সকলেই সেই বিন্দুবাসিনীর অক্ষয় কক্ষে এক :
একই স্তন্যপান করে' অমর, একরূপ—
কে কোন্‌টা চেনা যায় না :

যেখানে মহাকালের অসীম স্থৈর্যে
আমরা মৃত্যুহীন, মুহূর্তজীবী আর বিন্দুমাত্র।
সেই স্থির মুহূর্তে তুমি আমাকে উত্তীর্ণ করে' দিলে
এই মুহূর্তে, হে অপরিচিতা!
আমার অতীত ও ভবিষ্যৎকে স্তব্ধ করে' দিয়ে—
এই পিচ্ছিল ভঙ্গুর বর্তমানকে স্তম্ভিত করে'—
এই অস্থির জীবনাবর্তের মাঝখানে—
নিমেষের দৃক্‌পাতে—
কালাতীত সে কোন্ রহস্য তুমি
নিয়ে এলে, অয়ি মুহূর্তময়ি!
নিয়ে এলে এক মুহূর্তের জন্যই!
অফুরন্ত মুহূর্তের মধ্যে এই এক মুহূর্ত—
যে-মুহূর্তটিও না-ফুরোবার আবার—
কল্পসায়রে ভেসে ওঠা একটি পলের উৎপল!
কিন্তু সহস্রদল সে কল্পান্তস্থায়ী সৌরভে।
এই চকিতের অনিমেষ!
এক পলকের জন্য আমার চোখে তাকিয়ে
সেই সহস্রদল সময়ের মধ্যস্থলে—
মনের মণিকোঠায় নিয়ে গেলে তুমি আমায়—
সময় যেখানে চিরস্থির হয়ে রয়েছে
এই এক পলকের অপলক চাহনির মতই।
যেখান থেকে—
আর যেখানে থেকে—

আমি এক নক্ষত্রের আলো হয়ে ছুটে বেরিয়েছি—
নিঃসীম শূণ্য আর নিঃশেষ জড়তা ভেদ করে'—
কেন কে জানে !—
আর তুমি হয়তো আরেক আলোর আলেয়া—
যাত্রাশেষে ফিরে চলেচ নিজের অলকায় ।

আমি ছুটেচি ডালহৌসি স্কোয়ারের ট্রামে
আর তুমি চলেচ বালিগঞ্জের ॥

শেষ প্রশ্ন

"তুমি আমার ! আমার তুমি ! তুমি আমার !"
ঐ আকাশের প্রগল্‌ভতা আমার গলায় :
ছুটে চলার পথের মাঝে একটু থামার
মাঝখানে হায় একটি চুমার আমার বলায় ।
তুমি আমার ? এই ক্ষণটির এ-জিজ্ঞাসা
মুছে-যাওয়া আমার চুমায় পায় কি ভাষা ?

জবাব তো এর পেলাম নাকো তোমার কাছে :
এই ক্ষণে আর এই জীবনে মিথ্যে খোঁজা।
শূণ্য-হানা ঢেঁরা সইয়ে মূল্য বাঁচে?
চুমুর লেখায় স্বাক্ষর হায় যায়না বোঝা!
মনের আখর অধরপাতে ছন্নছাড়া :
একটি তারা আরেক তারার সঙ্গহারা।

তুমি আমার! হায়, একথার হয় কি মানে?
আছে কি এর কোনো দিনেও কোনো জবাব?
হয়তো আছে; তুমিই দেবে; হায় সেখানে
শ্রোতার স্থলে থাক্‌বে তখন আমার অভাব।
'আমি তোমার' এই কথাটি বল্‌বে যখন—
বল্‌বে তুমি অন্যজনার কণ্ঠলগন।

হয়তো আমি আমার জবাব তবুও পাবো,
হয়তো আমি তোমার গলার পাবো সাড়া
আরেক গলায় : 'আমার তুমি?' প্রশ্নলাভ ও
লক্ষ কথার একটি কথার সেই ইসারা।
হায়রে তখন এই কথাটির, জানি কি যে,
জবাব দিতে পারব কিনা আমি নিজে॥

ইতিহাস

ইতিহাস মুছে যায়—অনন্ত কালের ইতিহাস—
আপনারে রাখে না স্মরণে—
মনে কভু রাখে না কাহারে।
তবুও দক্ষিণ বায়ে ফুল ফোটে প্রত্যেক ক্ষণে—
প্রদক্ষিণে আসে বারে বারে
মুহূর্তের মধুপের রাস।

কখন্ সময় এল—সে সময় গেল যে কখন্—
রামধনু জাগ্‌ল আকাশে—
জীবনের যা কিছু পাবার
কখন্ লগ্ন এল—উন্মুখ ফুটেছিলে পাশে!
কখন্ যে এল সেই ক্ষণ
জীবনের সব হারাবার!

ইতিহাস ভুলে যায় কত কথা—মন্ত্রীর পতন,
মন্বন্তর, রাজার বিনাশ,
জয়পরাজয় জীবনের।
কবে তুমি ছেড়ে গেছ—তোমার সেই যে অযতন—
এ যাতনা আমার মনের
কেন যে মোছে না ইতিহাস!

দেশান্তর

চলো এক নতুন জগতে—এসো মোরা দুজনেতে যাই—
হাতের নাগালে আছে, যাওয়া যায় এক পা বাড়ালে,
কবি আর ঋষি আর পথিকের কথায় কথায়
জানা গেছে সে-জগত এখানেই রয়েছে আড়ালে।
এই ধূলিপথ দিয়ে যেতে যেতে, থম্‌কে দাঁড়ালে,
আকাশকুসুম ধরে' যাওয়া যায় তারায়-তারায়।

যাওয়া যায় তারার আলোয়! একটি পলকে ছায়াপথ!
এখানে যা মিনিটে মিনিটে কেটে চলে—এই যে সময়—
সেখানে তা মুহূর্তে উধাও! সে-জগৎ শুধু আলো নয়,
নয় শুধু মৃত্তিকারো—সেই এক আশ্চর্য জগৎ!
অন্য লোকে মন্দ বলে—তবু মন্দ নয় ভালো নয়;
স্বপ্ন নয়, তবু তারে জেগে দেখা যায় স্বপ্নবৎ।

স্বপ্নের মতন দেখা যাবে, জেগে জেগে, তোমাকে আমাকে
মহাকাল পার হয়ে সেথা যেতে একটি নিমেষ!
একটি নিমেষ লাগে পার হয়ে যেতে এত দেশ—
এত স্মৃতি—এত কথা—এত বাধা—এই জনতাকে।
অপরূপ সে-জগতে সকলই অপূর্ব আর বেশ—
যতোবার যাওয়া যায় নতুন নতুন লেগে থাকে।

সমস্ত নতুন লাগে যেন—সবই তার যদিও তো চিনি—
তোমাকেও চিনি নাকি? তথাপি আরেক পরিচয়
আছে যেন সে-জগতে: যেন আগে তোমাকে দেখিনি!
হেথা যা আশ্চর্য লাগে সেখানে তা নহে বিস্ময়।
সেথা তারা বাধ্য হয় এখানে যা বাধা চিরদিনই—
সেখানে উত্তর হয়ে আসে এখানে যা প্রশ্ন মনে হয়।

কাছাকাছি আছে সে-জগত—এ-পথেরই কোনো এক বাঁকে—
একটু উন্মন হলে আভাষ আসে যে সৌরভের!
এই বুঝি ছোঁয়া যায়, এই যেন পাওয়া যায় টের,
চকমকি চোখে পড়ে, নক্ষত্রের ঘ্রাণ লাগে নাকে।
কোন্ তারকার আলো—কতো লক্ষ আলোকবর্ষের
দ্যুতিপথ-পার-হয়ে-আসা যেন দেখায় তোমাকে।

'নমস্কার! কেমন আছেন?' 'ভালো আছি, আছেন তো বেশ?'
ভদ্রতায় মাখামাখি অমায়িক মোদের জগৎ—
হেথা হতে—বাঁধা-ধরা-পদে-পদে-বাধা-এই পথ—
হেথা হতে বহুদূরে—চলে যাই, এস না! বিশেষ
দূর নয়। এক পা বাড়ালে সেই ঠাঁই। আসে রথ
পুষ্পকের। নিয়ে যায় উড়িয়ে—নিমেষে নিরুদ্দেশ!

কাঁটা চামচের ঠুন্‌ঠুনি : তপ্ত কফি : 'বিল্ আনো, বোয় !'
এরই মাঝে সে-জগত কোনোখানে রয়েছে লুকানো—
আকাশকুসুমে বাঁধা—হাতের নাগালে লট্‌কানো :
তোমার চোখের পাশে—এখানের বাতাসে ঘুমোয়
সে-জগত। এই দণ্ডে এখুনি জাগানো যায় জানো ?
এখুনি নামানো যায় তাকে—এইখানে—একটি চুমোয় ॥

সূর্য-গোত্রা

অনন্ত কালের বালুতটে
সূর্যও আলেয়া :
তোমার উজ্জ্বল মুখপটে
সে-আলোর খেয়া।
যেমন সূর্যের রশ্মিলিখা,
অয়ি নিরুপমা,
হয় যদি শুধু মরীচিকা
তোমার সুষমা—
তবুও জ্বলুক্ ঐ শিখা
দৈবের দেয়া :

কাছে এসো তবু তাহলেও,
দাঁড়াও নিকটে,
সূর্যের মত তোমাকেও
করে' যাবো ক্ষমা ॥

প্রজাপতির নিবন্ধ

বেশি মেয়ে পাওয়া জীবনে কিছু না, বেশ মেয়ে পাওয়াই কঠিন। বেশি মেয়ে অনেক মেলে, তাতে চোখ ভরে গেলেও মন ভরে না। সত্যি বলতে, অনেক মেয়ে নিয়ে কী হবে? একটি মেয়ে, কিন্তু বেশ মেয়ে, মনের মত সেই একটিকে পাওয়াই যথেষ্ট। প্রেজেণ্ট্ টেন্সে তো প্রায় সব মেয়েকেই ভালো লাগে, কিন্তু অ্যাব্সেন্ট্ টেন্সেও ভালো লাগাতে পারে—আড়ালে থেকেও আবেশ জাগায়—কেবল তাকেই তো বল্‌তে হয় মেয়ের মতো মেয়ে? তাকে পাওয়াটাই হচ্ছে আসল! জীবনের দেবী মন্দিরে সত্যিকার প্রবেশ।

এই সব কথাই তড়িৎ ভাবছিল, তড়িদ্বেগেই ভাবছিল, হাওড়া ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে বসে' বসে'। কফির পেয়ালা হাতে চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠার মতো দেখাচ্ছিল ওকে।

ভেবে দেখলে বিদ্যাপতির সময়েও এই সমস্যা দেখা গেছে। নইলে 'প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক'—বিদগ্ধ কবির এই খেদোক্তি কেন? অবশ্যি, তড়িতের এমন কোনো আক্ষেপ ছিল না, সেই একটিকে সে পেয়ে গেছে—লাখের একেবারে গোড়াতেই—লাক্ যাকে বলে!—কিন্তু তড়িৎ আর জোৎস্নার মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ওর পিসীমা। পিসীমান্ত প্রদেশ পার হয়ে জোৎস্নায় পাড়ি জমানো, লক্ষ মেয়ের লক্ষ্যভেদ করে' প্রাণজুড়ানো একটিতে গিয়ে পৌঁছনোর মতই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তড়িতের পিসীমা একাই যে এক লাখ!

তবু মরীয়া হয়ে সে টেলিফোনটা হাতে নিল।—হ্যালো! কে? জোৎস্না না কি? জোৎস্না—, আমি? আমি হচ্ছি আমি আদি এবং অকৃত্রিম। তোমার তড়িৎ। আমি এখন এখানে।"

"এখানে মানে কোন্খানে?" জোৎস্নার গলা।

"এখানে মানে কোলকাতায়। এখন হাওড়া ষ্টেশনের খাবার-ঘরে। এইমাত্র বোম্বে মেল্ থেকে নামলাম। দিন দশেকের ছুটি পাওয়া গেছে। পিসীমার ওখানেই থাক্তে হবে, উপায় নেই। তবে তাঁকে লিখেছি যে, সন্ধ্যেয় পৌঁছব—আজকাল ট্রেণের ভারী গোলমাল—কিচ্ছু ঠিক নেই। অতএব, এখন থেকে বিকেল পর্যন্ত অবকাশ আমার হাতে।"

"দুপুরটাও আছে এর মধ্যে।" জ্যোৎস্না যোগ করে।

"অনিবার্য ভাবেই।...মধ্যাহ্নভোজনটা তোমাদের ওখানেই সারা যাবে সেটাও আমার ভাবা ছিল।" জানালো তড়িৎ।

"তাহলে তো ভাবনায় ফেল্লে! মা-টা সবাই বেলুড় মঠের উৎসবে গেছেন, ফিরতে সেই সন্ধ্যে। আমিও যেতাম, কিন্তু পরীক্ষার পড়া নিয়ে আমার যাওয়া হয়নি, কিন্তু ঝি-চাকর সবার আজ ছুটি, রান্নাবান্নার কোনো হাঙ্গাম্ নেই বাড়ীতে।"

"তুমি কী খাচ্ছো তাহলে?"

"সকালের পাঁউরুটির যে ভগ্নাবশেষ আছে, মাখন আর চিনি দিয়ে তাতেই চালাব এঁচে রেখেছিলাম।"

"কতো বড়ো রুটির ভগ্নাবশেষ?" তড়িৎ জানতে চায়।

"তা বেশ বড়োই।" জবাব আসে।

"তাহলেই হবে। আমার ব্যাগের মধ্যে কাঁকড়ার তরকারি

আছে। খাসা জিনিস! এই রেস্তোরাঁ থেকেই কিনেছি একটু আগে।...কেমন হবে রুটির সঙ্গে?"

কানাকানি!

"ওঃ! অদ্—ভূত!" জোৎস্নার উল্লাস শোনা যায়।

"তাহলে আমি ট্যাক্‌সি ধরলাম।" বলে তড়িৎ টেলিফোন ছেড়ে দিল।

এবং ট্যাক্‌সির মতই হুড়মুড় করে উঠল গিয়ে জোৎস্নাদের ফ্ল্যাটে। প্রথম আলাপের মৌখিকতা ইত্যাদি মামুলি মিস্টিমুখের পরে কাঁকড়ার প্রসঙ্গ এল।

"দেখি কেমন কাঁকড়া?" জোৎস্না জিজ্ঞেস করে।

"স্যুটকেশের মধ্যে আছে। খুলি, দাঁড়াও।" স্যুটকেশের মুখ খোলে তড়িৎ।

অদ্যকার দিবসের সবচেয়ে বড়ো খবর (কিম্বা খাবার) বলেই

বোধহয় আজকের খবরের কাগজে মুড়ে রাখা, পায়জামার আচ্ছাদনে ঢাকা সেই কাঁকড়ার কাবাব! অত্যন্ত স্নেহভরে সন্তর্পণে তড়িৎ তার ঘোমটা খুলল।

"অদ্ভুত!" প্রথমদর্শনেই জোৎস্না বিগলিত হয়।—"দাঁড়াও, ততক্ষণে আমি রুটিটা কেটে মাখন মাখিয়ে ফেলি!" বলে' সে লাফিয়ে ওঠে। যে-কাঁকড়ার কামড়েই মানুষকে লাফাতে হয় তাতে কামড় বসাবার সুযোগ পাওয়া কিছু কম লোভনীয় নয়—ভেবে দেখলে।

"ইস্! এর ঝোল দেখছি অনেক দূর গড়িয়েছে। খবরের কাগজ ভেদ করে' আমার পায়জামা পর্যন্ত—" তড়িৎ একটু আপ্‌সোস্ করে। কিন্তু তক্ষুণি সে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—"যাক্‌গে!"

"যাবে কেন? টাট্‌কা দাগ তো, গরম জল ঢাল্‌লেই ধুয়ে যাবে। আমি কেচে দিচ্ছি এক্ষুনি।"

"না না, ও নিয়ে তুমি ব্যস্ত হোয়ো না।" তড়িৎ নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"ব্যস্ত কিসের! চায়ের জল তো চাপাতেই হবে। ষ্টোভ ধরাই—"

"তা হোক্। তোমায় ধুতে হবে না আমার পায়জামা।"

"বাস্! বিচ্ছিরি দাগ থেকে যাবে যে!"

"থাক্ গে! কে দেখ্‌চে আমার পায়জামার দাগ? আমি তো একলা শুই।"

"কতক্ষণের হাঙ্গাম্? কেচে টাঙিয়ে দেব, বিকেলের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে—ভাবচ কেন?"

শুকোনোর দিকটা মোটেই ভাবছিল না তড়িৎ, কাজটার শুষ্কতার কথাই তাকে পীড়িত করেছে। জল ফুটিয়ে তার পায়জামা পরিষ্কার

করছে জোৎস্না, এহেন নির্জলা ব্যাপার সে ভাবতেই পারে না। জোৎস্নার চিন্তাধারা কিন্তু অন্যরকমের।

রুটি কাঁকড়ার চর্বনের সাথে তাদের চিরন্তন সমস্যা দেখা দিয়েছিল—খেতে খেতে পিসীমার কথা আলোচনা করছিল ওরা। "বাবা যে কী মুস্কিলেই ফেলে গেছেন"—দীর্ঘনিশ্বাসসহ জানাচ্ছিল তড়িৎ, "তাঁর উইলে পিসীমাকে সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টি করে গিয়ে! তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি বিয়েই করতে পারব না। যদি করি উইলের সর্ত-মতো একটি পয়সাও পাব না আমি আর। ভাবো দেখি, কী বিপদ!···হায়, মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন! তাহলে আমার আর এদশা হোতো না!" আবার সে তার দীর্ঘনিশ্বাস পাড়ে।

"কী দরকার আমাদের সম্পত্তির?" জোৎস্না আপত্তি জানায়। "কী হবে বেশি টাকায়? দুজনে মিলে চাকরি করে' চালিয়ে নিতে পারব। পারব না?"

"সেটা চাকুরে-জীবন হবে। দাম্পত্যজীবন হবে না।" তড়িৎ এবার দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলার চেষ্টা করে।—"আমার পিসীমা যদি অতটা সেকেলে না হতেন, কী সুখের যে হোতো!"

"আমাকে তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না।" জোৎস্নাও পাণ্ডুর হয়ে আসে।

"বিয়ের কথা তুলব কি, তোমার সঙ্গে মিশতে পর্যন্ত মানা, তা জানো?" তড়িৎ ঝিলিক্ মারে।—"বালিগঞ্জের মেয়েরা তাঁর অসহ্য। তোমাদের কথা তিনি সইতেই পারেন না। তোমাদের সম্বন্ধে তিনি মনে মনে যা ভাবেন তা মুখে আনা যায় না।"

"তাঁর ধারণা, আমরা, বালিগঞ্জের মেয়েরা প্রজাপতির পাখায় উড়ছি। তাই না?"

"কেবল পাখায় উড়লে তো রক্ষে ছিল। তার চেয়েও বেশি"—তড়িৎ আলোক হানে।—"তার চেয়েও বিচ্ছিরি।"

"মানে, কেবল উড়ছিই না, ওড়াচ্ছিও? তাই তো? মানে, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে দুদিনে তোমার সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে ফতুর করে' তোমায় পথে বসাবো—এই তো?"

"এ তো বটেই, কিন্তু এর চেয়েও আরো। কেবল এ ভাবলে তো কথাই ছিল না,—কিন্তু আমার পিসীমার কল্পনার দৌড় আরো বেশি। তিনি ভাবেন—তিনি ভাবেন যে—কি করে' যে তোমাকে আমি বোঝাই—! তিনি মনে করেন যে তোমাদের কাছে আমরা অসহায় শিশুমাত্র। ছলে বলে কৌশলে তোমরা—কি বলে গিয়ে—তোমরা আমাদের—কি করে' যে বলা যায় কথাটা।—এক কথায়, তোমাদের কাছে ঘেঁষলে আমাদের পতিত্বহানি হবার ভয় আছে। এবার বুঝেছ?"

প্রকাশ করে' বলার প্রয়াসে তড়িতের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। জোৎস্না হাস্‌তে থাকে।—"মানে, তোমাদের বখিয়ে দিতে পারি, এই তো?"

আহার-পর্বের পর আবার চায়ের জল চেপেছিল। প্রথম কেট্‌লির জলে পায়জামাটা ধুয়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে আল্‌নায়। কিন্তু কাঁকড়া-ঘটিত পাকা রঙ একেবারে যাবার নয়,—ফ্যাকাসে-মার্কা হয়ে রয়ে গেছে তখনো। তবু জৌলুষের চটক্ ঢের কমে গেছে বল্‌তে হবে।

পেয়ালা পিরিচ্ সাজিয়ে কেট্‌লিটা নামাতে যাবে, এমনসময়ে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ এল। দরজা খুলে দিতে গিয়ে জোৎস্না দেখল—সরাসরি চোখের সাম্‌নে—তড়িতের পিসীমা!

চোখাচোখি!

পিসীমার চোখে চাবুক—সংকল্পের দৃঢ়তা তাঁর চিবুকে।—"তোমার মাকে একটা কথা বলতে এলাম।" তিনি বল্লেন।

"মা-তো বেলুড়ে গেছেন আজ। দাদা-টাদা সবাই।" জোৎস্না জানায়ঃ "আমি একলা আছি বাড়ীতে।"

"বেশ, তাহলে তোমাকেই বলে' যাব। তোমার সম্বন্ধেই কথাটা। আমাদের তরুর বিষয়ে। তরু আজ সন্ধ্যের গাড়ীতে আস্‌ছে—" পিসীমা সুরু করেন।

"ও—আজ আসছেন বুঝি—?" জোৎস্না আমতা আম্‌তা করে। কী বল্‌বে, কী বলে' যে পিসীমাকে দরজা থেকেই বিদায় দেবে সে ভেবে পায় না।

"হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেয় আসবে। তাই আগে থেকেই তোমাকে স্পষ্ট করে' জানানো আমি কর্তব্য মনে করছি। আমি চাই না যে—"

চাইতে না চাইতেই সেই দুর্ঘটনা। আগামী সন্ধ্যার তড়িৎ এই মুহূর্তেই বিকশিত হয়ে ওঠে—হঠাৎঃ "কার সঙ্গে কথা বলছো জোৎস্না? মা-রা ফিরে এলেন নাকি?"

"তরু—তড়িৎ—!" পিসীমা চমকে ওঠেন।

"আপনি—আপনি কি ভেতরে আস্‌বেন না?" জোৎস্না অনুরোধ জানায়। কিন্তু অনুরোধের অপেক্ষা ছিল না। তার আগেই পিসীমা তড়িৎগতিতে তড়িতের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়েছেন। "—তরু, তুই আমায় অবাক্ করেছিস্!"

তড়িৎ থতমত খায়।—"আমার গাড়ী সন্ধ্যেয় আসবার কথা ছিল পিসীমা, কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে এখন কোনো কিছুরই তো সঠিক নেই, দৈবাৎ আজ সকালেই এসে গেল—"

"সকালে ? সেই সকালে এসেছিস্ তাহলে ?" পিসীমা আরও বেশী অবাক্ হন। "বলিস্ কিরে ?"

"সকালে মানে—এই একটু আগেই তো। এই পথ দিয়ে যাবার সময়ে ভাবলুম একবার জোৎস্নাদের সঙ্গে দেখাটা করে যাই—"

"সকালে মানে, একটু আগে ?" বিস্মিত স্বগতোক্তি শোনা যায় পিসীমার। এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ঘরময় ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ঘরের মেজেয় উন্মুক্ত স্যুট্‌কেশের ওপরে পড়ে। সেখান থেকে এক লাফে গিয়ে আলনায় ওঠে। ভিজে পায়জামার গায়ে গিয়ে ধাক্কা খায়। তারপর তার দাগের জায়গায় গিয়ে আটকায়। সে দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে থাকে, তার পর আর ঘোরে না।

পিসীর নির্বাক তীব্রদৃষ্টির অনুসরণ করে' তড়িতের হৃৎপিণ্ডও বুঝি স্থির হয়ে আসে। তার পায়জামার মতো তাকেও যেন দাগী দেখাতে থাকে। জোৎস্নাও খুব ম্লান হয়ে পড়ে।

"বুঝেছি।" কী যেন বুঝে পিসীমা ঘাড় নাড়েন।

"ও—ওই পায়জামাটা ? বড্‌ডো ময়লা হয়ে গেছল—তাই একটু কেচে টাঙিয়ে দিয়েছি।" তড়িৎ বলে' ওঠে। কিন্তু ওই কথা বলে' ধোপ্‌দুরস্ত পায়জামাকে পরিষ্কার করা সহজ ন । বরং সেই দুশ্চেষ্টায় পিসীমার মনের সন্দেহকে যে আরো কালো করে ঘোরালো করে' তোলা হোলো মাত্র পরক্ষণেই তা সে টের পায়।

"গরম জলে এত করে' কাচলুম তবু—তবু কাঁকড়ার দাগ কি সহজে ওঠে ?" জোৎস্না সাফাই দেয় এবার। মরীয়া হয়ে সেও একটা শেষ চেষ্টা করে।

"ঠিক।" পিসীমা বলেন: "ঠিক কথা।" তড়িতের দিকে তাকিয়ে।

তড়িৎ ঘাড় হেঁট করে' কী যেন ভাবে, তার পরে দৃঢ়স্বরে জানায়: "পিসীমা, তোমাকে একটা কথা বলবো? আমি জোৎস্নাকে বিয়ে করতে চাই।" পিসীমার সম্মতি এবং পৈতৃক সম্পত্তি লাভের আর কোনো আশা তার নেই জেনেও—এই অভাবিত অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে পৌঁছে—একথা সে না বলে' পারে না। কাঁকড়াঘটিত ঘটকালির এই কালিমা আর সুযোগ সে ঘাড় পেতে নেয়।

"যতো শীগগির তা করো ততই মঙ্গল। ততই সবার পক্ষে ভালো।" পিসীমাও না বলে' পারেন না: "আমি এতদিন যা ভয় করছিলাম তাই হয়েছে। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—এখন—একটু কাগজ কলম দাও তো আমায়। তোমাদের বিয়েয় আমার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন, আমার অনুমতিটা দিয়ে যাই।"

এই বলে' ৪৪০ গজের দৌড়ে শেষপর্যন্ত এসেও হেরে যাবার মত পিসীমা এক হাঁপ ছাড়েন।

নব্য উপকথা

"আমি একবার এক বর্মী মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম—প্রেমঘটিত ব্যাপার, বুঝতেই পারছো!—মেয়েটিই প্রেমে পড়েছিল আমার। কিছুদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি।...এত টাকা ছিলো মেয়েটার যে কী বল্‌বো!" বল্ল নিবারণ: "এমন কি, তাকে লক্ষপতিও বলা যায়।"

বলে' আরামচেয়ারটায় আরো আরাম করে' বসল সে।

"লক্ষপত্নী বলো।" ভুলটা আমরা শুধ্‌রে দিতে চাই।

"না, তা আমি বল্‌ব না। কিছুতেই না। মেয়েটির একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল, সে আমি। তবে এতদ্বারা ব্যাকরণের সীমা লঙ্ঘন হচ্চে যদি মনে করো তাহলে আমি তাকে লক্ষপতির মেয়ে বল্‌তে রাজি আছি। কিন্তু তা বলবার একটা অসুবিধা এই যে, মেয়েটির বাবা ছিল না। ছিল নিশ্চয়ই, তবে আমি যখন গেছলাম তখন ছিল না।"

"কেন, লক্ষপত্নী বল্‌তে তোমার বাধচে কোথায়?" আমরা শুধোই: "তুমি একাই যখন একলক্ষ, ভেবে দেখ্‌লে। তা, সেকথা যাক, সেই বর্মী মেয়েটির সঙ্গে কোথায় তোমার মুলাকাৎ হোলো শুনি?"

"কেন, বর্মায়? আবার কোথায়? বর্মী মেয়েদের আড্ডা যেখানে। রেঙ্গুনেই তো! যেবার প্রথম আমি রেঙ্গুনে গেলাম। অবশ্যি, এই যুদ্ধের আগে।" জানালো নিবারণ: "মাসখানেক আমার স্রেফ্ রাজার হালে কেটেছিল।"

"মেয়েটি জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়িয়েছিল বুঝি? তুমি নেমে মাটিতে পা দেবামাত্র তোমাকে লুফে নিয়ে চলে গেল, তাই না?"

"না, তা নয়।" বল্ল নিবারণ: "তখন তো সে আমাকে চিনত না, নামই জানত না আমার, তবে—" নিবারণ আরও বিশদ করে: "এছাড়া আর যা বলছ, তা প্রায় ঠিক। আমি সব্বার শেষে জাহাজ থেকে নামলাম। মেয়েটি তখন ডকে দাঁড়িয়ে। তখনো দাঁড়িয়ে—সবাই নেমে চলে গেছে—তখনো।"

"তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে, তা কি আর তুমি বুঝতে পারোনি? কেন, আমরা তো বেশ বুঝতে পারছি—এইখেনে বসেই। তোমার বোধ শক্তি এত কম, ভাবলে অবাক হতে হয়।"

"অবাক হবার কথাই। আমিও কম অবাক্ হই নি। মেয়েটি আমার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল, সে কথা সত্যি।"

"তার রোল্‌স্ রয়েস্ সমেত, তাই না? আর তোমাকে দেখেই বলে উঠ্‌ল, এসো, ওঠো গাড়ীতে, বাড়ী চলো লক্ষ্মীটি।...তাই না?" আমরা বল্লাম।

"না, তা বল্ল না।" জবাব দিল নিবারণ: "বাড়ী যাবার কথাই বল্ল না। বল্ল যে তুমি একজন বাঙালী। বাঙালীকে আমরা খুব পছন্দ করি। আর এটা হচ্ছে বর্মা মুল্লুক। বাঙালীরা এখানে বর্মী মেয়ে বিয়ে করতেই আসে, একথা আমাদের অজানা নয়। আর এসেই কাউকে না কাউকে বিয়ে করে ফ্যালে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। যদি নিতান্তই বিয়ে করতে হয়—আচ্ছা, সেকথা পরে হবে। এসো এখন, এক কাপ্ চা খাওয়া যাক্।"

"না চাইতেই চা! আহা!" বল্‌তে কি, আমার জিভেও জল এসে গেল (তবে সেই বর্মী মেয়েটির জন্য নয়)—"তুমি কী বল্লে ?"

"আমি ? আমি একবার মেয়েটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম।" নিবারণ প্রকাশ করলো।

"মানে, তার চা-পানের আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করা যায় কি-না বিবেচনা করে দেখলে ?"

"খুব উঁচু ঘরের মেয়ে, দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এইটুকু একটুখানি মুখ কি করে যে এত সুন্দর হতে পারে, তা স্বচক্ষে দেখলেও বোঝা যায় না। না দেখলে তো নয়ই। সে-রূপ আর সেই মাধুরি—তোমার কাছে তার এক বর্ণও আমি বর্ণনা করতে পারব না। যাই হোক্, তার সঙ্গে চা খেতে আমি আপত্তি করলাম না।"

"বলাই বাহুল্য।" বল্লাম আমরা।

"আমরা একটা রেস্তোরাঁয় গেলাম। সেখানে চা এবং চায়ের সঙ্গে অনেক 'টা' এসে গেল। চা-টা খেতে খেতে মেয়েটি বল্লে, নিবু, তোমার মতো চমৎকার ছেলে আমি জীবনে দেখিনি।"

"য়্যাঁ, বলো কি ? প্রদীপ জ্বল্‌বার আগেই নিবু ? নিবারণের আগেই নিবু-নিবু ?" আমরাও কম চমৎকৃত হই না।

"বাঃ, এরমধ্যে আমাদের নাম জানা-জানি হয়নি নাকি ? তাছাড়া মেয়েটি চোস্ত বাংলা জানত। ওর বাবা ছিল বাঙালী, মা বর্মী, বুঝেচ এবার ?"

"এতক্ষণে বুঝলাম। তোমার বেফাঁস করার পর।"

"মেয়েটি বল্লে, নিবু, তোমাকে আমি ভালোবাসি।···শুনে আমার হাসি পেল।" বল্ল নিবারণ।

"আমাদেরও পাচ্ছে।" আমরা না হেসে পারিনা। হাসতেই হয়। "কদ্দিন আমি বর্মায় থাকবো, জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। আমি

অনিবার্য মেয়েটি!

বল্লাম, এই হপ্তা দু'য়েক কি তার কিছু বেশি। আমি বেড়াতে এসেছি এখানে। দেখতে এসেছি বর্মা-মুলুকটা কেমন। আমি

বল্লাম।…'সে আমাকে দেখলেই টের পাবে, কেমন আমাদের মুলুক।' মেয়েটি বল্ল আমায়। আরো বল্ল যে তোমাদের ভারতবর্ষ যেমন সারা পৃথিবীর এপিটোম্—আমিও তেমনি আমাদের বর্মার—ভালো কথা, এপিটোম্ মানে কি হে শিবু?" নিবু আমায় জিজ্ঞেস করে।

"একটা পিঠ।" আমি সরল করে' দিই: "সাধু ভাষায় যাকে বলে পীঠস্থান। সংস্কৃত করে পীঠম্ বলতে পারো।"

"তাহলে আমি সেই মেয়েটিকে পৃথিবীর অন্তপিঠ বল্‌তে চাই।"

"স্বচ্ছন্দে।" নিবারণের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হয়।

"মেয়েটি রেস্তরাঁ থেকে আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল—মানে, তার নিজের পীঠস্থানে। সে কী-একখানা বাড়ী হে! বাড়ীর বর্ণনা দেব?"

"না না। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি বেশ।" বাধা দিয়ে আমরা বলি।

"বাঁচালে! আসল দেবীকে ফেলে, দেবীর পীঠস্থানের মাহাত্ম্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আমার ভালো লাগে না।…'আমার এত টাকা যে কি করে' খরচ করব ভেবে পাই না। তুমি যে ক'দিন বর্মায় আছো, এবিষয়ে—এই টাকা ওড়ানোর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে তো? কেমন? আমার দিকে তাকিয়ে…এই কথাই বল্ল মেয়েটি আমায়।"

"কথার মতো কথা! তা, তুমি কী বল্লে?"

"আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, বেশি বাজে খরচ করা ঠিক নয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কোনো যুক্তি-তর্কই মেয়েদের কাছে কখনো খাটে না। আমাকে রাজি হতে হোলো। কী করব?"

"তুমি খুব মহাপ্রাণ। সত্যিই।" আমাদের স্বীকার করতে হয়।

"তারপরে আমরা দু'জনে মিলে টাকা ওড়াবার কাজে লাগলাম। দিনরাত ফুর্তি করে'—সাহেবিহোটেলে খানা খেয়ে—সিনেমা-থিয়েটার দেখে—এটা সেটা কিনে—কতো আর ওড়ানো যায়? পরের টাকা এনতার্ পেলেই বা কি, টাকা ওড়াতে আমি আবার তেমন পারি না। অভ্যস্ত ছিলাম না তো কোনোদিন। ওড়াতে ওড়াতে আর উড়তে উড়তে শেষটায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।" ক্লান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল নিবারণ।

"আহা, বাছারে!" আমাদেরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আহা, বেচারার ওপর দিয়ে কতোরকমের ধকলই না গেছে!

"দু'দিন আর দু'রাত নাগাড়ে—সে কী ফুর্তি! কিন্তু অতো ফুর্তি আমার ধাতে সয় না। আগে কখনো অভ্যেস নেই তো! আমি তো ভাই, কাৎ হয়ে পড়লাম। মেয়েটি আমাকে কাহিল দেখে বল্লে, 'তোমার বায়ু-পরিবর্তন দরকার।'

আমাদের একজন বলে' উঠ্‌ল—"ঠিক! নিবরণের এখন যে-বয়েস তাতে হয় বিবি নয় টিবি একটা কিছু না ধরে যায় না। এমন কি ওদের একটা ধরলেও আরেকটা ধরতে পারে—একটার পর একটা!"

"টিবি তোমাদের ধরুক্।" নিবারণ মুখ গোমড়া করে বলে।

"আহা, ওর কথায় কান দিয়ো না। গানের যেমন গিটকিরি, তেম্‌নি টানের জন্য টিটকিরি। মেয়েটির তোমার ওপর টান্ দেখে ওর খুব প্রাণে লাগ্‌ছে। তাই ও-কথা বল্‌ছে—তুমি বুঝচ না?"

"তা কি আর আমি বুঝিনে? হিংসেয় জ্বলে মরছো সবাই—আমার সৌভাগ্য দেখে। তা জ্বল্‌বেই তো, আশ্চর্য নয়। এখন যা বল্‌ছিলাম

মেয়েটি বল্ল, 'তোমার হাওয়া বদ্‌লানো দরকার। চলো তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। সহর থেকে দূরে পাড়াগাঁয় আমাদের বাড়ী আছে—সেই দেশের বাড়ীতে দিনকতক কাটালেই তুমি চাঙ্গা হয়ে উঠবে।' আমি বল্লাম, সেই ভালো। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় লোক। সহরের হৈ চৈ আমার সহ্য হয় না।"

"শান্তি বুঝি সেই মেয়েটার নাম?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আহা, শোনোই না ছাই। বাধাই দিচ্ছ কেবল। না, শান্তি তার নাম নয়। শান্তির চোদ্দ পুরুষ না। তারপর মেয়েটির মোটরে আমরা তার পাড়াগেঁয়ে বাড়ীর দিকে পাড়ি দিলুম—সে-ই গাড়ী চালিয়ে চল্ল।" ভাবে বিভোর হয়ে চুপ করল নিবারণ।

"আবার থাম্‌লে কেন?" তাড়া লাগাতে হোলো—"গাড়ী চালাতে চালাতে থামতে আছে?"

"বর্মার পাড়াগাঁ যে কী সুন্দর তা' আর কী বল্‌ব! ছবির মতো ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল আমাদের পথের দু'ধারে। অনেক অপরূপ গ্রাম পার হয়ে অবশেষে একটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে আমরা থামলাম।"

"আর বল্‌তে হবে না।" আমরা বলি: "সেই মেয়েটির বাড়ী।"

"ধরেচ ঠিক। নির্জন পাহাড়তলীর একধারে প্রাচ্ছন্ন সেই বাংলো। বাংলোর সংলগ্ন বাগান—বাগান কি উপবন তা' আমি ঠিক বল্‌তে পারব না। তবে গহন অরণ্য তাকে বলা যায় না। যাই হোক, তার সহরের বাড়ীতে তবু অনেক দাসদাসী ছিল,...এখানে একটিমাত্র অশীতিপর বুড়ো লোক—সেই ছোট্ট বাড়ীটুকু আগ্‌লাচ্ছে। মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল।"

"ভুতুড়ে বাড়ী বুঝি ?" শুনেই আমাদের সবার গা ছম্‌ছম্‌ করে।

"না না, ভুতুড়ে বাড়ী কেন হবে ? কেউ অদ্ভুত রকম হাসি হাসলে বুঝি ভুতুড়ে ব্যাপার হয় ? তার অদ্ভুত হাসি দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে সেই ছোট্ট বাড়ীখানায় ঘরের মত ঘর মোটে একটি। আর সেইটিই শোবার ঘর। আমি তাকে বল্লাম, আমায় যদি বারান্দায় শুতে হয় তো আমি গেছি—"

"বাঘেই টেনে নিয়ে যাবে, তাই না ?" আমরা আন্দাজ পাই।

"বাঘ না তোমাদের মুণ্ডু। মেয়েটি বল্লে, বারান্দায় কেন, তুমি আমার ঘরে থাকবে। তুমি হচ্ছ আমার অতিথি। অতিথি নারায়ণ।"

"তখন তোমার অদ্ভুত হাসির পালা এল, কেমন ? কী বলো ?"

"তখন আমি তার অদ্ভুত হাসির মানে বুঝতে পারলাম। এতক্ষণে আসল মানে টের পেলাম। সত্যি, এত প্যাঁচ জানে মেয়েরা! আমি কিন্তু বল্লাম, না, তা কি করে হতে পারে ? আমি তা কখনো পারব না। আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি তো। আমি বল্লাম।"

"। ! !" আমরা বল্লাম—নিবারণের কথা শুনে না ব[illegible] আমরা পারলাম না।

"অবাক হচ্ছো ? কিন্তু অবাক হবার কিছুই [illegible]তে নেই তোমাদের সমস্বরে নির্বাক হতে দেখে আমিই বর[illegible] [illegible]বাক হলাম এসব বিষয়ে জানোই তো, আমি হচ্ছি সেকেলে—পুরোদস্তু মরালিষ্ট। আমার মতে, প্রেম করা হচ্ছে এক, কিন্তু"—কিন্তুকে [illegible] আর বেশি খোলসা না করে' আরো খানিকটা নিজের খোলস্‌ ছাড়ে "তোমাদের একেলে [illegible]তিআধুনি[illegible]দের মতো এসববিষয়ে আ[illegible] অতোটা প্রগতিশীল নই, একথা তোমরা তো জানো ?"

"জানি বই কী।" এতক্ষণে আমাদের কথা বলার ক্ষমতা ফেরে : "তুমি যে জ্যান্তলিষ্টের ভেতরে পড়ো না তা কি আর আমরা জানিনে?"

"আমার কথা শুনে হাসতে লাগল মেয়েটা।" নিবারণ জানালো।

"হাসবেই তো। না হেসে কি করে?" আমরা মন্তব্য করি— "নারীমাত্রই আনাড়ি দেখলে হেসে থাকে।"

"বেশ, ঘরে থাক্‌তে তোমার আপত্তি থাকে, আমরা দু'জনেই না হয়, বারান্দায় থাক্‌ব। যদি তুমি নেহাৎ ঘরের বার করতেই চাও।—" মেয়েটি এই কথা বল্লে আমায়।"

"তুমি তাই চাইলে?" আমরা জান্‌তে চাইলাম। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর—?"

"না।" বল্ল নিবারণ: "ভেবে দেখলাম, বারান্দার চেয়ে ঘরই প্রশস্ত। ও যখন আমাকে ছাড়া থাকবে না তখন আমি আর কী করতে পারি? আমাব যতটুকু কর্তব্য করা গেল—বলেই আমি খালাস। তারপর ও যদি আমার কথায় কান না দেয়—নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে তাতে আর আমার কী করবার আছে? তোমরাই বলো।"

"কিচ্ছু না।" আমরা সায় দিই: "তোমার কী? যার যাবার যাবে। তোমার কী যায় আসে?"

"তারপর যে ক'দিন আমি বর্মায় ছিলুম, দিনের বেলায় সহরে আমরা খেতে যেতুম, আর সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসতুম সেই বাংলোয়। কী আরামেই না স্বপ্নের মতো সেই দিনগুলি আমাদের কেটেছিল। আহা!"

"আ হা হা!" ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আহাকার শোনা গেল।

"দিন কুড়ি আমরা একসাথে কাটিয়েছি—শয়নে, স্বপনে, আহারে

বিহারে, মোটরে এবং পদব্রজে—সেই সুখের দিনগুলি!—প্রত্যেকটি দিনের—তার প্রত্যেক মুহূর্তের প্রত্যেকটি কথা এখনো আমার মনে ভাস্ছে। সে স্মৃতি আমার যাবার নয়। এ-জীবনে না।”

“তা, তোমার সেই মেয়েটির নামটি কি?” আমরা শেষ প্রশ্নে এলাম অবশেষে।

“মেয়েটির নাম? নাম? নাম—বর্মী মেয়েদের নাম যেমন হয়ে থাকে—তাই! তাছাড়া আবার কি?” নিবারণের উপসংহার হয়।

—“তোমরা নেহাৎ গাধা তাই নাম জিজ্ঞেস করছো। আমি তার নাম বলে' দি, আর তোমরা তার বদ্‌নাম গেয়ে বেড়াও—মাইরি আর কি!”

তিলোত্তমা
এবং অন্যান্য কবিতা

মনিকার প্রতি

আকাশের মাঝে খুঁজেছিনু রামধনু,
খুঁজেছি তো কতোদিন—
খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম ঐ তনু।
যেদিন হইতে দেখেছি তোমারে, মনু,
রামধনুর আর আমার নেই গরোজ,—
আকাশ-মায়ায় আমি যে আস্থাহীন!
সেদিন থেকে তো রোজ
সকাল-সন্ধ্যে তোমারই করেছি খোঁজ।

দেখতে পেলাম, তোমারে দেখতে পেয়ে,
কতো রামধনু বন্দী তোমার দেহে ;
আকাশ—সে চায় আরো যদি রামধনু
নিতে পারে ঢের তোমার নিকটই ঋণ।
তোমার নিজের অণু-
মাত্রই দিলে রামের ধনুর্বাণ—
বাজবে আকাশে আকাশে।

রামধনু গড়ে তোমার হাসির ছলে
রামধনু ঝরে তোমার চোখের জলে—
কোন্ অলক্ষ্য ছায়াপথ থেকে গলে'
কতো রামধনু—মোর দু-চোখের ভোজ—
তোমার আকাশে মিনিটে মিনিটে আসে।
আসে আর যায় চলে'।

যেদিন হইতে দেখেছি তোমায় মনু,
রামধনুর আর নেইক মোর গরোজ।
রামধনু বাঁধা রয়েছে আমার পাশে ;
আকাশে কখনো তাকাইনে তার আশে।
সেদিন থেকে তো রোজ,
সকাল-সন্ধ্যে তোমারই করেছি খোঁজ ॥

অরণ্যরোদন

কোথায় মোদের মিলন হবে যে চাও যদি তুমি জানতেই,
এর পরে কবে মিলব ?
নয়ক লেকের, নয় শহরের নির্জন কোনো প্রান্তেই—
ফের পরে যবে মিলব।
কোথায় মিলব ? ধরো যদি মিলি নতুন ব্রিজের মাঝটায়
জনতার ঘন স্রোতে ? অ্যাঁ ?
কিম্বা যেখানে হাজার হাজার মিনিটে মিনিটে আসে যায়—
হাওড়া শেয়ালদোতে ? অ্যাঁ ?
জনারণ্যের মতন এমন জনহীন আর ঠাঁই কই ?
কার চোখে আর পড়বে ?
হাজার মুখের ঢেউয়ের ওপরে ভাস্‌বে ও-মুখ-পদ্মই—
শুধু মোর চোখ ভরবে।
হাজার মুখের মুখর ঢেউয়ের ওপরে দুল্‌বে ওই মুখ—
আর তার দোলা লেগে হায়,
হাজার মনের ঘন গাহনের তলায় দুল্‌বে এই বুক
কোন্ তরঙ্গ-দোল্‌নায় !

তুমি কি জানো যে এই লোকালয় এম্‌নিই হয় জনবিরল
তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে ?
এত ট্রাম্ বাস্—উর্দ্ধশ্বাস ঘর্ঘর আর কোলাহল,
কোথায় পালায় আড়ালে !

জনারণ্যের মতন বলো না এমন কী আর নির্জন ?
কার চোখ আর টান্‌বো ?
কানে কানে কথা বলার ছলায় করো যদি ভুলে চুম্বন,
তুমি আমি শুধু জানাবো ॥

মতবদল

বলেছি তোমারে নাই বা থাক্‌লে তুমি,
আরো কতো মেয়ে আসবে !
এখুনি তো এলো বলে' !
তারা কি আমাকে কম কিছু ভালোবাসবে ?
কিন্তু এখন ভেবে ভেবে হই খুন—
কি করলে রাখা যায় তোমায়—
(করেছি কী মুখ্যুমি !)
মুখ ফুটে বলা হোলো যে দায় ঃ
'যেয়োনাকো তুমি চলে' ।'
বল্লে তুমি তো হাস্‌বে ।

সেদিন তোমারে বলেছি, বাংলা বই
সিনেমায় আমি দেখিনে কক্ষনোই,—
আগাগোড়া ভরা নাকের চোখের জলে,
নির্ঝাল নির্নুন !

একদম্ শুধু বাজে।
তার পরে যতো বখাটে লোকের ভিড়!
কিন্তু এখন লাগ্‌ছে আমার ধোঁকা,
(কি করে' যে আমি হলাম এতটা বোকা!)
এমন সুযোগ হারালাম কোন্ ছলে!
বাংলা সিনেমা বই
অমন অর্দ্ধোদয়-
যোগাযোগ বলো আর-কিছুতে কি হয়?
(এমন ছবি যে ছবি না দেখলে চলে।)
সমস্ত ঘর জমাট্ আঁধারভরা
তোমার হাতটি আমার মুঠোয় ধরা—
তোমার আমার গায়ে-গায়ে-ঠেকানোই—
ঘন জনতার নির্জনতার মাঝে।

বলেছি তোমারে, ভালোবাসা শুধু ধুয়ো—
সব ফাঁকি আর ভুয়ো—
অকারণে যতো সময় ইত্যাদির
নিছক বাজে খরচ।
কিন্তু এখন কেন যে হই অধীর,
বুকের কাছটা কেন করে খচ্‌খচ্।

তিল থেকে তাল

তিলোত্তমা

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার অতো কাছে ?
তুমি আর তোমার ঠোঁটের নিচের
ছোট্ট ঐ তিলটি !—
সারা আকাশের সব আলো
তোমাদের দুজনের কে চুরি করলে কে জানে !

তবু ঐ কালো তিল,
তুমি কি জানো তিলোত্তমা,
তোমার কতো বড়ো শত্রুকে তুমি
লালন করছো নিজের চিবুকে ?
যেখানে ও ঠাঁই নিয়েছে সেখান থেকে
তোমার প্রাপ্য রাজকরের—
রাজারা যে কর দিয়ে থাকেন রাণীদের—
তার অনেকখানিই ও চুরি করবে,
তা জানো ?

তালোত্তম

কিন্তু রাজার সাম্রাজ্য নাই হোলো,
অল্পেই আমার সুখ।
তিলমাত্র আমার প্রত্যাশা,
তার বেশি আমি আকাঙ্খা করিনে।
সূর্যের মতন তুমি একাকী—
আর অন্ধকারের মত গাঢ় ঐ তিল ঃ
যেন অমাবস্যার সূর্য-তপস্যা।
সূর্যের আলো যেমন অন্তুর প্রদাহ,
তেমনি তোমার ঐ ছোট্ট কালো তিল
তোমার অবারিত আলোর অনুরোধ।
কিসের অনুরোধ কে জানে!

নিখিল ভুবনের যেমন একটি শূন্য-
সমস্ত জ্যোতির যেমন একটি মহাকাশ—
সারা বৃত্তের মাঝখানে যেমন নাকি তার কেন্দ্র—
তেমনি একলা তোমার ঐ ছোট্ট তিলটি।
একক হয়েও সে অফুরন্ত ঃ
একটু হলেও সে অনেকখানি ঃ

বৃত্তের মাঝে থেকেও সে উদ্বৃত্ত,
সমস্ত ইতিবৃত্তের সার কথা—
সম্পূর্ণ একটি বৃত্তান্তই বুঝি সে!
আড়ম্বর না রইলেও আরম্ভ তার :
ঐখানে শেষ হলেও তার অসীম বিস্তৃতি।

ঐ তিলটি পেলেই তো হয়!
(যদি ওকে ধরতে পারি নিজের অধরে)!
বিরাট মহীরূহের যেমন একটু বীজ—
মহামারির একটিমাত্র বীজাণু—
তেমনি তোমার ঐ সামান্য ভূমিকা থেকেই
হয়তো বা গিয়ে পড়তে পারি
কোনো এক অসামান্য অপরূপ উপাখ্যানে :
ঐ তমসা থেকেই বোধহয়
লোকোত্তর কোনো এক আলোকে যাওয়া যায়
ঐ বিন্দুমাত্রার যাত্রা থেকেই, কে জানে,
হয়তো ছড়িয়ে যাওয়া যায় তোমার রূপালী আকাশে।
বীজাণু যেমন আপনা থেকেই নিজ-গুণে ছড়ায়।
তেমনি বুঝি তোমার ঐ তিলমাত্র-লাভেই
পাওয়া যায় সম্পূর্ণ-তোমাকেই—
তিলে তিলেই পেতে হয় যদিও।......

তোমার অনন্ত জীবনের থেকে
কবে তুমি দেবে আমায় এক মুহূর্ত—
একটু কালের একটি কালো তিল।
যে-মুহূর্তের পরমাণু বুঝি বা অন্নপূর্ণার পরমান্নই :
ভিখারীকে করবে মৃত্যুঞ্জয়।
জাগিয়ে তুলবে আরেক অনন্ত কালকে :
জন্ম দেবে আরেক সূর্যের অনুরূপ :
একটি ক্ষণের অফুরন্ত ক্ষরণ :
অপরিসীম অন্বয়।

অয়ি মুহূর্তময়ি তিলোত্তমা,
সেই তালেই আমি রয়েছি॥

হয়তো

হয়ত লভিতে পারি একটি মেয়ের ভালোবাসা,
হয়ত লভিব ;
চুমুর মতন, আমি পাব সে মেয়ের ভালোবাসা,
যক্ষুণি দিব।
এত বড়ো এ পৃথিবী চকিতে নিরালা হয়ে যাবে
সে এসে দাঁড়ালে ;
এত বড়ো এ আকাশ কোথায় লুকায়ে রয়ে যাবে
তার আঁখি-আড়ালে।

মৃত্যুর মতন সে যে হরে' নেবে সকল ভুবন
আমার নিমেষে ;
আপন মায়ায় নব—আসল কি নকল—ভুবন
নিজে গড়বে সে।
বিধাতার সমকক্ষ সেই মেয়ে সৃজনে-সংহারে !
খেয়ালের ঝোঁকে
এক বিশ্ব ভেঙে পুনঃ আর বিশ্ব গড়িবারে পারে
চক্ষের পলকে।
তারে পেলে জীবনের—পৃথিবীর—সব পাওয়া যায়,
যাকিছুর মানে।
বিধাতার স্নেহ পাই সে যে ভালো বাসলে আমায়,
আসলে এখানে।

পিছনে রহিবে পড়ে যতো মোর তুচ্ছতা ব্যর্থতা
গত ইতিহাসে—
লক্ষ-জনমের-চাওয়া লক্ষ-জীবনের সার্থকতা—
পাব তার পাশে।
জান্‌ব কি সৃষ্টির আদিমক্ষণের অভিলাষ
তার আঘ্রাণে
জীবনের স্বাদ আর মরণের আশ্চর্য বিলাস
পাব মোর প্রাণে ?

যে-আমি হারিয়ে গেছে ফের বুঝি ফিরবে সে ঘরে,
যে-আমি ঘুমায়
জাগবে সে নব বর্ণপরিচয়ে নতুন আখরে
তাহার চুমায় ?
হয়ত বা নয়কো তা, যেমন এ পুরনো পৃথিবী,
আরো যতো মেয়ে,
তেমনি সে চোট্‌খাওয়া—লোভ-দ্বিধা-কামনার ঢিবি
আরেকটি মেয়ে ॥

শেষ উত্তর

অনেক মেয়ের আমি পেলাম চিঠি—
অনেক মেয়ের।
আঁকা ছিলো তাতে বাঁকা কি চাহনিটি ?
তাদের স্নেহের
ফল্গুর পরিচয় পাওয়া গেল ঢের।

আমার আঁধারে তারা কী লিখে গেল
চপলাবেগে ?
আমার আকাশ বুঝি মেঘে মেঘালো
সে-মায়া লেগে।
কোথাও কোনো কি তারা রহিল জেগে ?

আমি কি লিখিনি চিঠি মনোহরণের
যতো অদেখায়—
যতকিছু কথা ছিলো আমার মনের
আমার লেখায় ?
আদর-আখর যতো রেখায় রেখায় ?

হায়রে আঁচড় টানা কল্পতরুর
ঝরণ-পাতায় !
আজ মনে হয় বৃথা সব কিছু সুর !
কালের খাতায়
চিঠি আর চিঠিদাতা সব মুছে যায়।

কতো ঝড় কতো জল যায়, আকাশে
থাকে তার দাগ ?
মেঘেদের অশ্রু তো সেখানে হাসে
রামধনু-রাগ !
আকাশ কি মনে রাখে কাহারো সোহাগ ?

আমার আকাশ আর তোমায় আকাশ—
বড়ো তার চেয়ে
আছে এক মহাকাশ, পাখীর পাখায়
যায় না যা ছেয়ে।
সে-ই লেখে শেষ চিঠি, শোনো সোনা মেয়ে ॥

স্বাক্ষর-শিকার

বাসায় ফিরে একটি খাতা টেবিলের ওপরে পেলাম। কে নাকি আমার জন্যে রেখে গেছেন! কে তিনি আবিষ্কার করা খুব কঠিন হোলো না—খাতার প্রথম পাতাতেই লেখা : "তীর্থরেণু : সংগ্রাহক, Aditya Kumar Mukherjee alias Badal" এবং তারপরে, দক্ষিণ ব্যাঁটরার একটা ঠিকানা।

এই 'ওরফে বাদলকে' আমি চিনিনে, কিন্তু না চিন্‌লেও, ছেলে-পিলেদের কেউ যে, তা বোঝা খুব কঠিন নয়। কেননা, খাতাখানি অটোগ্রাফের!

বেশ মোটা-সোটা এক্সারসাইজের খাতা। গোড়ার দিকের এক সার, সই আর টিপ্পনিতে টইটম্বুর দেখা গেল—কিন্তু বেশির ভাগ পাতাই সাদা। আঁচড় পড়েনি এখনো। এই বাজারে এতগুলি সাদা পাতা একত্র দেখলে লোভ হয়।

আমার উদ্দেশ্যে কেন যে এটিকে রেখে যাওয়া হয়েছে বুঝলাম না ঠিক। খাতার মালিক নিশ্চয়ই এটা আমাকে উৎসর্গ করে' যান্‌নি। আকস্মিক বৈরাগ্যে, বইয়ের প্রতি রাগে, যদিবা সেই-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, দয়া করে' দাতব্য করে' গিয়ে থাকেন আমায়, তাহলে এর সাদা পাতাগুলোয় চমৎকার চিঠি লেখা চলবে, আর—, আর লেখাগুলোর পাতায় বেশ দাড়ি কামানো যায়। অনেকে স্বাক্ষরের উপরে বেশ বড়

বড় কথা লিখেছেন দেখলাম। বড় বড় কথা আর ভালো ভালো কথা। বড় ভালো কথা। এই সব উদাত্ত বাণী চোখের সামনে রেখে, যুদ্ধঘটিত এই দুঃসময়ে দাড়ি কামাতে বসলে ভোঁতা ব্লেডেও অনেকখানি প্রেরণা পাওয়া যাবে আমি আশা করি।

সংগ্রাহকের প্রথম সংগ্রহই শ্রীগীতা থেকে :

"কর্মই জীবন, কর্মই পুরস্কার, নিষ্কর্মা জীবন মৃত্যুর নামান্তর মাত্র— (গীতা)।"

এবং সংগ্রহ হচ্ছে কর্মের প্রকারান্তর। এবং কিছুটা গ্রহও বই কি! গ্রহণকর্ম আর কর্মভোগ একাধারে!

অন্যান্য বাক্যও, কারু চেয়ে কেউ বড় কম যায় না। যথা: সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—

"প্রশস্ত ললাটে মোর নিজ হস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার ;
অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপ-শিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।"

এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :
"সৃষ্টি হতে এত হিংসা এত দ্বন্দ্ব এত হানাহানি
মানুষ করেনি ধ্বংস—মানুষের জয় হবে জানি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা :

"এত ঝড় জল মেঘ যায়,
আকাশ কি কিছু মনে রাখে?"

এবং ঠিক তার তলাতেই আনুষঙ্গিক আরেকজন কার কথামৃত :

"আমাদের এঁদো রাস্তায়
শুধু হায় কাদা জমে থাকে।"

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন :

"যে লোক চলিতে চলিতে শ্রান্ত হয় না—সে মৃত, তার জীবনে সফলতা কখনও আসে না। সুতরাং চল—চল—চল—"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের চাঞ্চল্য :

"যেই সূর্য—সেই আলো, সেই সূর্য—তার আলো—" (আর তারপরেই ডট্-ডট্-ডট্··· !) নিছক ডট্কার !

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি :

"সমগ্র জীবনের পাতে যদি নাম লেখা না থাকে, তবে শুধু অটোগ্রাফে লাভ কি, একথা আমি বুঝি না।"

আমি বুঝবার চেষ্টা করি, কিন্তু এই আনন্দদায়ক বিবেকবাণী ভালো করে' আত্মসাৎ না করতেই দেখি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন :

"মানুষ একবারই জীবন-যাপনের সুবিধা পাইয়া থাকে, কাজেই এই জীবনের সম্পুর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। অতীতের জন্য বিলাপ বা অনুতাপ না করিয়া বাকী জীবনটুকু ব্যক্তিগত উৎকর্ষ-সাধন ও সামাজিক কল্যাণে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

কিন্তু বিলাপ না করলেও শেষ পর্যন্ত যে বিলোপ অনিবার্য একথা ভাবলে দুঃখ হয় !

এবং পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক ফাঁকে ইংরেজিতে যে ছত্রপাত করেছেন, বাংলার অনুবাদে তা এই দাঁড়ায় :

"আমাদের মোম বাতির জ্বলেছে দুই ধার,
সারা রাত নয়ক এ টেঁকার,
এক্ষুনি ফুরালো।
কিন্তু তবু চেয়ে ছাখো শত্রুরা আমার,
আর বন্ধুরাও, কী চমৎকার
ছাড়িয়েছে এ আলো!'

আর শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল :

"অনেক তৃষ্ণা বলিয়াই এই উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বপ্ন আর আদর্শ বার বার চূর্ণ বিচূর্ণ হয় বলিয়াই এই বিদ্রোহ। অক্ষমতা আর বাধার জন্যই হৃদয় ভাঙিয়া এই দুরন্ত হাহাকার, নিজেকে কোনমতে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারি না বলিয়াই এই বেপরোয়া জীবন।

এবং শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি, তদুত্তরেই কিনা বলা যায় না, বলেছেন :

"যে ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।'

কিন্তু হেমন্তকুমার চাটুজ্যে মশায়ের বাৎচিৎ একটু সেকেলে, তিনি বলছেন (বিলিতি বয়েতে) :

"ভালো হও, ভালো কাজ করো, আর ভালো ভালো চিন্তা করো।"

সুনীলকুমার ধর (নরনারী) মহাশয়ের সমস্যা :

"টু বি অর্ নট্ টু বি ছাট্ ইজ্ দি কোয়েশ্চেন্।"

কোশ্চেন্ বটে এবং উত্তরও বইকি—একাধারে দুইই মনে হয়! ব্রহ্মই যেমন ব্রহ্মেই সদুত্তর এবং নিজের চূড়ান্ত তেমনি টু বি-ই হচ্ছে প্রশ্ন, আর নট্ টু বি-ই তার শেষ জবাব!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৫২, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্) বলেছেন:

"দুঃখ-দৈন্য-অপমান ও ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যুর করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে—'ভগবান আছেন, তোমার ভয় নাই!'—আজ আমি শুধু নিজেকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি।"

তাঁর বাড়ীর কাছের মাঠটা অচিরে আ-কার বদ্‌লে মঠে রূপান্তরিত হবে আশা করা যায়। আগামী সেই অভূতপূর্ব গোচারণের স্থলে তখন যদি আমাদের মত অভাজনদের জন্য নিয়মিত মালপোর ব্যবস্থা থাকে তাঁর গৌরবে আমরাও গৌরব অনুভব করতে পারব। কিন্তু আমাদের পরিমল গোস্বামী মশাই এসব ব্যক্তিগত তত্ত্বের কুজ্ঝটিকাভেদ করে' একেবারে সর্বজনিক সমস্যায় নেমে এসেছেন! তিনিও ভগবানকে টেনেছেন, কিন্তু তাঁর টানাটানিটা অন্যরকমের। তাঁর বক্তব্য:

"নিম্নলিখিত ব্যাপারে ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

চাউল এক মন ৪০৲ কাপড় ধুতি ১ জোড়া ১০৲

চিনি—পাওয়া গেল না। ময়দা—পাওয়া গেল না।

আটা দুসের—তেরো আনা……পথে ক্ষুধার্ত নর-নারীর ভিড়।"

চাউলের চল্লিশ টাকা মণে ভগবানের সব আগে মনোযোগ দেয়া দরকার বলে' আমার মনে হোলো—অবশ্য, ভগবানের মন বলে' যদি কোনো বালাই থাকে। তবে তাঁর রাজ্যে, উল্লিখিত ওরকম দামী

ধুতির জোড়া মেলে না একথা আমি মানব না, সম্প্রতি তের টাকায় একখানা আমাকেই কিনতে হয়েছে। চিনি, আমার বরাতে, পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চেনা যায় না। তবে তেরো আনায় ছুসের আটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, পরিমলবাবুপ্রসাদাৎ জানতে পেলে, পথের ক্ষুধার্ত নরনারীর ভিড় একযোগে (ভিড়ে আরো ১ যোগ করে) আমিও বাড়াতে প্রস্তুত ছিলাম।

কতজনে তো কতো কথাই বলেছেন, কিন্তু খাতাটির যথার্থ মানে পাওয়া গেল *শ্রীমান্ নির্মল দাসের কটাক্ষ থেকে—*

"সযতনে যারা স্বাক্ষরলিপি কুড়ায় অহর্নিশ
জানে নাক' তারা—তীর্থরেণুর বদলে লভেছে বিষ ;
দেখিনি তীর্থে তীর্থরেণুরে শুনিনি হৃদয়-বেণু,
তীর্থ-যাত্রী-চরণ-প্রান্তে হেরেছি তীর্থরেণু।"

আমার অভিজ্ঞতাও সেইরকমই। সর্বত্র রেণুর দেখা মেলে না। দৈবাৎ আমি এক তীর্থে দেখেছিলাম—কাশীতেই একবার। সে কিন্তু কারু চরণ-প্রান্তে থাকবার নয়, তীর্থযাত্রী হোক্ আর যাই হোক্! সেধরণেরই নয়, দেখে শুনে যদ্দূর আমার ধারণা হোলো। এমন কি, কারুক্কে চরণপ্রান্তে থাকতে দিতেও প্রস্তুত নয় সে। ভারী দজ্জাল মেয়ে।......

শিল্পী শৈল চক্রবর্তী কিছু লেখেননি, হাতীমার্কা এক ছবি এঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। ছবির দ্বারাই এক হাত নিয়েছেন। হাতীটা সই করতে পারার আনন্দে চার পা তুলে নাচছে, না, তার ভয়ে চোঁ চাঁ

পালাচ্ছে, নাকি, অটোগ্রাফের খাতায় নিজের কেরামতি দেখিয়ে দেবার জন্যেই শুঁড় বাড়িয়েছে—বোঝা দায়!

ভাবলাম, এতগুলি স্বর্ণাক্ষরের পাশে, আর শ্রীশৈলর এই বিচিত্রনের এক কোণে, অলঙ্কৃত সোণার যেমন বাণি লাগে, তেম্নি আমারও একটুখানি কোনোখানে লাগিয়ে রাখি। কিন্তু আমার বাণী, শোনার অনুপযুক্ত হয়ত না হলেও, চেপে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করলাম। ভূতের বোঝা আরো বাড়িয়ে কী লাভ?

সত্যি বলতে, ছেলেদের স্বাক্ষরকুড়ানোর আমি বিরুদ্ধে। ছেলেরা Hero-Worshippr হবে এটা আমি চাইনে। আমাদের দেশে হিরোওয়ার্শিপিং-এর কোথায় যেন গলদ্ আছে—এই মনোভাবের থেকে এখানে নতুন হিরোর সৃষ্টি হয় না; Zeroদের সংখ্যাই বেড়ে যায় কেবল। তাছাড়া, হিরোই বা কে? ছেলেদের কাছে হিরো কে আবার? বৃহৎ বটের অপেক্ষা বটের চারা তো ছোট নয়—বিরাট বটেরই সগোত্র সে—সময়ের আপেক্ষিকতায় উভয়েই সমান। নিজের ভাবনার সহযোগে আর সম্ভাবনার যোগে—প্রত্যেক ছেলেই—অতীতের এবং বর্তমানের সকল বৃহৎ আর মহতের সমকক্ষ। নিজের কক্ষচ্যুত হয়ে, কক্ষে কক্ষে ঘুরে, অপরের স্বাক্ষর কুড়ানোর এ দুর্দশা কেন তার?

তবু স্বাক্ষর যদি আত্মসাৎ করতেই হয়, মেয়েরা করবে। মেয়েদেরই এই কাজ। সত্যি নয় একথা মনেমনে জান্লেও, কোনো মেয়ের কাছে আমি যে হিরো, একথা ভাবতে ভালো লাগে। তাছাড়া, কবিদের কত ভালো ভালো বচন, কত না প্রবচন রয়েছে—মেয়েলি অটোগ্রাফের খাতায় পুনরুদ্ধার করবার মতো। যেমন, এই ধরুন্ না,

"সমাজ সংসার মিছে সব—
মিছে এ জীবনের কলরব........."

কী ঈঙ্গিতপূর্ণ এই দুই পংক্তি! তেমন তেমন খাতা পেলে তক্ষুনি তক্ষুনিই উৎরে দেয়া যায়। অক্লেশেই! কিন্তু এ কি কোনো ছেলের অটোগ্রাফের খাতায় উপস্থিত করা চলে?

কিম্বা মনে করুন, 'আমারে যে ডাক দিবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া' ইত্যাদি! এই সব মর্মভেদী হাঁকডাক কি যেখানে সেখানে ছাড়বার মতো? ছড়াবার মতন?

বড় জোর কোনো ছেলের খাতায় এই 'অচিন্ত্যনীয়' বাক্য তুলে দেওয়া যায়:

"কল্পনার শেষ চূড়া
স্পর্শ করা যায়
আছে কি তেমন স্পর্দ্ধা
তব কল্পনায়?
কল্পনার যেই শৃঙ্গে
বাঁধো তুমি ঘর,
তারো উর্ধ্বে আছে জেনো
উত্তুঙ্গ শিখর।"

বড় জোর এই। ছেলেপিলেদের ধরেবেঁধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীমে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো। ব্যস্! তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের চূড়ান্ত করা হোলো, এছাড়া আর কী করবার আছে?

কিন্তু মেয়েদের বেলায় ছাড়পত্র অত সহজ নয়—উভয় পক্ষেই। কোন্ কবি একথা লিখেছিলেন?—

"পা-দুখানি কাছে আনো মনোহারিকে,
চুম্বনে দেব তাতে কবিতা লিখে।"

যিনিই লিখুন, এমন কথা খুসি হয়ে আমিও লিখতে পারতুম। ভেবে দেখলে, সেই অটোগ্রাফের খাতাও যেমন সুন্দর, আর এরূপ সই করবার কায়দাটিও কেমন চমৎকার! দুইই নিখুঁত!

অতএব নিখুঁত ভাবে ভেবে দেখলে, কেবল মেয়েরাই স্বাক্ষর-শিকার করবে। অকুতোভয়েই তারা করতে পারে—তাঁদের Zero-য় দাঁড়াবার সম্ভাবনা অতি বিরল, হিরোদের ওয়ার্‌শিপার্‌ হওয়া তাদের ধাতে নেই—উক্ত হিরোদের নিজের ওয়ার্‌শিপার্‌রূপে না পেলে অন্ততঃ। তাঁদের বেলা এটা যেমন স্বাক্ষর-শিকার, তেম্‌নি স্বাক্ষরকারীকেও শিকার। দেবতার লীলাও বলতে পারেন, দেবীর ছলনাও বলা যায়।

কিন্তু মেয়েদের বেলায় যেটা কেবল লীলা, নিছক Sport—ছেলেদের বেলা সেই কর্মই মৃত্যুদায়ক। এই শ্রীমান্‌ বাদলের উচিত ছিল, সজনী দাস অবধি এগিয়ে, তাঁর বাক্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সেইখানেই ক্ষান্ত হয়ে নিজেকে সেলাম্‌ করতে করতে ফিরে আসা। 'যে করে নিজেরে নতি সে লভে সবার নমস্কার'—মকরধ্বজের মত সর্বরোগহর ক্লৈব্যঘাতক এমন কাব্য, গীতায় শ্রীভগবানের সেই বিখ্যাত ধনঞ্জয়-প্রহারের পরে আর দেখা যায় নি!

ছেলেদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর-বিলাসী তাদের জন্য সজনী দাসের ঐ স্বীকারোক্তিই মোক্ষম্‌। তারা নিজেরা স্বাক্ষর করুক্‌—অপর কারো অটোগ্রাফের খাতায় নয়—নিজের জীবনে এবং নিজেদের কীর্তিতে। তাদের বাক্য আর ব্যবহারে—মনে আর চিন্তায়—জ্বল্‌জ্বল্‌ করুক্‌ সেই স্বাক্ষর-লেখা!

তবে মেয়েদের বেলা সজনীবাবুর ওই কথা খাটে না। মেয়েরা নিজেদের নতি করতে চায় না—ওই নামমাত্র কসরতের জন্য তাদের জন্ম নয়—অত অল্পে তাদের তুষ্টি নেই—তারা অপরকে নত করতে ইচ্ছুক। এবং যদ্দূর জানা গেছে নিজের সগোত্রাদের নয়, ছেলেদেরকেই। অতএব তাঁরা স্বাক্ষর জড়ো করুন্—যতো খুসি—আপত্তি নেই। যে-বেচারীর স্বাক্ষর তাঁরা নেবেন, অগোচরে অদৃশ্য-অক্ষরে নিজের স্বাক্ষরও তার ওপরে সই করে' আসবেন তা নিঃসন্দেহ। স্বাক্ষর নেয়া নয়, ও হচ্ছে তাঁদের রাজকর নেয়া। এক ধাক্কায় রাজসূয় এবং অশ্বমেধ—দু-দুটো যজ্ঞ! কেবল তাঁদেরই যোগ্য—একথা অবশ্য-শিকার্য।

চিত্রকলা

সঙ্গীত-বিদ্যা হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত। সকলেই গাইতে পারে। স্বরকে নাকের ভেতর দিয়ে ছাড়লেই সুর। স্বভাবতই ঋ, ঐ এবং ঔ বাদে অকারাদি যে কোনো স্বর নাসারন্ধ্রের পথ ধরলেই রাগরাগিনীর আকার ধারণ করে। হ্রস্বদীর্ঘের বালাই নেই। কেবল প্লুতস্বর হলেই হোলো—নিজগুণেই তা সঙ্গীতরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সরস্বতী নাকের গোমুখী দিয়ে নামলেই সুরধুনী।

কে ঠেকায়? তখন আপনি গুণগুণ করেও গাইতে পারেন, আবার আপনার গানের গন্‌গনে আঁচও দেখা যেতে পারে। গুঞ্জনই হোক্ আর গঞ্জনাই হোক্, আপনি তখন গাইয়ে। সুর নাড়তে থাকুন, (হাতী কিম্বা গণেশের মত,) ঐশ্বরিক অবলীলায়—গানের ঐশ্বর্য আপনার গলায়। আপনিই গল্‌ছে, অথবা আপনিই গলাচ্ছেন।

গানকে ছিপের মতো একান্তে একজনের উদ্দেশেও ফেলা যায়, সেখানে একটিমাত্র উৎকর্ণকে খেলিয়ে তোলাই হবে লক্ষ্য। কেবল দেখতে হবে যেন সে পালিয়ে না যায়। গাঁথা যেন ভালো হয়। এই কারণেই গীতকে অনেক সময়ে গাথাও বলা হয়ে থাকে।

আবার গানকে সুরের জালের মতো বিস্তার করে একটা এস্‌পার ওসপার কাণ্ডও করা যেতে পারে। একসঙ্গে অনেকের কানাস্ত করতে হলে সেইটেই রেওয়াজ। গান হচ্ছে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার, একটিই হোক বা একাধিক হোক, কর্ণবধেই তার সার্থকতা।

ছিপের মতোই ছাড়ুন বা জালের মতই ছড়ান, সুরের ছলনাই হোলো আসল। শুঁড়ের জালিয়াতি। সুর আর শুঁড়—একই নাকের সীমান্ত থেকে হাম্‌লা দিতে বেরয়। নাসিকের ঢোল কর্ণাটে সহরৎ হতে থাকে। সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটে তথাকথিত ভদ্রসমাজে হাতের সুখের জন্য কারো কান মল্‌তে পাওয়ার সুবিধে নেই—কান প্রায় পরস্ত্রীর মতই—একজনের কান অপরজনের নাগালের বাইরে। এক্ষেত্রে কেবল সুর বাড়িয়েই পরের কান পাক্‌ড়ানো যায়। পরকীয়া পরখের এইটিই পথ। আর এযুগের কানাইরা ঐভাবেই মজিয়ে থাকেন।

অবিশ্যি আপনার গানের পটুতাই অপরকে পটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হতে পারে—শ্রোতার-কর্ণপটহও জোরালো হওয়া দরকার। 'কেবল গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'! কেবল গাইয়ের নয় তো দুধ, গোয়ালারও কিছুটা বইকি। কালাপাহাড়ের কাছে কালোয়াতির কোনো কদর নেই। না-কালাকে নাকাল করতে পারাতেই তার ওস্তাদি। গাইয়ে আর শুনিয়ের—নিজেদের নাকে-কানে খৎ দিয়ে, ক্ষতসৃষ্টি করে' নিজেদের এই যে সাজা দেয়া, বিবাহিত জীবনের বাইরে এমন মজা, ঈদৃশ সমজদারি দুর্লভ।

কিন্তু গাইতে পারা যেমন সোজা, আঁকতে পারা তেমন না। আঁকের জগতে দুয়ে দুয়ে চার এবং গরুর বাঁটে দুয়ে দুয়ে দুধ হতে পারে কিন্তু আঁক আর আঁকা এক নয়। আঁকিয়ের কাছে দুয়ে দুয়ে বাইশ। দুটি রেখার লেখমালার মধ্যে কেবল দুটিমাত্র কথা নয়, আরো বিশটা কথা মুখর হয়ে উঠ্‌লেই সেটা ছবি। তাতে কুলো-পানা চক্করও যেমন, বিষও তেমনি।

অঙ্কবিদ্যা আর অঙ্কনবিদ্যা এক নয়। একই কাগজের পিঠে উভয়ে ফলাও হলেও দুয়ের ভেতর ভয়ঙ্কক ফারাক্। কাগজ এক হলেও ওদের কায়দা আলাদা। ওদের আঁকবার ধরনও একরকমের না। যদিও আঁকের মতই, আঁকারও অনেকসময় ফল মেলে না, আঁকিয়েরা বলে থাকেন, তাহলেও, সমান নিষ্ফল হলেও, ওরা একজাতের গাছ নয়। ওদের বীজ-গণিতে, অঙ্কুরে আর পাতাবাহারে পার্থক্য আছে।

অঙ্কের হচ্ছে কষাঘাত আর ছবির কাজ বশীকরণ। শিল্পীর স্থান আঙ্কিকের ওপরে। আঁক কষার চেয়ে তুলি কসানো কঠিন। এমনকি আপনার গীৎকারের চেয়েও। কেবল নাক থাকলেই গাওয়া যায়, কিন্তু ছবি আঁকার knack থাকা চাই।

আঁকিবুকির চর্চায় আমার অনেক আয়ু গেছে। আর্টিষ্ট হিসেবে আমি কোন্ স্কুলের তা বলা হয়তো একটু দুরূহ হলেও ইস্কুলে পড়বার কালেই যে এই বিদ্যায় অধমের হাতে খড়ি, তা জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই। অঙ্কের খাতায় আঁকের বদলে আঁকের মাষ্টারকে অঙ্কিত করেই এর সূত্রপাত হয়েছিলো। তার পরে অবিশ্যি আমি হেড্পণ্ডিতকেও এঁকেছিলাম—হাত আর একটু পাকলে পরে।

তারপর থেকে আঁকার বদভ্যাস আমি বরাবর বজায় রেখেছি। এঁকে চলেছি—এঁকে, ওঁকে, তাঁকে। লেখা এবং রেখা চালিয়ে এসেছি সমানে। এখনো আমি ছবি আঁকি—এঁকে থাকি—সভাযাত্রার সুযোগে। সভাসমিতিতে গেলেই আমাকে আঁকতে হয়। সাধারণত সভাসমিতিই হচ্ছে ছবি আঁকার শ্রীক্ষেত্র।

লক্ষ্য করে দেখেছি, বক্তাদের বাগাড়ম্বরের কালে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই তেমন করবার থাকে না। তখন ঐ হচ্ছে একমাত্র

কলা যার কারবার চলে। যুত করে ফলানো যায়। কারো বক্তৃতার ফাঁকে আপনি গান গাইতে পারেন না—পারলেও খুব কদাচ। অথচ কাগজ পেন্‌সিল্‌ নিয়ে ঐ অবকাশে অনায়াসেই ছবি আঁকা যায়। এন্‌তার—যতো খুশি। এবং আমিও ঠিক তাই করে থাকি। আমি যে চিত্রশিল্পে সিদ্ধহস্ত একথা বলি না, তবে আর কয়েকটা সভা-সমিতিতে যোগ দিতে দিতেই পারদর্শী হতে পারব এমন আশা রাখি।

কাগজ পেন্‌সিল্‌ বগলে নিয়ে সভায় তো গেলেন, কিন্তু আঁকবেন কী? আর আঁকবেনই বা কখন? কখন্? যখন দেখবেন সভা বেশ জম্‌জমাট আর বক্তৃতাও কিছুদূর গড়িয়াছে, তখনই আঁকা সুরু করতে পারেন। আর, কী আঁকবেন? কেন, মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য—এমনকি চিত্রকলাতেও। মানুষকে চিত্রিত করাই সব আর্টিষ্টের প্রথম দায়। খোদ সভাপতিকে নিয়েই আপনি সুরু করতে পারেন। বক্তাদের আঁকতেও বাধা নেই। শ্রোতাদের ভেতর থেকেও পছন্দ করে আঁকা যায়। অবশ্যি এঁদের অনেকেই মানুষ কিনা সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক।

আমার ত মশাই, মানুষ নিয়েই কারবার—যাকিছু কারুকাজ! প্রথমে তার মাথা নিয়েই আমি আরম্ভ করি। সব আগে তার কপাল আঁকি (শোনা যায় বিধাতা পুরুষও ঠিক তাই করে থাকেন। কপাল থেকেই তাঁরও নাকি রেখায়ন। আর-শিল্পী-যেকালে স্রষ্টার সগোত্র, খোদ্যর মতই তার খোদ্‌কারি হবে, কিছু বিচিত্র নয়।)—তারপর কপালক্রমে সুরু করে একেবারে তার চিবুক পর্যন্ত নেমে

১নং চিত্র

আসি। (এক নম্বর ছবি দেখুন)। নিজের স্বচ্ছন্দে এঁকে যাই—এঁকে বেঁকে চলে যাই।

তারপর বহির্দৃশ্য শেষ হলে তার চোখ নিয়ে পড়ি। মানুষকে চোখা করে তোলাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। চক্ষুদান করাই অঙ্কনবিদ্যার সর্বাপেক্ষা কষ্টকর অংশ। চোখটা যে কোথায় বসবে সহজে ঠিক করা যায় না। যদি ঠিকমতো না বসে, বেখাপ্পা দেখায়, তখন সেই বিসদৃশ ব্যাপার থেকে একমাত্র বাঁচোয়া হচ্ছে মানুষটাকে চশমা পরানো। তাতে চোখের দোষ কেটে গিয়ে তাকে বেশ চৌকোস দেখাতে থাকে। মানুষকে খাপ্সুরৎ করতে মশাই, চশমার তুল্য আর নেই। (দ্বিতীয় ছবি দ্রষ্টব্য)

২য় চিত্র

মাথার সম্মুখভাগ শেষ হলে তখন তার বাদবাকি। কিন্তু মাথার পশ্চাদ্দিক আঁকাটা তত সহজ নয়। অনেকখানিই তার অনিশ্চিতের গর্ভে। অনেকটা জুয়াখেলার মতই। বেশির ভাগ, লোকটার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাহলেও দক্ষশিল্পীর হাতযশ নেহাৎ ফ্যাল্না নয়। তবু সামনের সঙ্গে পেছন মেলানো ভালো নাপিতের বাহাদুরির মতই দুর্লভ কীর্তি। রীতিমত অধ্যবসায়সাপেক্ষ।

আমি নিজে সাধারণতঃ নিরেট মাথার পক্ষপাতী। (তিন নম্বর ছবিতে নজর দিন)। মাথাটা যে পরিমাণে কংক্রীট হয়েছে, ঘাড়টা তদুপযোগী টেক্‌সই হয়নি। বেশ বোঝা যায়, মাথাটাকে ঘোরালো করে আনতেই শিল্পীর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে, ঘাড়টাকে জোরালো করবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। তা না থাক্,

তাহলেও এটা একটা মাথার মত মাথা একথা বলা যায়। এবং মাথাটাই এখানে আসল, ঘাড়টা তার ভারবাহীমাত্র। গর্দানেরও, গর্দভের মত, ভারবহনের জন্যেই প্রয়োজন।

৩নং চিত্র

এটাকে আমি জনৈক লেখকের মাথা বলেই আন্দাজ করছি, দুর্ভিক্ষপীড়িত কোনো লেখক। ভালো খাওয়া দাওয়া (আত্মনেপদীভাবে) পাওয়া তার জীবনের দারুণ সমস্যা—সেই কারণেই ঘাড়টা ওই রকম বেঘোরে থেকে গেছে। এবং চোখটাও দস্তুরমত উপবিষ্ট, লক্ষ্য করবেন। প্রায়োপবেশনে পোক্ত হয়ে হয়েই যে এই দশা, তা বলাই বাহুল্য।

এর পরের কাজ হচ্ছে লোকটির প্রতি কর্ণপাত করা। তার কান বানানো। কানের কাজটা সারতে পারলেই বাকিটা তখন বিল্‌কুল্‌ কিছুনা। কিন্তু কান দেওয়া সহজ নয়, চোখ দেওয়ার চেয়েও কঠিন। আরো এক প্রকাণ্ড ব্যাপার (এবার চার নম্বর ছবিতে চোখ বুলান্‌)। কানটাকে আমি ঠিকমতো টানতে পেরেছি বলেই মনে করি। একটু ডানদিক-ঘেঁষা বলে ধারণা হতে পারে, কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, চারা নেই! একবার কান দেবার পরে আর ফেরানো যায় না। ফেরার পথ তখন রুদ্ধ। পুরাকালের কর্ণও অযথাস্থানে রয়েছেন জেনেও ফিরতে পারেননি—মহাভারতে তার প্রমাণ আছে।

৪নং এবং ৫ নং চিত্র

এইবার চুলের পালা। এটা বেশ আরামের কাজ—ফুর্তির সঙ্গেই করা চলে। খুব ঝাঁক্‌রা ঝাঁক্‌রাও করতে পারেন, কুচ্‌কুচে কালো

করতেও বাধা নেই, আবার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অতিশয় বিরল করাও কিচ্ছু শক্ত নয়। কিরকম করবেন সেটা আপনার পেন্‌সিলের ওপর নির্ভর করে। হার্ড পেন্‌সিল হলে স্বভাবতই চুল তেমন জমে না; মাথার হাড় বেরিয়ে থাকে। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের জন্য বেশি দামের নরম পেন্‌সিল্ নিতান্ত জরুরি। মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপিত মেয়েটির মত, আমিও নিজে ঘন কালো চুল ভালোবাসি; কেননা তাহলে তার মধ্যেকার সিঁথির রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (পঞ্চম চিত্র লক্ষ্য করুন)। টেরিটা কেমন টের পাওয়া যাচ্ছে দেখুন!

চুল না আঁকা পর্যন্ত মানুষের মাথা যে কতো বড়ো তার কোনো ধারণাই গজায় না। চুল শুধু মাথার বাড় নয়, মাথাকে বাড়িয়ে বৃহৎ করে দেখানোও তার একটা কাজ। ও হচ্ছে মাথার মহাভারতে একাধারে বনপর্ব আর বিরাটপর্ব। চুল আঁকতে গিয়ে গোটা একটা বক্তৃতা কাবার হয়ে যায়—এমন কি, সভাপতির অভিভাষণ পর্যন্ত ঐ চুলেই চলে যেতে পারে। (চুলোয় নয়, এখানে মুদ্রাকরপ্রমাদ হওয়া অবাঞ্ছনীয় হবে। ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য)

এবার পঞ্চম চিত্রের দিকে দৃক্‌পাত করি। এত কাণ্ড করে যে আদ্‌মিটিকে আমি আম্‌দানি করলাম তাকে একবার দেখা যাক্। গোড়াতেই বলে রাখি এটি আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। (এর চেয়েও ভালো মানুষ আমার হাতে এসেছে—ঢের ঢের ভালো মানুষ। খারাপ মানুষও অবিশ্যি কিছু কম আসেনি। কিন্তু সে-উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক) বক্ষ্যমান লক্ষ্যটির দিকে তাকালে প্রথমেই ওর কানের খুঁৎ চোখে পড়বে। কানটা যেন একটু দক্ষিনাপথ নিয়েছে। অনেকটা দক্ষিণকর্ণই বলা যায়—সেই কর্ণ যে-কর্ণে আমাদের

'ঘরোয়া' মন্ত্রীরা বেদবাক্যের মত পুলিসের রিপোর্ট শুনে থাকেন। তাছাড়াও, কানটাকে ভারী পাতলা বলে জ্ঞান হবে—আমাদের নেতারা সচরাচর যেমন কান-পাতলা হয়ে থাকেন। তারপর এঁর চোখ। কালবিলম্ব না করে এই লোকটির চশমা নেয়া উচিত ছিল বলেই আমি মনে করি। দৃষ্টি এতই সূক্ষ্ম, আছে কি নেই বোঝাই দায়। কিন্তু চশমা নিলে সম্ভবত ওকে আধুনিক কবির মতো দেখাতে পারতো। এবং নেহাৎ মন্দ দেখাতো না। সেক্ষেত্রে, চুলচেরা ভাবে খতিয়ে, আরেকটা বৃহত্তর বাগ্মীতার সুযোগে, আধুনিক কবির চশমার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর খাতিরে ওর কেশকলাপকে ফলাও করে আরো একটু বেশি জাহির করার প্রয়োজন হয়তো ছিল মনে হয়।

আমার শিল্পকীর্তির পরাকাষ্ঠা, বেশির ভাগ মানুষই আমি দেখেছি পশ্চিম দিকে মুখ করে জন্মায়। কেন যে, সে-রহস্য এখনো আমার অজানা। অনেকটা আমাদের দেশের সেরা মানুষদের মতই—পশ্চিমদিকে মুখ ফেরানো। সাবেক কঙ্গরসিক, প্যান্ইস্লামিক বা আধুনিক মস্কোপন্থী—পূর্ব এবং অপূর্ব-যুগের—জাতীয় ও বিজাতীয় যাবতীয় নায়কের মতই এগুলি যেন পশ্চিম দিকে মুখিয়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা একটু তাক্ লাগাবার মতই নয় কি? কদাচ আমি মুখোমুখি দুটো মানুষ আঁকিনি যে তা নয়, কিন্তু দেখেছি পূব-মুখো লোকটি কখনই খুব সুবিধের হয় না।

ছ নম্বর ছবিটির প্রতি নজর দিলেই এর নজির পাবেন। ডান দিকের ব্যক্তিটি (অভিব্যক্তিও বলা যায়) একটি কমিউনিস্ট্। মাথার সাম্নেটা ঢালু, কপালটাও খাঁজ-করা, আর দাড়িটাও এক সঙ্গীন ব্যাপার। দৃশ্য-হিসেবে মোটেই সুচারু নয়। কিন্তু তাহলেও তার

মুখে পৌরুষের ছাপ স্পষ্ট, শক্তিমত্তাও প্রকট—সমস্ত মিলিয়ে কেমন একটা লালায়িত ইঙ্গিত। সব দেশের কমরেডদের যেমন হয়ে থাকে। বাঁ দিকেরটিকেও আমি কমিউনিস্ট্‌রূপে গড়্‌তে চেয়েছিলাম, ডাইনের সঙ্গে বিতর্করত আরেকটি

৬নং চিত্র

কমিউনিস্ট্‌, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে মেয়ে হয়ে দাঁড়ালো। অনেকটা মেমের মতই হয়ে গেল। তখন—অগত্যা—তাকে বাঙ্গালী নারীর মর্যাদা দানের জন্যেই তার মাথায় একটা খোঁপা বেঁধে দিতে আমি বাধ্য হলাম। কতোটা সফলকাম হয়েছি জানি না। সেটা সুধী সমালোচকদের বিচার্য। আপাততঃ ও হচ্ছে এক মেম্‌ গভর্নের্স্‌। কিন্তু কি কারণে যে ও ওই কমিউনিসট্‌টির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় অগ্রসর হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। ওকে গভর্ন্‌ করার মৎলবেই কি না, তা ওই বলতে পারে।

এইখানে আমার অঙ্কিত কতকগুলি পূবমুখো মানুষের জটলা দেখুন। দেখলেই টের পাবেন এদের মানুষ বলে ধারণা করা কতো কঠিন। এমন কি অ মা নু ষ বলে গণ্য করতেও রীতিমত বেগ পেতে হয়।

৭নং চিত্র

মানুষ আঁকবার পর—তার পরেও—আরো দু একটা জিনিস আঁকবার থাকে। পরিপ্রেক্ষিত আর নিসর্গদৃশ্য।

পরিপ্রেক্ষিত ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। ও-আঁকার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্চে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত লম্বা আর ফাঁকা একটা রাস্তা টানা। আর তার ধার-বরাবর টেলিগ্রাফের তার লাগানো সারি সারি

দাঁড়ি খাড়া করে দেয়া। আমি আবার সেই সাথে রাস্তার এক পাশে (অষ্টম ছবিতে কষ্ট করে তাকান্) লম্বা বেড়া বেঁধে দিয়েছি। খুব মজবুত বেড়া হয়নি যদিও।
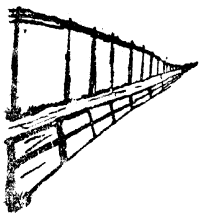
নিসর্গদৃশ্য প্রধানতঃ পাহাড়, উপত্যকা, গাছপালা ইত্যাদি অবলম্বনে আঁকতে হয়। তার মধ্যে গাছগুলিই হচ্ছে সব চেয়ে মজার।

এখানে আমার চিত্রিত একটি নিসর্গদৃশ্যও দেখাচ্ছি।

৮নং চিত্র

দেখলেই আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কোন্ কৌশলে বলা যায় না, একটি মানুষ এই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মধ্যে কখন্ সেঁধিয়ে পড়েছে। লোকটিকে আফ্রিদি হামলাদার বলে মনে করতে পারতাম, কোনা বাধা ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধযুগের মুণ্ডিত মস্তক হয়েই মুস্কিল বাধালো। যাই হোক্, লোকটি খুব খারাপ নয়। নিসর্গদৃশ্য উপভোগের মৎলবেই যে অযাচিত এখানে এসে দেখা দিয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়।

৯নং চিত্র

অবিশ্যি, এইধরণের মাষ্টারপিস্ রচনা করিতে দস্তুরমত সময় লাগে। মহতী সভার অধিবেশন আর বৃহৎ পেন্‌সিল্ ছাড়া এরূপ মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

খতম্ করার আগে আরেকটি কথা বলা আমি আবশ্যক বোধ করি। কখনো যেন সামনে মুখ-করা কোনো মানুষ আঁকতে যাবেন না। ও আঁকাই যায় না।

মাকার

এবং

অন্যান্য কবিতা

কবিতা

যে আলো পেরিয়ে এলো কালের পারাবার
ছপিয়ে এল অনন্ত আকাশ—
তীক্ষ্ণ আলো—তীব্র আলো—উজ্জ্বল আলো—
যে আলো ধূসর হয়ে এল ধরণীর কাছে এসে—
ধূলোর মধ্যে জমাট হোলো, হারিয়ে গেল যেন—
হোলো মলিন—ক্রমশ হোলো কালো—
ঘোর কালো মাটির ছায়া লেগে—
সেই কালো—সেই আলোরই রঙ্‌ সেও।
সেই আলোই কি হোলো শেষে কবিতা
তোমার খাতায় আর আমার খাতায় বন্ধু ?

কবির কবিতা চুরি করে' লুকিয়ে রাখে পৃথিবী—
হয়তো নিজে কবি হবার সাধে।
হঠাৎ একদিন কাব্য করে জাহির।
সেদিন দেখি তার ঘাসের মাথায়, গাছের পাতায়
আলোর খেলা।
ফুলের সাজি তারাবাজির সঙ্গে পাল্লা দ্যায়।
পৃথিবী চম্‌কে দ্যায় আকাশকে—
কবিতা চমক লাগায় কবির।

পৃথিবীর পাতা থেকে যখন আমি আবার
চুরি করি সেই কবিতা—আমি পৃথিবীর মানুষ,—
তখন তার আলোর কতটুকুই বা আমি ধরতে পারি
আমার জীবনে—আমার কবিতার খাতায়?

কিন্তু, আলো-কে হারাতে দাও বন্ধু!
কতই রশ্মি তুমি ধরে' রাখ্‌বে বলো তোমার ক্ষুদ্র হাতে?
আলো যত হারায় ততই রূপের দানা বাঁধে
রশ্মিকণা কখন্‌ পরে ফুলের ছদ্মবেশ—
কবির সঙ্গে কবিতার চলে লুকোচুরি!

আলো না হারালে হয় না ভালো কবিতা॥

মাকার

আকাশের ভুরু আর মর্ত্যের ভুরু
যেখানে মিলল ভালোবেসে,
আমাদের হোলো ভাই সেইখানে সুরু,
সেই মাকারের কোল ঘেঁষে।
অকার সেখানে ভাই লভিছে আকার,
অকারে আকারে মিশে হোলো একাকার।

ধরায় ধূলায় ভাই ছিল ব্যঞ্জন,
আকাশে ভরাট ছিল অন্ন ঃ
এপারে-ওপারে যোগ দিল কোন্ জন—
আমরা এলাম যার জন্য !
স্বরে ব্যঞ্জনে মিলে হোলো একাকার—
এ ধরণী লভিল মাকার।

আকাশের বুকে ছিল অজস্র রঙ্—
নীলিমার ফাঁকা আওয়াজ
ছিঁড়ে ফেলে ডাক দিল মাকার কখন্,
পরে' এনু রামধনু-সাজ !
ধরণীর ধূলা আর অশ্রুমিশেল
আলোর এ দোললীলা মাকারের খেল্।

সেই আন্‌কোরা ঠাঁই ধরণীর কোলে
আকাশের বাঁকা যেথা শেষ—
সেই জোড়া ভুরু ভাই যেখানেতে খোলে—
মর্ত্যের নাই উদ্দেশ।
মাকার সে রহস্য-ছায়ায়
রচিছেন আপন-মায়ায়।

পৃথিবীর যত কিছু সেইখানে সুরু—
তুমি আমি আর আমাদের
যত খেলা, যত গান, মন-উড়ু-উড়ু :
সেইখানে ফিরে যায় ফের।
সেই যেথা, কাহার ডাকার
অপেক্ষায় থাকেন মাকার ॥

সূর্য লভিল নির্বাণ ঘাসে এসে—

সূর্যের মত উজ্জ্বল হতে চাও ?
তা হওয়া কি খুব সুখের ? সার্থকতার ?
আত্মপ্রকাশে মহিমা অপরিসীম ;
মানি ;
তবু তার চেয়ে আত্মবিলোপে সুখ :
ঘুমের মতন নরম মোহন সুখ :
নিজেকে ভোলার আরাম।

সূর্যের মত উজ্জ্বল হতে চাও?
নিজের জ্বালায় জ্বল্‌বে অহর্নিশ,
জ্বালার যাতনা গলে গলে হবে আলো—
সেই আলো লেগে জ্বল্‌বে হাজার মুখ—
তোমার আলোয় সকলের আলো হবে।

এমন কি, কভু হয়তো এ হতে পারে—
তোমার জ্বালার ছোঁয়াচ তাদের লেগে—
তারা কোনোদিন জ্বল্‌তেও পারে ফের—
তাদেরও জ্বল্‌বে আলো ঃ
তারাও সূর্য হবে।
তোমার দুঃখ হবে সহস্র দুখ্‌—
তোমার সে-জ্বালা হাজার জনের জ্বালা—
তোমার আলোর চেয়েও হয়তো তাহা—
আরো সুতীক্ষ্ণ আরো মর্মান্তিক—
আরো—আরো—আরো ছড়াবে অনেক দূর।

সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে লাভ?
যদি একাই সূর্য হও—
আর সবে যদি সূর্য না হতে পারে?
সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে লাভ?
যদি সবাই সূর্য হয়—
অখিল যাতনাময়
নিখিলভুবন নিছক অগ্নিস্রাব?

তার চেয়ে ভালো ঘাস হয়ে পড়ে থাকা—
ঘুমের মতন নরম সবুজ ঘাস
নিজেকে ভোলার সুখে,
আত্মা-হারানো আত্মহারা সে-মজা।
যদিও সকলে দলে' দলে' চলে' যায়—
তবু তারি মাঝে হয়ত এক আধ জন—
তোমার বক্ষে এলায়ে স্বপ্ন ছাখে ;
ছাখে তো একেক দিন !

তোমার ঘাসকে পায়ে মাড়ানোর সুখ—
তোমার ঘাসের ঘুম পাড়ানোর সুখ—
সেও বড়ো কম নয়।
কতো যে সূর্য ওখানে লুকায়ে আছে ॥

মহিষাসুর

স্বর্গ অচল হচ্ছিল তোমার অভাবে—
চালু হচ্ছিল না তুমি আসছিলে না বলে'।
স্বর দাঁড়াতেই পারে না—নিজের থই পায়না
তোমার বিরাট কাঁধ নিয়ে
তুমি এসে না দাঁড়ালে।

অন্নকে করো পরমান্ন,
স্বরকে করো স্বরস্বতী—

নিজে নও অর্থক হয়েও
অনর্থকে করো অর্থময়,
করো সার্থক—
তোমার যোগেই ওদের ব্যঞ্জনা,
অবর্ণের বর্ণনা তুমি,—তুমি ব্যঞ্জন!

শিবের নভোজটায়
আলোকের জালে লুকিয়ে ছিলো যে সুরধুনী—
সেই অমৃত-নিস্যন্দিনীকে তুমি ছাড়া বলো কে
টান্‌তে পারে এই মর্ত্যে?
আদিম উদ্‌গতির কোনো অর্থ হয় না
অধোগতির শেষে গিয়ে না পৌঁছলে—
সুরধুনীও ব্যর্থ হয় মৃদঙ্গে এসে না ছাড়া পায় যদি।
রসাতলের জন্যেই নয় কি রসায়ন?
তাইতো, কেবল মহেশ্বরই একা নন্‌—
তুমিও ধারণ করেছো সুরধুনীকে।
তুমিও যে মুক্তির ভগীরথ—মোক্ষের মূলাধার—
মহিমার উৎসমুখ—
তুমি মহিষাসুর?

আকাশের মহত্ব কি নিষ্ফল হোতো না
তোমার মহীত্ব তাকে ঠাঁই না দিলে?
রূপ আর বাণী, বীর্য আর সিদ্ধি
সবাই কি নিরাশ্রয় হোতো না নিজস্ব আলোকের অরণ্যে?

সর্বস্বান্ত হয়ে থাকত নাকি নিজের নিরুক্ত অস্তিমতার
একান্ত সর্বনাশে—
তোমার অশান্তির মধ্যে উন্মুক্তি না পেত যদি ?
তাই তো দেখা যায়, ভগবতীর ঝোঁক্ তোমার দিকেই যেন বেশি,—
তাঁর ঝুঁকি কেবল তুমিই নিতে পেরেছ ॥

বিধাতার স্নেহ

বিধাতার স্নেহ যে পায় সে কি নিজের জন্যে পায় ?
কেউ কি নিজের মধ্যে ধরে' রাখতে পারে সেই অজস্রতা ?
অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে আসে সেই আদর—
আলোর মত দুর্দমণীয় বেগে, নিজের আবেগেই,—
আস্‌তে আস্‌তেই ছড়িয়ে পড়ে অনন্ত পরিসীমায় !

সূর্যের মধ্যে যখন প্রকাশ পাই সেই স্নেহ,—
হতভাগ্য যখন পায় সেই প্রচণ্ড প্রেম !—
তাকে সৃষ্টি করতে হয় সমস্ত সৌরজগৎ,
সকল পর্বত-অরণ্য, সব নদনদী, বিচিত্র তৃণ আর ফুল,
যত না ফল আর ফসল,
নিজের অফুরন্ত ভালোবাসার তাপে।

সেই সংক্রামক স্নেহের ছোঁয়াচ লাগে যার—
স্নেহের অক্ষয়তায় তাকে করে আকাশের মত সীমাহীন,
কারেন্সির দর-বাঁধা আদরের সঙ্গে খাপ্ খায়না তার ব্যবহার ;
সুইচ্-বাঁধা ইলেক্‌ট্রিক-বাতির ধরণে
দরকারমতো জ্বলা-নেভা তার হয় না,—

বাজারের মাঝে আর হাজারের মাঝে নিষ্প্রয়োজন—
সে হয়ে যায় আরেক রকমের।
অনির্বাণ অগ্নিরসে সে জ্বলে, জ্বালায় অপরকে।
অর্থহীন আর নিরর্থক ?
বুঝি কেবল সূর্যের মাঝেই পাওয়া যায় তার মানে।

বিধাতার স্নেহে যে হয় স্নেহবান—
আকাশ-ভাঙা সেই আকস্মিক তুফান বুকের মধ্যে এসে যার লাগে,
না-চাইতে পড়ে-যাওয়া সেই চৌদ্দ-আনা—
চাইলেও যা নাকি পাওয়া যায় না, তপস্বীরা বলেন।
তপস্যার অতীত, ধারণার বাইরের সেই অমরত্ব,
যা নাকি পেলে বাকী দু' আনাও সার্থক, নইলে
এ-জীবনের ষোলো আনাই স্রেফ ফাঁকি !—
তপস্বীরাই নানা ছলে বলে' থাকেন !—শুনে থাকি !
যদিও সেই প্রাপ্তিযোগ, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কে বল্‌বে ?
একমাত্র লীলাময়েরই তা' জানা রয়েছে কেবল !
কিন্তু শুধে যেতে হয় তাকে সেই বিরাট স্নেহের ঋণ
মৃত্যুহীন আর মোক্ষহীন জীবন দিয়ে—
অমনি-পাওয়া শুধ্‌তে হয় কেবল-দিয়ে-যাওয়ায়।
অর্থহীন আর নিরর্থক সেই জীবন ?
কেবল পৃথিবীর মধ্যেই পাওয়া যায় বুঝি তার মানে।

হে অনুপমা,
তুমি যখন পাও সেই স্নেহ,

তোমার মধ্যে রূপ নেয় রূপের অপরিসীমা—
অপরূপের অপর্যাপ্তি !—
অনুক্ষণতার মধ্যে ধরা পড়ে অনন্তক্ষণ !—
প্রদীপের সীমা পেরিয়ে যেমন ওঠে প্রদীপের শিখা—
ছড়িয়ে যায় দেহের সীমা ছাড়িয়ে।
আর আমি যখন পাই সেই মারাত্মক ভালোবাসা,
তখন কি আমি কবিতা লিখতে বসি ?
হরফের বাঁধনের মধ্যে বেঁধে, বেঁধেছেঁদে,
ধরে' রাখতে চাই সেই তড়িদ্বেগ—
এই ধরিত্রীর সীমা-কালের গণ্ডীতে ?
কথার ক্ষণভঙ্গুর ভাঁড়ে বাঁধতে চাই সেই দুর্বার অনির্বচনীয়তা ?
আমার সামনে যখন রূপ নিচ্ছে অনন্ত কাল,
আর আমার হাতে মোটে এক মুহূর্ত,
হাতের মুঠোয় একটুকরো মাত্র সময়—
তখন কি আর ঘাড় গুঁজে চোখ নামিয়ে
কবিতা লেখবার, বন্ধু ?
আমার স্নেহ—
আমার ভালোবাসা আমিও জানিয়ে যেতে চাই ;
কাকে ? তোমাকে ? আমাকে ? না, বিধাতাকে ?
সেই স্নেহ জ্বলে আমার চোখের চাওয়ায়।
সেই স্নেহ গলে আমার চুমো খাওয়ায়।
আকাশের গায়ে আমি লিখে রেখে যাই
আমার স্নেহের বেহিসাব—বিধাতার সুধার ধার-শোধ—

আমার সামনের মুহূর্তময়ীর মুখপত্রে—
কেবল শুধু চুমোর চিহ্ন দিয়ে এঁকে।
দুনিয়ার-কাজের-ভীড়ের-মাঝে সব-চেয়ে-বাজে খরচ—
অর্থহীন আর নিরর্থক?
আগাগোড়াই ফাঁকা এবং ফাঁকি?
কেবল আকাশের মাঝেই আছে হয়তো তার মানে॥

শ্রীমান্ সত্যম্ শিবম্ ইত্যাদি সুচরিতেষু—

অপরূপ তোমার ভালোবাসা।
যখন তুমি আমার প্রিয়ের মধ্য দিয়ে
আমায় ভালোবাসো;
আর আমার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসো আমার প্রিয়কে!
সমস্ত কাঁটা তখন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে!
যারা ছিল পথের বাধা তারাই হয় গলার হার।
আশ্চর্য ভালবাসা তোমার।

তুষার-জমানো কাঠিন্যের প্রাচীর
পলকে গলে যায় তোমার সূর্য উঠলে—
যত বিশ্রী, কুশ্রী, হতশ্রী হেসে ওঠে!
হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য বাধাও সহজে উৎরে যেতে পারি
তোমার গঙ্গা নামে যদি—
তোমার সুরধুনীর স্রোত বেয়ে

পৌঁছতে পারি তোমার মানস সরোবরে—
আমার আর আমার প্রিয়ের ভালোবাসায়।

এই সব কথা ভাবছি যখন—
আর আমার সমস্ত কাঁটা ফুল হয়ে ফুট্ছে,
চমৎকার আমার চার ধারে—
এমন সময়ে, একি !
সাম্নের রাস্তা দিয়ে এই শীতের ভোরে—
মাঘের দুর্জয় কামড় এখন—
সাত বছরের এক শিশু
ছেঁড়া ন্যাক্ড়া গায়ে জড়িয়ে
টুক্রি হাতে বেরিয়েছে
কাগজের টুক্রো কুড়োতে।

অনন্তকালে তোমার রূপ যাই হোক্—
আর অফুরন্ত আমাদের মধ্যে তার প্রকাশ যতই না !—
আমার আর ঐ শিশুটির মধ্যে তার সম্ভাবনা যাই কেন থাক্ না—
হয়তো আমি কোনোদিন ঐ কাগজ কুড়োতে পারি
(কাগজফিরি করেছি তো একদিন !)
আর ঐ ছেলেটি হয়ত বা হাতে পারে কাগজের লেখক,—
কিন্তু আজ এই মুহূর্তে
নরম আর গরম এই কম্বলের মোড়কে জড়ানো আমার
আর ছেঁড়া কাগজের সম্বলের মধ্যে ঐ শিশুর—
আমাদের মধ্যে তোমার রূপ অতি বীভৎস।

আর—আমাদের এই লোকযাত্রা কী কদাকার!
তুমি কি সত্যি আমাদের ভালোবাসো?
আমাকে আর ঐ শিশুকে?
তাহলে তোমার মানস-সরোবর
জমে এমন বরফ হয়ে গেল কেন—
আমাদের সবার মনে মনে?
দুর্ভেদ্য হিম-প্রাচীর কেন দিকে দিকে?
তোমার বেদের চেয়ে ছেঁড়া কাগজের দর কেন বেড়ে গেল তাহলে?
আসল রামায়ণের চেয়ে তার ছিন্নদশার আদর কেন বেশি তবে?
রহস্যময় তোমার ভালোবাসা—
সত্যি, অসহ্য এই রহস্য!

কে জানে, ঐ শিশুটিই কি কোনোদিন
ছিল না আমার প্রিয়?—
আমার পুত্র, আমার পিতা, কিম্বা আমার বন্ধু?
সূর্য, আমি আর ও তো একসঙ্গেই
যাত্রা সুরু করেছিলাম—!
(আদিকালের আমরা আত্মীয়।)
ঐ শিশুই কি হতে পারে না প্রিয়তম আবার?
আমার পুত্র, আমার পিতা
কি আমার প্রাণের বন্ধু কোনো একদিন—
অনন্ত কালের শূন্যপথে?
সূর্য ও আর আমি তো এক সঙ্গেই যাত্রা শেষ করব—

সমাপ্ত করব আমাদের পথ-চল্‌তি কারবার—
ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো কুড়োতে কুড়োতে—
বেদের খণ্ড খণ্ড সংস্করণকে
অখণ্ড করতে কোনোদিন।
(চিরদিনের একাত্ম আমরা—
সত্য বলতে, ও-ই কি আমি নই ?)
তবু আজ ও আর আমি কত দূরে—
ঠিক যত দূরে আমি আর আমার প্রিয়—
যত দূরে তুমি আর আমরা—
আর ঠিক যতই আমরা কাছাকাছি !
কিন্তু অদ্ভুত তোমার ভালোবাসা :
যে-ভালোবাসা আজ আমাদের মধ্যে প্রকাশ পেল !
তোমার ভালোবাসার তাড়সে
আর আমাদের ভালোবাসার তাড়নায়—
তোমার আর আমাদের প্রেমের স্থূল-পরিমাণে—
পৃথিবী সমস্ত ফুল কাঁটা হয়ে ফুটছে যে !

আমার যে সব ফুল ফুটেছিল তারা গেল কোথায় ?

চাকার নীচে

এক অঙ্ক এবং একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ, উপস্থিত সমস্যাসঙ্কুল এই সামাজিক নাটকটি বেরিয়েছিল নাচঘরে—প্রায় দু'যুগ আগে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত উক্ত (অধুনালুপ্ত) সাপ্তাহিকে লেখাটি ধারাবাহিক বেরয় ১৩৩৫ সালে—এটি তারও কয়েক বছর আগেকার রচনা বলে আমি মনে করি। কেননা সে সময়ে, খুব কম তরুণ লেখকের রচনাই, লিখিত হওয়ার সাথে সাথে সম্পাদক বা প্রকাশকের অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হোতো। এবং আমি নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ছিলাম না।

নাটকের ঘটনাস্থল মফস্বলের কোনো সহর। ঘটনাকাল—বর্তমা
পাত্র-পাত্রীর পূর্ব-পরিচয় অনাবশ্যক।

হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শৈলেশ্বর বসুর বসিবার ঘর—ই আফিস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এই ঘরখানি ঠিক মাঝখানে ইহার একদিকে বসুমহাশয়ের অন্দরমহল, অপরদিকে ছাত্রাবাস- দুইধারে দুইটি দরজা এই দুই দিকের সহিত যোগরক্ষা করিতেছে পিছনদিকে বাহিরে যাতায়াতের সদর দ্বার, এবং একপাশে একটি ব জানালা—জানালার ভিতর দিয়া অদূরে যে রাস্তা আছে তার পরিচয়স্বরূপ বাড়িগুলির একাংশ দেখা যায়।

বসুমহাশয় টেবিলের ধারে বসিয়া এইমাত্র ডাকে-আসা কাগজ পত্রগুলি খুলিয়া দেখিতেছেন। অতসী জানালার বাহিরে রাস্তা দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া—যেন কাহারো প্রতীক্ষায় আছে।

শীতকালের স্বল্পায়ু শেষ-বেলার সামান্য সূর্যকিরণ পথবর্তী বাড়িগুলির উপর ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া মিলাইয়া গেল।

শৈলেশ্বর (একখানি চিঠি শেষ করিয়া)। অতসী —

অতসী (চকিত)। কি দাদা?

শৈলেশ্বর (চিন্তান্বিত মুখে)। আলোটা জ্বালো তো দিদি [একটু থামিয়া।] যে অন্ধকার, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—

অতসী। অন্ধকার কই, এই তো সবে সন্ধ্যা হোলো দাদা [আলো জ্বালিয়া দিল।]

শৈলেশ্বর। এই সবে সন্ধ্যা হোলো। ও! (চিঠিখানি নাড়িতে নাড়িতে) তিনি আবার লিখেচেন অতসী।

অতসী। কে দাদা ?

শৈলেশ্বর। তাঁর কথা তো তোমাকে বলেচি অতসী।

আতসী। নমিতা-দিদি ?

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ, তিনিই। (একটু থামিলেন) তিনি এবার এখানে আস্‌বেন বলে লিখেচেন।

অতসী। তাই নাকি ? আস্‌বেন ? ভালো হয় তাহলে।

শৈলেশ্বর। ভালো নয় অতসী। তাছাড়া, কিঙ্কর আমার বন্ধু—

অতসী। কিন্তু আমিও তো রয়েচি দাদা, এ ব্যাপারে কি তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারোনা ?

শৈলেশ্বর। পারিনে আবার! তুমিই তো আমার ভরসা দিদি, কিন্তু তোমার নমিতাদিদিকে তো তুমি চেনো অতসী—!

অতসী। বড্ড একগুঁয়ে! যখন আমি বেথুনস্কুলে ঢুকি তখন তিনি আমার ঢের উঁচুতে পড়তেন, তখন থেকেই তো তাঁকে জানি। বোর্ডিংএ একদিন এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন—। তাহোক্ দাদা, তিনি আসুন।—কতদিন পরে দেখা হবে। নিজের বোনের মতই আমাকে তিনি দেখতেন।

শৈলেশ্বর। তুমি বুঝতে পারচনা অতসী! এতদিন পরে—এখানে—তিনি—

অতসী। ভয় কি দাদা ?

শৈলেশ্বর। না, ভয় তো তাঁকে নয়—তাঁর যে ঐ কী এক ধারণা হয়ে গেছে—

অতসী। তোমার সঙ্গেই তাঁর সত্যিকার বিয়ে হয়েচে—তাঁর এই ধারণায় কথা বল্‌চ! এর জন্যেই ভাবনা ?

শৈলেশ্বর। ভাবনার কথা বই কি অতসী। এই ধারণাটা তো তাঁর সত্যি নয়।

অতসী। কিন্তু নমিতাদি তো বলেন—এটাই সত্যি? মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি বটে কিন্তু মনের ওপরে মন্ত্রকে বড়ো বলে তিনি মানেন না। আর তাছাড়া তিনি বল্‌ছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানেরও নাকি কোনো ত্রুটি হয়নি। মন্ত্রটা সাম্‌নে না হোক্‌ পাশের ঘরেই পড়া হচ্ছিল—

শৈলেশ্বর। সেটাই তো একটা প্রকাণ্ড ছেলেমানুষি অতসী। শোনো বলি তবে। সেদিন সন্ধ্যায় আমার খুড়তুত বোনের বিয়ে, নিমন্ত্রিত হয়ে নমিতারাও এসেছিলেন। পরের দিন পরীক্ষার তাড়া ছিল—আমি এ-ঘরে ঘাড় গুঁজে নোট মুখস্ত করচি, এমন সময়ে পাশের ঘরে শাঁখ বেজে উঠল্‌, তখন বোধ করি কন্যা-সম্প্রদান হচ্ছিল, চারিদিকে উলুধ্বনি—আমি হঠাৎ চম্‌কে মাথা তুলে দেখি নমিতা আমার গলায় একছড়া মালা পরিয়ে দিয়ে আমাকে প্রণাম করচেন।

অতসী। নমিতাদিদি সেকথা আমাকে বলেচেন—

শৈলেশ্বর। আমি বল্লুম, নমিতা, এ কি করে? সে একটু হেসে বল্লে—আজ গোধুলি-লগ্নে আমাদেরও বিয়ে হয়ে গেল। বলেই আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রার্থনা করল,—কিন্তু সে কথা থাক্‌।

অতসী। কিন্তু তুমি যে সেই মুহূর্তে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে তোমার মুখভাবে তার স্পষ্ট স্বীকারে তিনি দেখেছেন,—এটা কি সত্যি নয় দাদা?

শৈলেশ্বর (একটু হাসিয়া)। তখনো যে আমার এতটা বয়স হয়নি অতসী! সেদিন সন্ধ্যায় চারিদিকের উৎসব-প্রবাহের উচ্ছ্বসিত

মুহূর্তে আমার এই মুখবেচারা যদি কিছু স্বীকার করেই থাকে তার জন্যে তো তাকে কোনো দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু আমি খুব ভেবেছিলুম—সারা রাত পায়চারি করলুম আর ভাবলুম ; তারপরদিনই সকালে গিয়ে তাঁকে জানালুম যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি আরেকটি নারীকে ভালোবাসি এবং আমি তাঁর যোগ্য নই।

অতসী। কিন্তু তিনি তো সেকথা বিশ্বাস করেননি, আর এখনো করেন না! তোমার সঙ্গে কোনো মেয়েকে কখনো তিনি দেখেননি, কোনোদিন তোমার কাছে এমন কারও নামও তিনি শোনেন নি। তিনি কেন, কেউই না ;—আমি তো এতদিন আছি, কই, আমিও তো শুনিনি দাদা?

শৈলেশ্বর। সেকথা যে আমি কাউকে আজো বলিনি ভাই, শুনবে কোত্থেকে। কিন্তু থাক্ সে কথা, তার পরে তো নমিতার সত্যিকার বিবাহই হয়েছে—

অতসী। না দাদা, সত্যিকার বিবাহ মেয়েদের একবারই হয়, সেটা সেই তোমার সঙ্গেই, তারপরে যেটা সেটা কেবল বিধিসঙ্গত বিয়ে, তাছাড়া কিছু না।

শৈলেশ্বর। পাগলী কোথাকার। এমন কথা বল্‌তে নেই—!

অতসী। সাপের খোলোসের চেয়ে সাপটা যদি বড় সত্য হয় দাদা, তবে কেন বল্‌তে নেই? কিন্তু আমি শুধু এই ভেবে আশ্চর্য হই, নমিতাদি এটা পারলেন কি করে'? কোনো কোনো হতভাগীর কপালে বিপাকে পড়ে এই মিথ্যে অভিনয় হয়ত ঘটে, কিন্তু তাঁর তো এমন কোনো দায় ছিলনা—তাঁর ঘাড়ের ওপর ত বাপ-মা চেপে বসেছিলেন না। কেবল একটি ছোটো ভাই—

শৈলেশ্বর। আমার মনে হয় কি দিদি, কেউ তাঁকে বাধ্য করেনি, তিনি নিজের খুসিতেই—। জানো তো তিনি কিরকম একগুঁয়ে ছিলেন, আর কিঙ্কর অনেকদিন থেকেই তাঁকে আবেদন জানাচ্ছিল, আমার কাছে হতাশ হয়ে ঝোঁকের মাথায় তিনি—

অতসী। তার আবেদনটাই গ্রাহ্য করে ফেল্লেন। হয়তো বা তাই হবে। কিন্তু কই, তাঁর কথা তো আমাকে কিছুই বল্লেনা—এই একমাত্র যাঁকে তুমি ভালোবেসেচ ?

শৈলেশ্বর। তাঁর কথা! তাঁর কথা তো কিছুই আমি জানিনে অতসী! এইমাত্র জানি যে কেবল তিনি ছাড়া এই জীবনে আমার আরাধনার আর কেউ নেই—

অতসী। কে তিনি ? কোথায় থাকেন দাদা ?

শৈলেশ্বর। তাই ত জানিনে ভাই! যদি জান্‌তুম তবে ত তাঁকে এইখানে নিয়ে আসতুম। জানি একদিন তাঁকে আসতে হবেই। আজন্ম তাঁর প্রতীক্ষাই তো করচি—তিনি আসবেন বলেই তো এ ঘরে আমি আর কাউকে আনিনি, আন্‌তে চাই না।

অতসী। কিন্তু এই ঘরে তো আমি আছি, আমাকে ত এনেচ।

শৈলেশ্বর। তুমি আর কদিন আছো, তোমাকে আর এক জনের ঘরণী হতে হবে—

অতসী। না দাদা!

শৈলেশ্বর। তোমার পাত্রও আমি স্থির করে রেখেচি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বভাব-চরিত্র সব দিক দিয়ে এমন সুপাত্র যে, এবার আর সম্বন্ধ ভাঙ্‌তে হবে না।

অতসী। না দাদা!

শৈলেশ্বর। না কোন্‌টা? বিবাহটা না পাত্রটা?

অতসী। বার বার বিড়ম্বনা—এইটেই আর নয় দাদা!

[জানালার কাছে গেল।

শৈলেশ্বর। বিড়ম্বনা কেন হবে, নিজে যদি তুমি স্বয়ম্বরা হও? আর তাই আমি হতে দেব, এতদিন পরে তোমার দাদার সম্বন্ধে এই অনুদার ধারণাটা কি করে হোলো অতসী? আপনার-দাদা নই বলেই কি?

অতসী। যেদিন স্বয়ম্বরা হব, তার আগে ত তুমি বিয়ে দিচ্চ না? তাহলে সে কথা সেই দিনই হবে, আজ আর নয়। আমি আমার বৌদিকে না দেখে কিছুতেই নড়চি না, যতই তাড়াতে চাও না কেন।

শৈলেশ্বর। তোমার বৌদি! তুমি বল্‌চ কি অতসী?

অতসী। সেই যে তুমি যাকে বিয়ে করবে—যাকে এই ঘরে আনবে বলে আমাদের তাড়াতে চাচ্চো—

[দূর-পথে মোটরের 'হর্ণ' বাজিল]

শৈলেশ্বর। পাগলী মেয়ে আর কাকে বলে! আরে তিনি যে—। তবে বলি সব—তিনি হচ্চেন—

[পুনরায় 'হর্ণ' বাজিল]

অতসী (জানালায় বাহিরে চাহিয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল)। গেল গেল—সর্বনাশ!

শৈলেশ্বর। কি হোলো, কি হোলো অতসী?

অতসী। একজন লোক!—

শৈলেশ্বর। য়্যাঁ?—

অতসী। একজন লোক রাস্তা পেরচ্ছিল এমন সময় মোটর চাপা পড়েচে,—একেবারে চাকার নিচে—

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? আহাহা! দেখি গে লোকটাকে—

[চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন]

অতসী। এক বুড়ো ভিখিরি—

শৈলেশ্বর। ওঃ, ভিখিরি! [পুনরায় বসিলেন।] বেচারা অনেক দিন থেকেই চাকার নিচে পড়েচে, আজ শুধু ওর জীর্ণ দেহটা পড়ল বৈ তো নয়!

অতসী (বাহিরে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল)। কী ভয়ানক!—

শৈলেশ্বর। ছেলেপিলেদের বাইরে ছেড়ে দেয়া দায় হল দেখচি। রোজই এমনি ছুটো-একটা ঘটচেই—।

[ছাত্রমহলের দিকের দরজায় করাঘাত হইল।

কে ও?

বিকাশ (নেপথ্যে)। আমি বিকাশ। ভেতরে আসতে পারি?

শৈলেশ্বর। বিকাশ? এসো এসো।

[যুবকটি ভিতরে আসিল, দরজাটা তার পিছনে খোলাই রহিল।

বিকাশ। টাইমটেবল্‌খানা দিতে এলুম।

শৈলেশ্বর (বইখানি হাতে লইয়া) এরই মধ্যে কাজ হয়ে গেল? কোথাও যাবে নাকি?

বিকাশ। কোথাও যাবো কি না বল্‌তে পারি না, তবে রাত্রের ট্রেণগুলো দেখছিলাম।

অতসী। আজ রাত্রেই? সমস্ত বড়দিনের ছুটিটা একলা হোষ্টেলে

কাটিয়ে পরশু যখন কলেজ খুলছে, এর মধ্যে হঠাৎ কোথায় যাবার কথা মনে পড়ল বিকাশবাবু ?

শৈলেশ্বর। কলেজ পরশু খুলবে বটে, কিন্তু হোস্‌টেলের ছেলেরা সব কালই এসে পড়বে। তোমাদের টেস্‌ট্‌-পরীক্ষাও তো এগিয়ে এল! না, বিকাশ ?

বিকাশ। হ্যাঁ, আমার নিজের একটা পরীক্ষা আসন্ন বটে।

শৈলেশ্বর। (ঈষৎ বিস্ময়ে) তোমার নিজের পরীক্ষা ?—

অতসী। (খোলা দরজার পথে চাহিয়া দেখিল) একি ? জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে ফেলেছেন দেখছি, সত্যিই যাচ্চেন তবে ?

বিকাশ। যাচ্চি কিনা বল্‌তে পারিনে, তবে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌চি। কি জানেন অতসী দেবী, পৃথিবীটা একটা বিরাট প্লাটফর্ম, কখন্ কার গাড়ী এসে পড়ে কিছু তো স্থির নেই, সব সময়েই যাবার জন্যে তৈরি থাকা ভালো।

শৈলেশ্বর। প্লাটফর্ম! পৃথিবী!

অতসী। কিন্তু তাই যদি হয় বিকাশবাবু, তাহলে অপ্রস্তুত থাকাটা তো আরো ভালো, কেননা এমন ট্রেণ ফেল্ করলে দুঃখিত হবার কিছু নেই!

বিকাশ। কিন্তু কোথায় যে প্লাটফর্ম আর কোন্‌খানে যে রেলের লাইন তাই যে চোখে দেখা যায় না অতসীদেবী! এই ভাবচি নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়েচি, আর এই দেখি একেবারে চাকার নিচে—যখন উদ্ধারের আর কোনো উপায় নেই—

শৈলেশ্বর। হুঁ—চাকার নিচে!

বিকাশ। জিনিসগুলোর বাঁধাছাঁদা বাকি আছে—আমি যাই—

[ছাত্র-মহলের ভিতরে গিয়া পিছনে দরজা ভেজাইয়া ছিল।

অতসী। টাইম্ টেবিলটা দেখি দাদা! [হাতে লইয়া খুলিয়া কী দেখিল।] আজ বিকেলের দিকে ত একটা ট্রেণ ছিল। তাহলে ত এতক্ষণে এসে পড়বার কথা!

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্যর কথা বলচো?

অতসী। (চকিত হইয়া) হ্যাঁ, অনিন্দ্যই ত!

শৈলেশ্বর। সে তো বিকেলে নয়, সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরবে। সে-ট্রেণ্ আবার প্রায়ই লেট্ করে! কিন্তু অনিন্দ্যর কথা না, আর কারো কথা তুমি ভাব্‌ছিলে।

অতসী। না দাদা, কার কথা ভাববো, অনিন্দ্য ছাড়া আবার কি! আর কে আস্‌বে? কিন্তু দেখ দাদা, ও তো এই দুদিন মাত্র নেই, সারা বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করচে।

শৈলেশ্বর। কলকাতায় যে-ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েচি তিনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। নামজাদা হার্ট্ স্পেশলিস্ট। সেখানে অনিন্দ্য নিজের বাড়ীর মতই আদর পাবে। সে ত ঘর ছেড়ে কোথাও বেরুতে পারলেই বাঁচে। কী যে তার অসুখ হয়েচে কিছুই তো বোঝা যাচ্চে না।

অতসী। হয়তো কিছুই হয়নি, আমরা অকারণ ভাবনায় মিথ্যে বাড়িয়ে দেখচি।

শৈলেশ্বর। তাই হোক্ দিদি, তাই হোক্। ডাক্তারের রিপোর্টে যেন সেই সুখবরই থাকে। ওতো আমার ভাইপো নয়, ওই আমার ছেলে, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন—

[স্তব্ধ রহিলেন।

অতসী (ক্ষণেক নীরবতার পর) আচ্ছা দাদা, শেষাদ্রিকে তোমার মনে পড়ে ? শেষাদ্রিবাবু ?

শৈলেশ্বর। একটু পড়ে বইকি। কেন বলতো দিদি ?

অতসী। এমনি।

শৈলেশ্বর। আগে ত এই হোষ্টেলেই ছিলেন, বিশেষ কারণে তাঁকে চলে যেতে হয়।

অতসী। তোমাকে অপমান করেছিলেন বলেইত ?

শৈলেশ্বর। না, অপমান তিনি করেননি, তিনি তো অভদ্র নন। কিন্তু ভেতরের ঘটনা কেউ জানেনা, কাউকে বলিও নি। বল্‌লে 'এক্‌স্‌পাল্‌সনের' চেয়েও আরো বেশি অনিষ্ট হোতো। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ যে ভেঙে গেছে সে ভালোই হয়েছে।

অতসী। কিন্তু কেবল এখানকার পরিচয়ই ত নয়, ছেলেবেলা থেকেই তো তাঁকে জানি, আমার বাবা বহুদিন তাঁদের গ্রামে পোষ্ট-মাষ্টারি করেছিলেন—আমি তো ভাবতেই পারিনে এমন কোনো-কিছুর সঙ্গে তিনি জড়িত হতে পারেন যা প্রকাশ করাও লজ্জার—

শৈলেশ্বর। লজ্জার—তাতো আমি বলিনি অতসী। কিন্তু সে যে কী, তা তুমি জান্‌তে চেয়োনা। (একটু থামিয়া) যদি নিতান্তই শুন্‌তে চাও, আরেক দিন না হয় বলব তোমায়।

অতসী। আরেক দিন নয় দাদা, আজই শুন্‌ব।

শৈলেশ্বর। (একটু ভাবিয়া) শেষাদ্রির একটা চিঠি আমার হাতে পড়েছিল। জানোই ত, হোষ্টেলের ছেলেদের যত চিঠি আসে সব আমার হাত দিয়ে যায়। চিঠিখানার বিশেষত্ব ছিল, আমার

কেমন সন্দেহ হয়, অবসর সময়ে পড়ে দেখবার জন্যে কাছে রেখে দিই। জানোই ত, প্রয়োজন বোধ করলে ছেলেদের চিঠি খোল্‌বার অধিকার আমার আছে।

অতসী। জানি দাদা, তার পর ?

শৈলেশ্বর। তারপর শেষাদ্রি কি করে জেনেছিল যে তার চিঠি এসেছে। আমার কাছে এসে চাইতে আমি তাকে বল্লাম, পরে দেব। চিঠিখানা আমি পড়তে চাই জানা মাত্রই সে সহসা আমাকে আক্রমণ করে চিঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে।

অতসী। ছিনিয়ে নিলে ?

শৈলেশ্বর। পরে সে অবশ্যি মাপ চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাগের মাথায় তাকে 'এক্‌স্‌পেল' করে দিলুম। এখন বুঝেছি ভালো করিনি। কেননা তার বিশেষ দোষ ছিল না। আর সেই চিঠি—

অতসী (রুদ্ধনিশ্বাসে)। সেই চিঠিতে কী ছিল ? তুমি পড়েছিলে ?

শৈলেশ্বর। চিঠিতে যাই থাক, আমার এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না যে জীবনে যে ব্যাপারে নিজেকে সে জড়িয়েচে তাতে তোমাকে সেই সঙ্গে জড়াবার তার অধিকার নেই—

অতসী। কী সেই ব্যাপার—একটু পরিষ্কার করে বলো দাদা—

শৈলেশ্বর। আজই এতো ব্যস্ততা কি অতসী ? তুমি বা আমি আজই তো কোথাও চলে যাচ্চি না ?

অতসী। যদিই যাই ? (নিজেকে সাম্‌লাইয়া)। কেবল কৌতূহল দাদা !

শৈলেশ্বর। শেষাদ্রি কি তোমাকে আজো চিঠিপত্র লেখেন ?

অতসী (দ্বিধাভরে)। মাঝে মাঝে লেখেন—

শৈলেশ্বর। শেষাদ্রির অভিভাবক বা আপনার জন কেউ আছেন জানো অতসী ?

অতসী। বাবা যেখানে পোষ্টমাষ্টারি করতেন সেখানে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় থেকে তিনি পড়তেন—সে ত আমার ছেলেবেলার কথা। তখনই শুনেছিলুম তাঁর এক দিদি ছাড়া আর কেউ নেই। আচ্ছা দাদা, তাঁর সঙ্গে যদি ফের তোমার দেখা হয়, তুমি কি খুব রাগ করবে ?

শৈলেশ্বর। রাগ করব কেন ভাই ? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি বরং খুসীই হব। কিন্তু কি করতে আর এখানে আসবেন তিনি ?

অতসী। আসবেন দাদা, খুব শীঘ্রই হয়ত আসবেন।

শৈলেশ্বর। খুব শীঘ্রই···আজই কি অতসী ?

অতসী (ধরা পড়িয়া)। লিখেছিলেন বটে কিন্তু আজ বোধ হয় আর এলেন না !

শৈলেশ্বর (কি যেন আবিষ্কার করিয়াছেন, এই ভাবে)। তখন থেকেই ত আমি বল্‌চি অতসী, আনিন্দ্য নয়, আর কারো কথা তুমি ভাবচ, দ্যাখো ধরতে পেরেচি কিনা !

অতসী। দাদা !

শৈলেশ্বর (স্নিগ্ধস্বরে)। দুষ্টু বোন্‌টি ! না, অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েচে, এইবার একটু ঘুরে আসি।

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অতসী। তোমাকে না জানিয়ে তাঁকে আসতে লিখেচি এজন্যে তোমার দুষ্টু বোনটিতে ক্ষমা করলে ত দাদা ?

শৈলেশ্বর। ক্ষমা? (তার পিঠে একটা চাপড় দিয়া) দুষ্ট বোনকে আমি কখনো ক্ষমা করিনে; দুষ্ট বোনকে আমি ভালোবাসি।

অতসী। বেশিক্ষণ বাইরে থেকোনা কিন্তু। হিম পড়চে, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু হিম কেবল পায়েই পড়বে, আমার টুঁটি টিপে ধরতে পারবে না।

[গলায় জড়ানো পশমের গলাবন্ধটা দেখাইলেন]

এখানে যে আমি তোমার হাতের আওতার মধ্যে রয়েছি—না দিদি, ভয় নেই, বেশী দূর যাবো না। কেবল ষ্টেশন পর্যন্ত—অনিন্দ্য হয় তো আজ আসতে পারে।

[বাহির হইয়া গেলেন। ছাত্রমহল হইতে বিকাশ প্রবেশ করিল]

অতসী। কি বিকাশবাবু, আপনার বাঁধাছাদা সমাধা হোলো?

বিকাশ। হোলো আর কোথায়? মোটঘাট বাঁধ্‌তে গিয়ে দেখি নিজেই কখন বাঁধা পড়ে গেছি!

অতসী। তাহলে খুলে ফেলুন। মানে, আপনার মোটঘাট-গুলোই—

বিকাশ। ওগুলো না হয় খুলে ফেল্‌ব—একবেলার বাঁধা, কিন্তু যেখানে অনেকদিনের বাঁধন, অতসী দেবি?

অতসী (তাহার উত্তর এড়াইবার জন্য দরজার ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল)। সবই ত বেঁধেচেন, সমস্তই নিয়ে যাচ্চেন নাকি?

বিকাশ। যাবার সময় সব নিয়ে যেতে পারব কিনা কে জানে—

অতসী। কেন, জিনিষপত্র তো খুব বেশী নয়?

বিকাশ। তা নয়, কিন্তু যে সব দামী জিনিষ তা তো রেখেই যেতে হবে।

অতসী। রাখবেন কেন, নিয়ে যাবেন।

বিকাশ। নিয়ে যাব? সত্যি নিয়ে যাব অতসী? সত্যি বল্‌চো তুমি?

অতসী। কী বল্‌চেন বুঝতে পারচি না।

বিকাশ। এতদিনেও না?—এখনো না?

অতসী। একটু একটু পারচি বোধ হয়।

বিকাশ। অতসী! তোমার সঙ্গে আমার কতদিনের—

অতসী। সে কেবল আপনি অনিন্দ্যকে কতদিন থেকে পড়াচ্ছেন বলেই। ওর শরীর খারাপ বলে দাদা তো ওকে ইস্কুলে দেবেন না, বাড়ীতেই পড়াবেন। সেই সূত্রেই আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু আপনি তো জানেন, দাদা আমাকে স্বাধীনতা দিলেও আমি হোষ্টেলের কোনো ছেলের সঙ্গে বড়-একটা মিশিনে; এবং আপনি ছাড়া আর কারোই সদাসর্বদা এ-ঘরে আস্‌বার অধিকার নেই—

বিকাশ। কিন্তু আমি কি কোনদিন সেই অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেচি?

অতসী। না, সীমা লঙ্ঘন করেচেন বলিনে, কিন্তু আজ যেন সেই সীমাটাকেই বাড়িয়ে নিতে চাচ্চেন।

বিকাশ। আমি তো সীমাটাকেই অধিকার করতে চাচ্চি অতসী, সীমাই যে আপনি ছাড়িয়ে যাচ্চে। বাস্তবিক, এক একটা বস্তুর সীমা যেন আর পাওয়াই যায় না।

অতসী। বিকাশবাবু, 'ফিলজফি' আমার 'সাব্‌জেক্ট' ছিল না যে আপনার হেঁয়ালী বুঝতে পারব।

বিকাশ। কিন্তু তোমাকে যে আমার বোঝানো চাইই অতসী—অন্ততঃ একটা কথা।

অতসী। বেশতো, আজ না হয় কাল বোঝাবেন। তাড়া কি?

বিকাশ। কাল? কাল কি আর তোমাকে পাবো?

অতসী (চমকিত হইয়া)। কেন, কাল কি আমি কোথাও পালিয়ে যাচ্চি?

বিকাশ। তুমি যাচ্চো না, কিন্তু কাল আমি হয়ত আর এখানে নেই—

অতসী। কিন্তু শীঘ্রই তো ফিরে আস্‌চেন আবার?

বিকাশ। তাও বল্‌তে পারিনে অতসী। আর তাছাড়া—যথার্থ কাল কোনোদিন আসে একথা আমি বিশ্বাস করতেই পারিনে। জীবনে সুসময়ের প্রতীক্ষা করলে ঠকতে হয়—হয়তো সেই সময় ঠিক এখনই এসেচে, নয় তো আর কখনই ধরা দেবে না।

অতসী। কী বল্‌তে চান বলুন তবে।

বিকাশ। আমার তো মনে হয় কথাটা আমি [illegible]চি, কেবল তার জবাবটাই যেন পাইনি।

অতসী। খুসি হবেন কিনা জানিনে, কিন্তু জবাবটা আমি স্পষ্ট করেই দেব—এতদিন আপনার সঙ্গে আমার যে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, আজ তার অন্যথা হবার মতো কিছু ঘটা তো উচিত নয়।

বিকাশ (সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া)। বন্ধুত্বের সম্পর্ক? অতসী, সত্যি? বন্ধু? আমি তোমার বন্ধু, তুমি স্বীকার করচো?

অতসী (কিছু বিব্রত হইয়া)। হ্যাঁ, একজন বন্ধু বই কি—

বিকাশ। একশ জনের মধ্যে একজন হলেও আমার এ আনন্দের অবধি নেই। তুমিও আমার বন্ধু তো! ছাখো অতসী, আমি স্পষ্ট করে কথা বল্‌তে পারি নে, সেটা আমার অক্ষমতা, কিন্তু তাতে আমার কথার অর্থ তোমার কাছে একটুও ত অস্পষ্ট হয়নি। আমি তো এই অধিকারই তোমার কাছে চাইছিলুম—এর বেশী আর কী চাইতে পারি?

অতসী। তবে এখন তো নিশ্চিন্ত হয়েচেন? এখন তাহলে আমর ছুটি?

[অতসী অন্দরমহলের ভিতরে গেল
শেষাদ্রি সদর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল]

বিকাশ। এই যে শেষাদ্রি এত দেরি যে? তোমার না আজ দুপুরে আসার কথা?

শেষাদ্রি। এক ব্যাটা সি-আই-ডি পিছু নিয়েছিল তাকে ফাঁকি দিয়ে আস্‌তেই ত লেট্ খেয়ে গেলাম।

বিকাশ। সি-আই-ডি পিছু নিয়েছিল! বল কি শেষাদ্রি?

শেষাদ্রি। ভয় কি বিকাশ? এ বিয়ের যে এই মন্ত্র!

বিকাশ। তোমার বিয়ে তুমি করো। আন্দামানের বাসরঘরটা আমার তেমন মজার ঠেক্‌চে না। তা, কি করে তাকে ফাঁকি দিলে?

শেষাদ্রি। যে শ্যেন-দৃষ্টি—সহজে কি এড়ানো যায়? দু-দুবার ট্রেণ বদ্‌লাতে হয়েচে। দ্বিতীয় বারে করেচি কি, আমাদের গাড়ী প্লাটফর্মে ঢুক্‌চে—আর একটা গাড়ী উল্টোদিকে ষ্টেশন থেকে ছেড়েচে, আমাদের গাড়ী থেকে হাত বাড়িয়ে সেই চলন্ত গাড়ীতে গিয়ে উঠে

পড়লুম—সেই গাড়ীতেই ত আস্‌চি। কিন্তু যদি একটুর জন্যে ফস্‌কে যেত, যদি গাড়ীর হাতলটা না ধরতে পারতুম—

বিকাশ। তাহলে?

শেষাদ্রি। এমন কিছু নয়—

বিকাশ। তবু?

শেষাদ্রি। একেবারে সেই চলন্ত গাড়ীর চাকার নিচে।

বিকাশ (ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া)। তোমাকে আস্‌তে লিখে অবধি এই ক'টা দিন আমি খুব ভেবেচি, আমি বলি কি, কাজ নেই ভাই একাজে। এ কেবল কারার লৌহ-প্রাচীরের পায়ে যৌবনের বলিদান!—

শেষাদ্রি। যত বড় সত্য তার জন্য তত বড় দুঃখ—এই ট্রাজেডি নিয়েই মানুষের ইতিহাস। কিন্তু তোমার প্রাণে ভয় ঢুকল কবে থেকে? তুমিই ত ছিলে বেশী সাহসী? তুমিই ত বেশী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে?

বিকাশ (সহসা)। আচ্ছা বিপ্লব সত্য, না যৌবন সত্য?

শেষাদ্রি। সে তর্কের অবসর এখন নেই। জেলখানায় বসে তার মীমাংসায় মাথার চুল পাকানো যাবে,- এখন তুমি যার খবর দিয়েছিলে তিনি কি সত্যি সত্যিই খুব বড়লোক?

বিকাশ। মহিমবাবু বড়লোক বই কি।

শেষাদ্রি। সেই মহিমবাবু!

বিকাশ। মহিমবাবুকে তুমি জানতে নাকি? এই যে, পাশের বাড়ীতেই তিনি থাকেন। এই দিকে—

[দুজনে জানালার কাছে গেল]

শেষাদ্রি। এই মস্ত বাড়ীটা? না, আমার অজানা নয়! সেবার এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল,—যাক্, আজ সে ত্রুটি শুধরে নেব।

বিকাশ। কিন্তু আমি বলি কি, কাজ নেই।

শেষাদ্রি। এতদূর এগিয়ে এসে সব ঠিকঠাক্—এখন বল্‌চ কাজ নেই, পাগল হলে নাকি?

বিকাশ। আমার আসল মন এতদিন যে ঘুমিয়েছিল তাতো জানতুম না। এখন সে জেগে আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেচে। কদিন ধরে কেবলি আমার মনে হচ্চে দেশজয়ের চেয়ে একটা নারীর চিত্তজয় যেন ঢের বড় কাজ।

শেষাদ্রি (বিস্মিতভাবে)। নারীর চিত্তজয়?—

বিকাশ। আশ্চর্য হচ্ছ? কেন কবি তো বলেচেন—

"রমণীর মন—

সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন॥"

শেষাদ্রি। কিন্তু কবি না বল্‌লেও বিশ্বসুদ্ধ সবাই এটা জানে যে নারীকে ধরতে যাওয়া কিছু নয়; তারাই ত ধরবার জন্য ফেরে,—কিন্তু মজা এই যে ধরতে গেলে ধরা দেয় না—।

বিকাশ। যাই হোক্, আমি বুঝতে পেরেছি বিপ্লব-সাধনা আমার নয়—। অনেকদিন তোমাদের দলে অনেক খেটেচি, এইবার তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

শেষাদ্রি। মুক্তি? দল থেকে মুক্তির মানে তো তুমি জানো?

বিকাশ। মৃত্যু? [হাসিবার চেষ্টা করিয়া] এ আমি কোনদিন বিশ্বাস করিনি। আমরা কখনো এত নিষ্ঠুর হতে পারি না।

শেষাদ্রি। নিষ্ঠুরতা কোথায়—এ তো কর্তব্য। কিন্তু একথা

কেন, তুমিও আমাদের ছেড়ে যাচ্চ না, আমরাও তোমাকে বধ করচিনে। হ্যাঁ, একটা কথা এখনো তোমাকে বলিনি,—এই কাজ ছাড়া ও আরো একটা কাজ আমার আছে।

বিকাশ। আবার কী কাজ?

শেষাদ্রি। কাজ একটাই—তারপরের কাজ পলায়ন—আজ রাত্রেই পালাবো কিন্তু কেবল তুমি আর আমি নই, আরো একজন।

বিকাশ। তিনজন? আরেক জন কে?

শেষাদ্রি। বল্‌চি শোনো—হ্যাঁ, আরেকজন—

[সদর দরজার বাহিরে করাঘাত]

বিকাশ। খোলা আছে। ভেতরে আসুন।

[কিঙ্কর সরকার প্রবেশ করিলেন। শেষাদ্রিকে দেখিয়া যেন কিছু চকিতই হইলেন।—শেষাদ্রিও তার দিকে তাকাইয়া রহিল]

কিঙ্কর। শৈলেশ্বরবাবু আছেন?

বিকাশ। না, তিনি একটু আগে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কিঙ্কর। ফির্‌তে তাঁর বোধ করি একটু দেরিই হবে?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিঙ্কর। তাহলে [একটু ভাবিয়া] কিছু পরেই আসব এখন।

[বাহির হইয়া গেলেন]

শেষাদ্রি। তুমি একে চেনো নাকি?

বিকাশ। হ্যাঁ, তুমিও চেন বলে' বোধ হচ্চে।

শেষাদ্রি। এই ত সেই সি-আই-ডি। আমার পিছু নিয়েচে—

বিকাশ। দূর! যে স্কুল থেকে পাশ করে এই কলেজে এলাম ইনি সেখানকার সেকেণ্ড মাষ্টার—কিঙ্করবাবু।

শেষাদ্রি। তোমাদের স্কুলের ছেলেরা কোন্ এক মাষ্টারকে একবার খুব উত্তম মধ্যম দিয়েছিল শুনিচি—

বিকাশ। এই কিঙ্করবাবুকেই।

শেষাদ্রি। তবে ঠিক হয়েচে। লোকটা ছেলেদের খবর পুলিশে দিত! তাই ওই মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা তারা করেছিল।

বিকাশ। মোটেই তা না, ছেলেদের খুব ফেল্ করাতেন বলেই—

শেষাদ্রি। যেজন্যেই মেরে থাকুক আর উনি যাই হোন্—যদি আমার পথে দাঁড়ান তবে আর ছেড়ে কথা নয়।—

[পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া

পরীক্ষা করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিল]

বিকাশ। সন্দেহ রাখা কেন—লোকটার অনুসরণ করে দেখাই যাক না, যায় কোথায়। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে যাবে।

শেষাদ্রি। কোনো প্রয়োজন নেই। হাত গুণে বলে দিচ্ছি, সোজা থানার গিয়ে উঠ্বে। বরং চল, সাম্‌নের কেবিনে চা-টা খেয়ে মেজাজ চান্‌কে নিয়ে আসা যাক্।

বিকাশ। তাই চল। চা খেয়ে তুমি এখানে এসে বিশ্রাম করবে। আমার দুএকটা কাজ আছে—একেবারে সেরে ফিরব।

[উভয়ে বাহিরে গেল]

[কিছুক্ষণের বিরতি]

[অতসী চিন্তিতমুখে অন্দর হইতে আসিল। টাইম্‌টেবল্‌খানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া একান্ত মনোযোগে কী দেখিতেছে, এমন সময়ে সদর দ্বার দিয়া শেষাদ্রি একা ফিরিয়া আসিল। চুপি চুপি আসিয়া পিছন হইতে অতসীর চোখ টিপিয়া ধরিল।]

অতসী। চিনেচি মশাই, চিনেচি।

[শেষাদ্রি তার গালে একটা চুমু দিয়া চোখ ছাড়িয়া দিল।]

শেষাদ্রি।—এতদিনের রাজকর!

অতসী। রাজকর যদি তো চুরি করে' নেওয়া কেন?

শেষাদ্রি। আইন-অমান্যর যুগ কিনা, জোর করে' খাজনা আদায় করতে সাহস হয় না।

অতসী। তাই নাকি মশাই? এতটা অহিংস হয়েচ কবে থেকে?

[ঘাড়ের একটা ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া]

এটা মনে পড়ে?

শেষাদ্রি। ছেলেবেলায় একবার অকারণ পুলকে তোমার ওখান থেকে খানিকটা মাংস খাম্‌চে নিয়েছিলাম, তারই দাগ না?

অতসী। ছেলেবেলায় তুমি কেমন শান্ত ছিলে আর নারীদের প্রতি কিরূপ শিষ্ট আচরণ করতে এটা তারই নমুনা।

শেষাদ্রি। বটে? ভারি যে বক্তৃতা দিচ্চ! নিজে বুঝি খুব লক্ষ্মীটি ছিলে? তুমিও ত আমাকে সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতে পারতে। তোমার গায়ের জোর কিছু কম ছিল না। দাওনি কেন?

অতসী। কেন দিইনি, তা যদি বুঝতে না পেরে থাকো তো তোমার বুঝেও কাজ নেই।

শেষাদ্রি। কাজ নেই বই কি, গোপনে গোপনে জম্‌চে, ভবিষ্যতে ওই ছোট্ট হাতখানির কতো মার যে এই কপালে আছে তা আমিই জানি! সে-সব সুদে-আসলে বাড়চে।

অতসী। চক্রবৃদ্ধি হারে বুঝি?

শেষাদ্রি। সত্যি অতসী। এই চক্র যেদিন থেকে সুরু হয়েচে সেদিন থেকে এর মধুসঞ্চয়ের আর শেষ নেই।—তাইত ভয় হয়—এই মৌচাক—

অতসী। কী ভয়?

শেষাদ্রি। কখন কাটা পড়ে। এই বিড়ম্বিত পৃথিবীর কোথাও এতটুকু মধুর ভার যেন সয়না। এই যেন নিয়তি।

অতসী। মানুষ পথে চল্‌তে চল্‌তে কতকগুলো হাসি কুড়িয়ে পায়, কিন্তু খানিকবাদেই দ্যাখে তা চোখের জল!

শেষাদ্রি। ঠিক বলেছ। জীবন-পাত্রের সুধা যতই পান করবে ততই তার শূন্যতাটা বেড়ে যাবে—সেই শূন্যতাই তার আসল! সর্বশেষ পাওয়া—সর্বশেষ পাওনা।

অতসী। কিন্তু এখন, যখন পানপাত্র পূর্ণ রয়েছে তখন সে কথা কেন?

শেষাদ্রি। আমার কেবলি মনে হচ্চে আজ হয়ত আমাদের মিলনের দিন নয়—আজই বুঝি আমাদের চিরবিদায় ঘনিয়ে এসেচে —

অতসী। এমন অমঙ্গলে কথা বল্‌চ কেন?

শেষাদ্রি। না, আমি তা বল্‌চিনে। [একটু থামিয়া] মধুচক্র

ছাড়াও আরেক চক্র আছে, তাকে বলে ঘটনাচক্র। কিন্তু সে চক্রান্তের কথাও আমি বল্‌চিনে। আমি বল্‌চি কি, আমার শেষ চিঠিখানা তুমি পেয়েছিলে?

অতসী। পেয়েচি—।

শেষাদ্রি। তাহলে তুমি তৈরি?

অতসী। তৈরি বই কি।

শেষাদ্রি। আজ রাত্রেই—রাত বারোটার ট্রেণে?

অতসী। বেশ।

শেষাদ্রি। শৈলেশ্বরবাবুকে না বলেই যাবে?

অতসী। তা ছাড়া উপায় কি?

শেষাদ্রি। আমাকে বিবাহ করার অপরাধে তোমাকে কি তিনি মার্জনা করবেন?

অতসী। আমার দাদাকে তুমি চেনোনা শেষদা, অত-বড় হৃদয় আর হয় না। আর তিনি ত আমাকে স্বয়ম্বরা হবার হুকুম দিয়েইচেন, তখন রাগ করলে চল্‌বে কেন?

শেষাদ্রি (একটু থামিয়া)।—আচ্ছা, শৈলেশ্বরবাবু কি তোমাকে কিছু বলেন নি?

অতসী। কী বল্‌বেন?

শেষাদ্রি। এই আমার বিষয়ে। আমি কী—এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি কখনো?

অতসী। না। হয়ত বল্‌তে চান্ নি।

শেষাদ্রি। তিনি কিছু জানেন না তাহলে। আমার সন্দেহ ছিল—যাক্। তিনি নাই জানুন, কিন্তু তোমাকে না জানিয়ে আমি পারব না।

অতসী। কী? [চিন্তিত মুখে চাহিয়া]

শেষাদ্রি। আমি, আমি বিপ্লববাদী—

অতসী। বিপ্লববাদী!......... [বিস্ময়ে ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া] ওঃ—তাই দাদা—

শেষাদ্রি। যখন কলেজে ঢুকি তখন থেকেই আমি এই দলের একজন ছিলুম। তারপর তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর বিপ্লব-সাধনাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত করেচি—

অতসী। বিপ্লব-সাধনা!—

শেষাদ্রি। বিয়ের সম্বন্ধ যখন ভেঙে গেল, তোমাকে পাবার আশা যখন রইল না—

অতসী। তখনই বুঝি নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমায় জন্মালো? তোমার এক দিদি ছিলেন না? তিনি কেমন করে তোমাকে এই সর্বনাশের পথে যেতে দিলেন আমি তাই ভাবি। আমি হলে—

শেষাদ্রি। দিদি এর এক বিন্দুও জানেন না। তুমি তো জানো আমি বাড়ী যেতুম খুব কদাচ। বাবা মারা যাবার পর কাকা হলেন কর্তা, তিনি সরকারী চাকুরে—তিনি আমাকে দু'চক্ষে দেখতেন না, আমি ত তাঁকে নয়ই। তারপর শুনেচি দিদির বিয়ে হয়েচে—কিন্তু আমি আর কখনো যাই নি।

অতসী। তোমার আর এই সর্বনেশে দলে থাকা হবে না—তা বলে দিচ্চি।

শেষাদ্রি। পাগল! এ যে আমার রক্তের সঙ্গে মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে—আর কি ছাড়া যায়?

অতসী। কিন্তু শেষদা, এই পথ কোথায় নিয়ে যাবে তা ভেবেচ?

শেষাদ্রি। কারাগারের ভেতর দিয়ে, জানি—কিন্তু সেজন্যে ভাবিনে, বন্ধুর পথেই যার যাত্রা, সেই হতভাগ্যের জীবনসঙ্গিনী হবার আগে, তোমাকে ভাব্তে বলি—

অতসী। আমার ভাববার কিছু নেই, তোমাদের যদি ওই পথ হয় তাহলে আমারও এই বন্ধুর পথেই যাত্রা।

শেষাদ্রি। এই কথাটিই আমি তোমার কাছে শুনতে চাইছিলুম

অতসী। আমি তোমাকে আমার জন্য নয়, আমার দলের জন্যই পেতে চাইছি। আমার দেশের জন্যই তোমাকে আমার দরকার—

(অনিন্দ্য প্রবেশ করিল)

অনিন্দ্য। দিদি!

অতসী। এই যে অনিন্দ্য! দাদা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির—

শেষাদ্রি। এ কে? একে তো কখনো দেখিনি। তোমার ভাই নাকি?

অতসী। না, আমি ওর মাসি-মা, দিদি এটিকে রেখে স্বর্গে গেছেন—তিনি আমাকে সর্বদা দিদি দিদি করতেন—শুনে শুনে ছোটোবেলা থেকে ওরও তাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

শেষাদ্রি। তা মন্দ কি! তোমাকে দিদি বলার প্রলোভন আমারও কম ছিল না, কিন্তু সে লোভ আমি অতিকষ্টে দমন করেচি!

(জানালা পথে চাহিয়া)

বিকাশ আসচে। তার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে। যাই এখন? কেমন? (বাহিরে গেল)

অতসী। সন্ধ্যের গাড়ী তো কখন্ এসেছে—তোর এত দেরি হোলো যে?

অনিন্দ্য। আমি তো কখন্ আসতাম—ষ্টেশন থেকে বেরুচ্চি একটি মেয়ে আমাকে ডাকলেন যে—

অতসী। একটি মেয়ে?

অনিন্দ্য। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো এখানকারই ছেলে। হোস্‌টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শৈলেশ্বরবাবু বড়দিনের ছুটিতে এখানেই আছেন কিনা বলতে পারবে নিশ্চয়।

অতসী। দাদার কথা জিজ্ঞেস করলেন? কত বড় মেয়ে?

অনিন্দ্য। তোমার চেয়েও বড়ো! আমি বল্লাম—তিনিই যে আমার কাকা। তখন আমাকে কত আদর করলেন, খাবার খেতে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ওয়েটিং রুমে বসে বসে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। আমি আসবার সময় বলে দিলেন, আবার দেখা হবে।

অতসী। তিনি কি তোমার সঙ্গেই গাড়ী থেকে নাম্‌লেন?

অনিন্দ্য। নামতে ত দেখিনি, কিন্তু আমার সঙ্গে আবার কি করে দেখা হবে দিদি?

অতসী। হয়তো এখানে আসবেন।

অনিন্দ্য। এখানে? তাহলে ভারি চমৎকার হয় দিদি—

(শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন)

শৈলেশ্বর। এই যে এখানে। ওর জন্যে ষ্টেশনের কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি।

অতসী। এই তো এলো।

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্য, সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরেচিস্ তো এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?

অতসী। ওয়েটিং-রুমে একটি মহিলা ওকে আট্‌কে রেখেছিলেন। বোধ হচ্ছে নমিতা দিদি—

শৈলেশ্বর। (সাগ্রহে) নমিতা ? নমিতাও এসেচেন নাকি ?

অতসী। না আসেন নি। যদি তিনিই হন তবে নিশ্চয় আস্‌বেন।

শৈলেশ্বর। ওঃ, যদি তিনিই হন—! অনিন্দ্য, দেখি ডাক্তার কি রিপোর্ট দিলেন ?

অনিন্দ্য। ডাক্তার বল্লেন আমি ভালোই আছি কাকা। আর বল্লেন, রিপোর্ট আমাদের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন।

শৈলেশ্বর। তাই নাকি ? তবে ত ডাক্তারের কাছে যেতে হোলো।

অতসী। একটু বোসোই না দাদা, একটু জিরোও। এই ত এতটা খোঁজা-খুজি করে হয়রাণ হয়ে ফিরলে। রিপোর্ট নিশ্চয়ই ভালো, নইলে ডাক্তারবাবু কি নিজেই আস্‌তেন না ?-- কিম্বা হয়তো রিপোর্ট এখনো এসে পৌছয়নি—

অনিন্দ্য। কাকাবাবু, আমি তো ভালো হয়ে গেছি, এবার আমি যত-খুসি বাইরে বেড়াব তো ?

অতসী। না, বাইরে যেয়োনা। হিম পড়চে।

অনিন্দ্য। কিন্তু চাঁদের আলোও যে পড়চে দিদি—

(অসহায় উৎসুক দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিল)

অতসী। খেয়ে দেয়ে ঘুমুবি চ।

অনিন্দ্য। বারে, আজ যে আমি ভালো হয়ে গেছি। আজ আবার ঘুমুব কেন? আজ সমস্ত রাত গল্প করব। কাকাবাবু, ঘুমোতে আমার ভয় করে—যদি আর না জাগি? স্বপ্নের ভেতর কারা আমায় যেন ভয় দেখায়, আমি কাকাবাবু কাকাবাবু বলে প্রাণপণে চেঁচাই, কিন্তু তুমি পাশে থেকেও যেন শুনতে পাও না।

শৈলেশ্বর। কই, আমি তো কোনদিন শুনিনি,—ভয় কিসের অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। কিসের তা জানিনে, কিন্তু ভয় একটা আছেই।

অতসী। অনি, আজ তোর বিকাশদার কাছে পড়বিনে?

অনিন্দ্য। আজ? আজ আমার ছুটি! আচ্ছা কাকাবাবু আমাকে একটা করাৎ কিনে দেবে, আমি কাঠ চিরবো?

অতসী। কাঠ চিরবি!

অনিন্দ্য। পড়ার চেয়ে সে ঢের ভালো। না কাকাবাবু? নেপোলিয়নকে জানো দিদি? সে ছোট-বেলায় কাঠ চিরত, তার বাবা কাঠের মিস্ত্রি ছিল কিনা—

শৈলেশ্বর। কে বল্লে তোকে?

অনিন্দ্য। বিকাশদা। নেপোলিয়ন পৃথিবী জয় করেছিল, আমিও যদি কাঠুরের ছেলে হতুম আমিও করতুম।—

শৈলেশ্বর। কিন্তু নেপোলিয়নের বাবা তো কাঠের মিস্ত্রি ছিলেন না।

অনিন্দ্য। হ্যাঁ ছিলেন, তুমি জানো না। কাকাবাবু, আমার কী ইচ্ছা করে বলবো?

শৈলেশ্বর। কী ইচ্ছা করে অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। ইচ্ছে করে আমাদের সেই পুলের ধারে চলে যাই, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করি। আমাকে একটা টুপি কিনে দেবে কাকাবাবু?

শৈলেশ্বর। তোমাকে সোনার মুকুট কিনে দেব অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। না, না, মুকুট নয়, টুপি—ভিক্ষের টুপি—

শৈলেশ্বর। ভিক্ষের টুপি কেন বাবা?

অনিন্দ্য। সেই টুপি পেতে ভিক্ষে চাইব। সে বেশ হবে, নয় কাকা? মুসোলিণীকে চেন তুমি? সে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে টুপি হাতে ভিক্ষে করত, সেই ত আজ ইটালিকে চালাচ্ছে।

শৈলেশ্বর (হাসিয়া)। বিকাশবাবু তোকে বুঝি এই সব পড়ান?

অনিন্দ্য। বিকাশদা বলে আমিও ইচ্ছে করলে পৃথিবী জয় করতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে। কিন্তু—আমার জীবন যে কারুর সঙ্গেই মিল্‌চেনা। [আগ্রহভরে] আচ্ছা কাকা, তুমি কি আমাকে পথের ধারে আবর্জনার মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

[শৈলেশ্বরকে মাথা নাড়িতে দেখিয়া তাহার মুখের আলো নিবিয়া গেল]

কিন্তু যদি পেতে তো বেশ হোতো। জ্যাকি কুগানকে তারা এমনি পেয়েছিল। তাইত সে আজ পৃথিবী জয় করেচে—

[বিকাশ প্রবেশ করিল]

এইযে বিকাশদাদা। করেনি? কাকাবাবুকে বলো তো।

শৈলেশ্বর। তোমার ছাত্র হে এরই মধ্যে বিশ্বজয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে বিকাশ?

[স্নেহভরে হাসিলেন]

[বিকাশ কিছু না বুঝিতে পারিয়া নির্বাক চাহিয়া রহিল]

অনিন্দ্য। আমি কি কেবল পৃথিবীকে জয় করতে চাইচি, আমি যে তার কাছে ভিক্ষেও চইচি—

বিকাশ। কী ভিক্ষে চাইচ অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। এমন একটা জীবন, যে খুসি হলে ভিক্ষেও করতে পারে, আবার খুসি হলে রাজ্যও চালাতে পারে—যার রোদে জলে হিমে ঠাণ্ডায় কোনো বারণ নেই; যেখানে খুসি যখন খুসি চলে যেতে পারে—সেই অনেক দূরের দেশে—এমন একটা জীবন, বিকাশদা।

শৈলেশ্বর (ম্লানমুখে)। তোমার কি কেবলি কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে অনিন্দ্য, এখানে আমাদের কাছে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না?

অনিন্দ্য (সোৎসাহে)। না কাকা! আমার কেবলি ইচ্ছে করে সেই সদর রাস্তার পুলের কাছে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করি। আমাকে যেতে দেবে কাকা?

[শৈলেশ্বর বিষণ্ণ মৌন মুখে নিরুত্তর রহিলেন]

অতসী। ছিঃ, তুমি ভিখিরি হতে যাবে কেন ভাই? ভিখিরিরা কেবল চাকার নিচে পড়ে—আজো একটা পড়েচে।

অনিন্দ্য। কে বল্লে? তবে সেই যে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করত সে তবে ওপরে উঠ্‌ল কি করে?...

[সকলের নিরুত্তর স্তব্ধতা ভাঙিয়া]

বিকাশদা, আজ আমাকে সেই গল্পটা বল্‌বে?

বিকাশ। কি গল্প অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। সেই যে ইন্দ্রজিৎ চাঁদের আলোয় জেলে ডিঙি চ
নদীতে মাছ ধরতে যেত—

বিকাশ। ইন্দ্রিজিৎ যে আজ মেঘের মধ্যে লুকিয়েচে ভাই।

অনিন্দ্য। মেঘের মধ্যে? সেখানে গেল কেন?

বিকাশ। মেঘটাও যে একটা নদী অনিন্দ্য, আকাশের ওপরে
উত্তাল ঢেউ,—

অনিন্দ্য। কিন্তু সেখানে কি মাছ আছে?

বিকাশ (অতসীর দিকে চাহিয়া)। তা যদি না থাকবে ভাই, তবে অর্জুন কি করে মেঘলোকে মাছের চোখ বিঁধে পাঞ্চালীকে পেয়েছিলো বলো দেখি?

অনিন্দ্য (মাথা নাড়িয়া)। হুঁ, তবে আছে। কিন্তু আমার কেবলি মনে হয় আমি যদি সেই ছোট্ট শ্রীকান্ত হতুম তাহলে রোজ ইন্দ্রজিতের সঙ্গে—। সে কী মজাই হোতো—না, বিকাশদা! কাকা, তুমি সেই গল্পটা পড়েচ?

শৈলেশ্বর। না অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। বিকাশদার কাছে আছে, আমি আন্‌চি—

[বিকাশকে টানিয়া ছাত্রমহলের ভিতরে লইয়া গেল।

শৈলশ্বরকে ভাবিত দেখা গেল।]

অতসী। কি ভাবচ দাদা? নমিতাদির কথা? ষ্টেশানের সেই মেয়েটি যদি তিনি হন তবে ত—

শৈলেশ্বর। না, অতসী, তাঁর কথা ভাবচিনে। ভাবচি যে অনিন্দ্য—

অতসী। অনিন্দ্যই তোমার চোখের মণি দাদা,—

শৈলেশ্বর। ঠিক বলেচিস্ দিদি, ওকে ছাড়া আমি দেখতে পাই না, ওরই ভেতর দিয়ে আমি জগৎটাকে দেখি—আমাকে দেখতে পাই!

অতসী। ওতো তোমার চোখে চোখেই আছে দাদা!

শৈলেশ্বর। জানিস্ অতসী, ওরই মধ্যে আমি বাঁচতে চাই, সার্থক হতে চাই, পরিপূর্ণ হতে চাই। ওই শিশুই আমার স্বর্গ, আমার ধর্ম, আমার তপস্যা। কিন্তু ও কেবলি চলে যেতে চায়। ও যেন কোন্ বনের পাখী, ওর বাসা যেন অনেক দূরে—সেইখানেই সারাক্ষণ ওর মনপ্রাণ পড়ে রয়েচে।

অতসী। কেন দাদা, অনিন্দ্য তো তোমাকে ভালোবাসে—

শৈলেশ্বর। বাসে বটে; কিন্তু ওর ভালোবাসাই পেয়েচি, ওকেতো পাইনি। অতসী, শুনেচ ও পৃথিবীর কাছে ভিক্ষে চায়—কিন্তু যা চায় তা বোধ করি সারা পৃথিবীরও ওকে দেবার সাধ্য নেই।

অতসী। একটা জীবন—। জীবনের মত একটা জীবন!

শৈলেশ্বর। ও যেন কেমন করে' বুঝতে পেরেচে ও আর বেঁচে নেই—

অতসী। বেঁচে নেই?

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ; তাই ও ফিরে আবার কাঠুরের ছেলে হয়ে জন্মাতে চায়, সুস্থ সবল দেহে বাধাহীনতার ঐশ্বর্য নিয়ে। আমি সত্যি বল্‌চি অতসী, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাঠুরের ছেলে হয়ে—আবর্জনার গাদায় জন্মালে ও ঠিক বিশ্বজয় করত—

অতসী। কেন দাদা, কেন ভাবচ যে ও ভালো হয়ে উঠবে না?

শৈলেশ্বর। ওর বাবা যে কাঠুরে ছিলেন না ভাই।

অতসী। তিনি সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তোমার মেসোর অগাধ সম্পত্তি সমস্তইত তিনি উড়িয়ে যেতে পারেননি, ফেলে ছড়িয়েও যা রেখে গেছেন তাও লক্ষ টাকার কম হবে না,—অনিন্দ্যই ত বড় হলে পাবে। এমন ভাগ্য কয়জনের হয় দাদা—

শৈলেশ্বর। হাঁ, সাবালক হলে একটা পৈতৃক সম্পত্তি পাবে বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্চে তার আগেই আরেকটা হয়ত পেয়ে বসেছে—

অতসী। সে কি দাদা?

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্যর বাবা মারা গেছলেন কিসে জানিস দিদি? যক্ষ্মায়।

অতসী। য়্যাঁ?

শৈলেশ্বর। আমার সম্ভ্রান্ত মাসতুতো ভাই সেই স্বোপার্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন এই শিশুকে, দিয়ে গেছেন কেবল লাখটাকা নয়, লাখ লাখটাকা দামের জীবন্ত মৃত্যু?

অতসী। জীবন্ত মৃত্যু?

শৈলেশ্বর। তিনি ধনী ছিলেন বলেই লাখ লাখ টাকা খরচ করে এই জীবন্ত মৃত্যু কিনতে পেরেছিলেন, কাঠুরে হলে পারতেন না —অনিন্দ্য বনেদীবংশের ছেলে,—আর বনেদী ঘরের সমস্ত চাল তার বাবা নিখুঁতভাবে পালন করতেন,—বিলাস ব্যসনের কোনো ব্যতি-ক্রম কোনোদিন করেননি—

অতসী। দিদি কিছুই জানতে দিতেন না, এখন বুঝতে পারচি কেন তিনি অমন করে আপনাকে নিঃশেষ করেছিলেন—

শৈলেশ্বর। দুর্ভাবনায় তোমার দিদির মাথা খারাপ হয়ে গেছল,

আত্মহত্যা ক'রে সমাপ্তির রেখা টানতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উঁচু বংশের বিরাট চাকা তো তাঁকে পিষেই থামলনা—তা চলে গেল আরো একটা কচি বুকের ওপর দিয়ে।

অতসী। তবে কি অনিন্দ্যকে আমরা ফিরে পাবনা?

শৈলেশ্বর। ফিরিয়ে আনবার জন্য ত প্রাণপণ লড়চি দিদি কিন্তু পরবো কি? সব স্বাস্থ্যকর জায়গাতেই ওর হাওয়া বদ্‌লানো হয়েছে কিন্তু কই—ওকে ত স্বচ্ছন্দ করতে পারছিনে—

অতসী। কলকাতার ডাক্তার তো পরীক্ষা করে বলেচেন কোনো অসুখ নেই—? অনিন্দ্য বল্ল না?

শৈলেশ্বর। কিন্তু আমাদের ডাক্তার এখনো এলেন না কেন?

[অনিন্দ্য একখানা বই হাতে ফিরিয়া আসিল।

অনিন্দ্য। কাকাবাবু, এই বই। বিকাশদা আমাকে একেবারে দিয়ে দিলেন—বড়দিনের উপহার। আচ্ছা কাকা, এর পর থেকে দিন নাকি বড় হবে?

শৈলেশ্বর। সেই দিনেরই ত প্রতীক্ষায় আছি বাবা। সেই বড় দিনের।

অনিন্দ্য। হলে আমায় দেখিয়ো কিন্তু। এটা তুমি পড়বে কাকা?

শৈলেশ্বর। তুমি পড়ে আমায় গল্প বোলো, সেই আমার শুন্‌তে ভালো লাগে।

অনিন্দ্য। আচ্ছা আমি তাহলে এখন পড়িগে—

[অন্দর মহলের ভিতরে গেল।

অতসী। খাইয়ে শুইয়ে দিগে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে।

[অনিন্দ্যর অনুসরণ করিল।

[শৈলেশ্বর ভাবনায় ডুবিয়া গেছেন, নমিতা সদর পথে নিঃশব্দে ঢুকিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

নমিতা। শৈলেশ!

শৈলেশ্বর (চমকিত হইয়া)। কে ?···নমিতা ? নমিতা তুমি ?

নমিতা। হাঁ। এতদিনে আমি এলাম—

শৈলেশ্বর (দ্বিধাভরে)। এসোচো, আমি আনন্দিত, কিন্তু নমিতা, না এলেই যেন—

নমিতা। ভালো হোতো ? কিন্তু ভালোই সব সময়ে সত্য হয় না শৈলেশ।

শৈলেশ্বর। কিঙ্করও এসেচেন ত ? তিনি কোথায় ?

নমিতা। কোথায় এক স্বদেশী ডাকাত ধরতে বেরিয়েচেন, তিনি জানেন না যে আমি এখানে। তাঁর যাবার পর আমি—

শৈলেশ্বর। ভালো করনি, নমিতা কিঙ্কর তো জানবেন।

নমিতা। জান্‌বেন বইকি শৈলেশ। বাড়ী ফিরেই জান্‌বেন। আমি চিঠিতে সব লিখে রেখে এসেচি। কেবল কোথায় গেলাম এই টুকুই জানাইনি, পাছে নিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে আসেন—

শৈলেশ্বর। তুমি কী সর্বনাশ করে এসেচো নমিতা, আমি কিছুই বুঝতে পারচিনা—। তুমি কি, তুমি কি—?

নমিতা। আমি গৃহত্যাগ করে এসেচি।

শৈলেশ্বর। গৃহত্যাগ !—

নমিতা। গৃহ নয়, আমার কারাগার থেকে আমি জন্মের মত মুক্ত হয়ে এসেচি।

শৈলেশ্বর। কিন্তু এসেচ, এসেচ—কোথায়?

নমিতা। তোমার কাছে শৈলেশ।

শৈলেশ্বর। আমার কাছে। আমি চিরকুমার থাক্‌ব আমার এ সংকল্প তুমি জানো, কিন্তু তাও যদি বিসর্জন দিই, তবু, তুমি যে সধবা—তোমার তো আর দুবার বিয়ে হতে পারে না।

নমিতা। হলেও সেটা মিথ্যে, এইত? এই সত্য আমি স্বীকার করেচি বলেই ত এমন করে আস্‌তে পেরেচি,—তুমিও যদি অসংশয়ে জেনে থাক যে—

শৈলেশ্বর। তুমি কি পাগল হলে নমিতা?

নমিতা। তোমার সঙ্গে আমার যে পরিণয় হয়েছিল সেইটেই সত্য, তারপরে বিবাহের নামে যে আনুষ্ঠানিক অভিনয় হয়েচে তা তো আর সত্য হতে পারে না? হিন্দু নারীর নাকি একবারই বিয়ে হয়—

শৈলেশ্বর। নমিতা।

নমিতা। চারিপাশে সংস্কারের জাল বুনে ব্যর্থতার মাঝে আপনাকে বন্দী করে' নিষ্ফল আত্মপ্রসাদে মুগ্ধ রয়েচ, আমি এসেচি তোমাকে সেই মিথ্যার গণ্ডী থেকে মুক্ত করতে—।

শৈলেশ্বর। কিন্তু কোথায় মুক্ত করবে? সেও ত আরেক মিথ্যার মধ্যে?

নমিতা।—আরেক মিথ্যার মধ্যে?

শৈলেশ্বর। কেন, তুমি তো জানো তোমাকে কতবার বলেচি

আমি আরেকটি নারীকে ভালোবাসি,—আর আমার জীবনে সেইটেই সবচেয়ে বড় সত্য।

নবিতা। সব চেয়ে বড় হতে পারে, কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। সেই অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি আমার আর কিছুমাত্র ঈর্ষা নেই। কিন্তু শৈলেশ, আমাকেও যে তুমি ভালোবেসেছিলে এ সত্যই কি আজ তুমি অস্বীকার করতে পারো?

শৈলেশ্বর। করতে চাইনে ত। মনেই তোমার আসন রইল, ঘরে তোমার আসন রচনা হবার তো নয়, নমিতা।

নমিতা। কেন নয়? এই ধারণাটাই তো তোমার ভুল শৈলেশ। যা সত্য তা ঘরে বাহিরে সমান সত্য—দেহে মনে সর্বত্রই তো তাকে স্বীকার করতে হবে?

শৈলেশ্বর। কিন্তু সত্য বস্তুটি এত বিচিত্র, তাকে এতদিক দিয়ে দেখ্‌তে হয় আর দেখতে গেলেই তার এত বিভিন্ন ও বিরোধী রূপ ধরা পড়ে যে তাকে আর কিছুতেই সত্য বলা চলে না। কিন্তু সে তর্ক এখন থাক্ না নমিতা, তুমিও শ্রান্ত হয়ে এসেচ, আর আজই তো—চলে যাচ্চনা, কাল না হয় সে কথা হবে—

[দরজার বাহিরে কাহার করাঘাত হইল।

কে? বোধহয় ডাক্তার! (ব্যস্ত হইয়া) নমিতা, তুমি ভেতরে যাও, অতসী আছে—

নমিতা। অতসী? যার সঙ্গে অনেকদিন বেথুনবোর্ডিংএ ছিলাম, সেই অতসী?

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ। ও আমার দাদার শালী। দাদা ও বৌদি মারা যাবার পর থেকে আমার কাছেই আছে।

নমিতা। তাই নাকি? অতসী এখানে তাতো জানতুম না।

[অন্দর্ মহলের ভিতরে গেল। শৈলেশ্বর দ্বার খুলিয়া দিতে শেষাদ্রি প্রবেশ করিল।

শৈলেশ্বর। একি? শেষাদ্রি যে! অতসী তোমার আসার কথা আমাকে বল্‌ছিলেন বটে।

শেষাদ্রি। তাঁকে আমার একটু দরকার—

শৈলেশ্বর। তার আগে তোমাকে আমার দরকার। তাছাড়া, অতসী এই মূহূর্তে একটু ব্যস্ত আছেন, তাঁর এক বাল্যসখী এইমাত্র এসেচেন— [শেষাদ্রি কোন জবাব দিলনা। ……তোমার একখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

শেষাদ্রি (বিস্মিত)। আমার চিঠি?

শৈলেশ্বর। এখান থেকে তুমি চলে গেলে পর এখানা এসেছিল। তোমার ঠিকানা জান্‌তুম না বলে পাঠানো হয়নি—

[ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শেয়াদ্রি খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানা পড়িল।

শেষাদ্রি। এটা আপনি খুলে পড়েননি আশা করি? এমন অসঙ্গত প্রশ্ন করার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু করতেও বাধ্য হচ্ছি।

শৈলেশ্বর। না, এ চিঠি আমি পড়িনি। তুমি যখন বোর্ডার নও তখন তোমার চিঠি পড়ার আমার অধিকার রইল না। কিন্তু অনুমান করি, যে চিঠিখানা তুমি আমার কাছে কেড়ে নিয়েছিলে এটাও সেখান থেকেই আসচে?

শেষাদ্রি। এটা যে পড়েনি সেজন্য ধন্যবাদ। এটাতে গুরুতর কথা ছিল—

শৈলেশ্বর। থাকাই সম্ভব। কেননা এর আগেরখানাতেও যে কথা ছিল তাও নিতান্ত লঘু বলা চলে না।

শেষাদ্রি (চকিত হইয়া)। সে চিঠিখানা কি—?

শৈলেশ্বর। তোমার কেড়ে নেয়ার আগেই আমার পড়া হয়ে গেছল। ভয় পেয়োনা, আমার থেকে তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নেই—

শেষাদ্রি। না, ভয় আমরা করিনে। আমারও সন্দেহ ছিল চিঠিখানা আপনি পড়েচেন। কিন্তু ভয় ছাড়াও অন্য কথা আছে—

শৈলেশ্বর। সেই অন্য কথাটা সম্পর্কেই তোমাকে কিছু বলতে চাই।—

শেষাদ্রি। কি বলুন।

শৈলেশ্বর। যে পথ তোমরা অনুসরণ করচ, আমার মনে হয় মানুষের মুক্তির দিকে সে পথ যায়নি—[শেষাদ্রিকে থামাইয়া] প্রতিবাদ কোরোনা, নিজেই ভেবে ছাখ। সেই চিঠিখানাতে কী লেখা ছিল বোধ করি ভুলে যাওনি, তাতে—

শেষাদ্রি। ডাকাতি করার কথা ছিল।

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ, এবং পাশের মহিমবাবুর বাড়ীতেই। মহিম অমার বন্ধু, এবং তোমাকে আমি স্নেহ করতুম—সেইজন্যই তোমাকে এক্স্‌পেল্‌ করতে হোলো। তোমাকে এবং মহিমবাবুকেও বাঁচাবার জন্যই।

শেষাদ্রি। আমাকে বাঁচাবার সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সকলের মুক্তির জন্য জনকতকে আত্মবলি দিতেই হবে, চিরকালই দিতে হয়েচে, এ কথাও আমি জানি।

শৈলেশ্বর। জনকত আত্মদান করলেই সকলের আত্মলাভ হয় না, তাছাড়া এই ডাকাতি করাটা—

শেষাদ্রি। তাও দরকার—বিপ্লবের জন্যই, অভ্যুত্থানের জন্যই।

শৈলেশ্বর। ঝড়ের বিপ্লব ইতিহাসে অনেক হয়েচে, তাতে জঞ্জাল দূর হয়নি, এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়েচে মাত্র। (একটু থামিয়া) জানো শেষাদ্রি, চাই আলোর বিপ্লব—গান্ধিজীর সত্যগ্রহই সেই পথ।

শেষাদ্রি। কিন্তু তাতে কি দেশ স্বাধীন হবে?

শৈলেশ্বর। মানুষ স্বাধীন হবে?

শেষাদ্রি। আমাদের দেশের মানুষ?

শৈলেশ্বর। সব দেশের সমস্ত মানুষ—সব রকমের বন্ধন থেকে। পৃথিবীর সব অধিবাসীর মুক্তি একসঙ্গে অপেক্ষা করচে—অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সবার—কিন্তু সেই দিনটির ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি।

[বিকাশ ছাত্রমহল হইতে প্রবেশ করিল।

বিকাশ। শেষাদ্রি—! (শৈলেশকে দেখিয়া) আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলুম বোধহয়!

(ফিরিয়া যাইতেছিল—

শৈলেশ্বর। না, এমন কিছু আলোচনা নয়। কতকগুলো সহজ, সরল ও সত্য কথা। (শেষাদ্রিকে) আমার মনে হয়, এখনো ভুল পথে এতদূর গিয়ে পড়োনি যে ফেরাটাও তোমার ভুল মনে হবে। কথাগুলো ভেবে দেখো—

শেষাদ্রি। দেখ্‌ব বইকি মশাই—

শৈলেশ্বর। আমাকে এখনি ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে। (ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন) বোধহয় দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমি আসি—(বাহির হইয়া গেলেন।

বিকাশ। উনি তোমাকে ভুল পথের বিষয়ে সতর্ক করে গেলেন বুঝি? কিন্তু পথেব সব খবর তো তিনি রাখেন না। যে পথের ধারে ফুল ফোটে তা ফুলের পথও তো হতে পারে, একেবারেই ভুলের পথ হয়তো নয়।

শেষাদ্রি। কিন্তু কাঁটার পথ তো বটেই?

বিকাশ। ফুলকে মর্মান্তিক মিষ্টি করে' তোলে কী জানো? তার রঙ, নয়, গন্ধ নয়, পাপড়ি নয়, সে ঐ কাঁটা। শেষাদ্রি, আমি বুঝতে পেরেচি তৃতীয় ব্যক্তি কে তোমার সঙ্গে আজ যাচ্চেন।

শেষাদ্রি। কে?

বিকাশ। অতসী……এই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেচ বলে তোমায়কে অভিনন্দিত করি।

শেষাদ্রি। কিন্তু তোমার মুখের ভাব তো অভিনন্দনের মতো লাগচেনা, যেন তোমারই বক্ষভেদ করেচি—বলে মনে হচ্চে।

বিকাশ। হয়ত করেচ।

শেষাদ্রি। বল কি? তুমিও অতসীকে—?

(উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ছাত্রমহলের ভিতরে গেল।)

অন্দরমহল হইতে নমিতা ও অতসী প্রবেশ করিল)

[নমিতা এবং অতসী প্রবেশ করিল]

অতসী। না, নমিতাদি। অইনের চক্ষে—তোমার এ কাজ উচিত হবে না। আর ন্যায়-অন্যারের প্রশ্ন নিয়েই তো আইন!

নমিতা। হাঁ, এই আইনের নমুনা আজ যেমন একটা চোখে পড়ল, ট্রেনে আস্‌তে আস্‌তেই।

অতসী। কি দিদি?

নমিতা। একটা মুসলমান মেয়ে—পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, সঙ্গে কেবল এক বছর-পাঁচেকের ছেলে, দিব্যি ছেলেটি!—বরাবর এক কামরায় আসচি, মাঝে এক ষ্টেশনে দেখি একজন মুসলমান ভদ্রলোক —হ্যাঁ, ভদ্রলোকের মতই পোষাক পরিচ্ছদ—দারোগা পুলিস সঙ্গে নিয়ে এসে মেয়েটির কাছ থেকে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অতসী। সে কি?

নমিতা। শুন্‌লুম তিনিই ছেলেটির বাবা। কিন্তু মেয়েটির সে কী কান্না! ছেলেও তাকে ছাড়তে চায়না—দুজনে দুজনকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেচে, কিন্তু পুলিশ শুন্‌বে কেন, আইনের কর্তা তারা, মেয়েটির বুক থেকে ছেলেটাকে অকাতরে ছিঁড়ে নিল। আমি জিজ্ঞেস্ করলুম, ব্যাপার কি? ইন্‌স্‌পেক্‌টার বল্লে—ছেলেটাকে চুরি করে পালাচ্ছিল। জান্‌তে চাইলুম, কে মেয়েটা—শুনলুম, ছেলের মা।

অতসী। ছেলের মা? মা নিজের ছেলে চুরি করে পালাচ্চে এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

নমিতা। এমনি অদ্ভুত ব্যাপারেই ত তোমাদের সমাজ আর সংসার আর তোমাদের আইনের পুঁথি বোঝাই। ছেলেটার বাবা

তার মাকে তালাক্ দিয়েচে, তাই তোমাদের আইন বল্‌চে—ছেলেটা যার খেয়ালের সৃষ্টি, হোলো তারই,—আর যার রক্ত-মাংসের—তার নয়। এবিষয়ে মুসলমান ও হিন্দু আইনের একই ধারা।

অতসী। এই দুর্ভাগা দেশে মনুর সত্ত্ব যে মনুষ্যত্বর চেয়ে বড় দিদি!

নমিতা। আহা, চাঁদের টুক্‌রোর মতই সেই ছোট্ট ছেলেটি! ঐ ক'ঘণ্টায় আমারই মায়া প'ড়ে গেছল। যার মার কোল ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার কী হচ্ছে তা বিধাতাই জানেন!

অতসী। পরের ছেলের মায়া ভুলতে পারচোনা দিদি, যখন নিজের হবে তখন বুঝবে নিজেরটি আরো কত মিষ্টি। ভগবানের কাছে কামনা করি, শীঘ্রই তোমারি ঘর আলো করে কোলজোড়া মাণিক আসুক।

নমিতা। এসেছিল বোন্—এসেছিল তারা, দুটি ফুলের মত শিশু—কিন্তু হতভাগীর কোলে তারা বেশিদিন রইল না—যাঁর কোল থেকে এসেছিল তাঁর কোলেই ফিরে গেল—

অতসী। য়্যাঁ?········· [স্তব্ধতা

নমিতা। তারা চলে গেছে এ বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তারা বেঁচে থাকলে সে দুঃখ আরো কী ভয়ানক হত, তা ভাবা যায় না। নির্দোষ তারা, সারাজীবন ধরে আরেকজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চল্‌ত!

অতসী। (নিতান্ত বিস্ময়ে)। তুমি কি বলচ নমিতাদি?—

নমিতা। আরেকদিন বলব বোন্, তার ইতিহাস আরেকদিন।

(আপনাকে সামলাইয়া লইল। অনিন্দ্যর মহা উৎসাহে প্রবেশ।)

অনিন্দ্য। দিদি, আমি পড়ে দেখ্‌লুম, ইন্দ্রনাথ তো কই মেঘের মধ্যে লুকোয় নি, তেমনি জেলে ডিঙ্গি করে' মাছ শিকারে বেরিয়েচে—

অতসী। দ্যাখ, কে এসেচেন, অনিন্দ্য। চেয়ে ছাখ্‌।

অনিন্দ্য (দেখিয়া)। ও আপনি! দিদি, এঁর সঙ্গেইত ইষ্টিশনে দেখা। (নমিতাকে) বলেছিলেন বলে আমায় সঙ্গে দেখা করতে এলেন বুঝি? দিদি বল্‌ছিল আপনি নিশ্চয় আস্‌বেন।

অতসী। তুই নমিতাদির সঙ্গে ততক্ষণ গল্প কর্‌, আমি একটা কাজ সেরে আসি। কেমন?

[অন্দর মহলের ভিতরে গেল।

অনিন্দ্য। আচ্ছা নমিতাদি, আপনি কি করে জান্‌লেন এই বাড়ীতে আমি থাকি?

নমিতা। আমাকে 'আপনি আপনি' করতে পাবে না, দিদির মতো আমাকেও 'তুমি' বল্‌তে হবে।

আনিন্দ্য। 'তুমি' বল্‌ব? কেন নমিতাদি?

নমিতা। আপনার হতে চাই কিনা, তাই 'আপনি' হতে চাই না। আর কে আমাকে বাড়ী চিনিয়ে দিল বল্‌চ? কেন, চাঁদের আলো। চাঁদের আলো তুমি ভালবাসো বল্‌ছিলে, চাঁদ তোমার বন্ধু,—সেই তোমার বাসা আমায় বলে দিলে।

অনিন্দ্য (অর্দ্ধেক বিশ্বাসে)। সত্যি নমিতাদি? কিন্তু আমি তো কোনদিন চাঁদের আলো-কে কথা বল্‌তে শুনিনি। হ্যাঁ, শুনিচি, বোধহয় শুনিচি,—কোন কোনদিন কানে শোনা যায় কিন্তু সেকথার মানে বোঝা যায় না—

নমিতা। (জানালার বাহিরে চাহিয়া)। চাঁদের আলোয় পৃথিবীটা ভেসে যাচ্চে, দেখ্‌চ মাণিক?

অনিন্দ্য (লুব্ধ চক্ষে)। ও আমাকে ডাক্‌চে। আমার বড্ড মন কেমন করচে। আচ্ছা নমিতাদি, সেদেশেও চাঁদের আলো পড়ে?

নমিতা। কোন্ দেশে যাদু?

অনিন্দ্য। সেই যে দেশে তুমি একবার বেড়াতে গেছলে আজ বিকেলে গল্প বল্‌লে—যেখানে ট্রেনে যেতে যেতে পায়ের নিচে রামধনু দেখা যায়, আর জান্‌লা খোলা পেলে ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে পড়ে আর ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি হয়—সেই দেশে? আছে সেখানে চাঁদের আলো?

নমিতা। আছে বইকি মাণিক! আকাশেও আছে, আবার তোমার মত ছোট্ট ছোট্ট ছেলের মুখেও আছে—

অনিন্দ্য। সত্যি? আমার সে দেশে যেতে বড় ইচ্ছা করচে। কোথায় সে দেশ নমিতাদি?

নমিতা। এই তো কাছেই। দার্জিলিঙেই তো!

অনিন্দ্য। দার্জিলিঙ্? সেখানে বুঝি দার্জিলিঙ্ মেল্-এ চেপে যেতে হয়?—

নমিতা। হ্যাঁ, অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। তবে ত বেশ হয়েচে। দার্জিলিঙ্ মেল্ যে আমাদের ষ্টেশন দিয়েই যায়। কেবল এক মিনিটের জন্যে দাঁড়ায়। কত দুপুর রাতে তার বাঁশী শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে—আচ্ছা নমিতাদি, আবার তুমি দার্জিলিঙ্ যাবে?

নমিতা। যাব বই কি, খোকন্।

অনিন্দ্য। আমিও যাব তোমার সঙ্গে, আমাকে নিয়ে যাবে?

নমিতা। কাকাবাবু ছাড়বেন তোমায়?

অনিন্দ্য (কিছুক্ষণ ভাবিয়া মাথা নাড়িল)। না, তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাবো। সে দেশে ত আর ঠাণ্ডা নেই, তবে সেখানে গেলে কেনই বা কাকা রাগ করবেন? আমি সেখানে গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব দিদিকে—কাকাকে নিয়ে চলে এসো চট্‌পট্‌। সে বেশ হবে।...আজই কেন চলো না নমিতাদি?

নমিতা। আজকেই? আচ্ছা তাই, কিন্তু তুমি আমাকে নমিতাদি বল্‌তে পাবে না তাহলে।

অনিন্দ্য। তবে কী বল্‌ব?

নমিতা। কেন, মা?—আমাকে মা বল্‌তে কী হয়?

অনিন্দ্য। মা? ধেৎ!

নমিতা (ক্ষুণ্ণ হইয়া)। তবে আমাকে কাকীমা বোলো, কেমন?

অনিন্দ্য। সেই ভালো, তোমাকে কাকীমাই বল্‌ব। আমার কাকাবাবু আছেন কিন্তু কাকীমা নেই তো।

নমিতা (অনিন্দ্যকে চুমু দিয়া)। সেই ভালো। আমি তোমার কাকীমাই হলুম। কাকীমাই বেশ! আয়, অতসীকে দেখি—

[উভয়ে ভিতরে গেল। ছাত্রমহল হইতে শেষাদ্রি ও বিকাশ বাহিরে আসিল।]

শেষাদ্রি। তুমি কেন যে আমাদের দল ছাড়তে চাচ্চো আমি তো কিছুই বুঝতে পারচি না।

বিকাশ। আমার কী মনে হয় জানো? আমার মধ্যে পরিপূর্ণতার বীজ আছে, অপরকে আকর্ষণ করবার, জয় করবার শক্তি আমারও

মধ্যে রয়েছে—যেমন সকলেরই আছে—আমি সেই পরিপূর্ণতার সাধনা করতে চাই। আর করতে চাই একান্তে—একাকী।

শেষাদ্রি। পাগল!

বিকাশ। এই কয়দিনের চিন্তায় চিত্তলোকে যে সম্পূর্ণ জীবনের সন্ধান পেয়েচি, এখন থেকে আমি সেই নতুন জীবনের সাধক হতে চাই—সেই জীবনকে আমার জীবনে সত্য করতে চাই। এখন থেকে আপনাকে দেহে-মনে-প্রাণে, কথায়-কাজে-চিন্তায়, সুন্দর ক'রে' রচনা করাই হবে আমার কাজ—আমি নিজেই হব নিজের স্রষ্টা। সুন্দর না হলে সুন্দরের বন্ধুত্বের যোগ্য হব কি করে ভাই?

শেষাদ্রি। দেখ, তুমি যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কথা বলচ তা এক রহস্যময় বস্তু।—কেউ সারাজীবন সুকঠিন সাধনা করেও এক বিন্দু পাচ্চে না, আবার না চাইতেই কারু সবাঙ্গে, সকল লীলায়, প্রতি মুহূর্তেই এই অপরূপ বিস্ময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে। এর রহস্যভেদ করতে পারলে এতদিন বৈজ্ঞানিকেরা পেটেণ্ট ওষুধের মত শিশি শিশি ঘরে ঘরে বিতরণ করতেন। এক এক দাগ খেয়ে সবাই সুন্দর হয়ে যেত।

বিকাশ। তবু আমার মন বল্‌চে—এ হওয়া যায়। এপর্যন্ত যদি নাও হয়ে থাকে এখন থেকে হবে—এইই ত মানুষের ভবিষ্যৎ—মানুষ নিজেকে মনের মত করে' রচনা করবে—নিজের আর পরের মনের মত করে'—নিজের দেহে, জীবনে, সমাজে। আমার মধ্যে সেই সত্য যেন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

শেষাদ্রি। তা তিনি যুগযুগান্ত অপেক্ষায় থাকুন! আমার আপত্তি নেই। সত্য মহাশয়ের সবুর সয়, কিন্তু মানুষের সয়না।

(হাতঘড়ি দেখিল) এসব উচ্চ-অঙ্গের আলোচনা পথে হবে, এখন চট্ করে' আমার রিভল্ভারটা নিয়ে এসো তো। তোমার বিছানার তলায় রেখে এসেছি।

[বিকাশ ছাত্রমহলের ভিতরে গেল ; একটি হাতব্যাগ লইয়া অতসীর প্রবেশ]

এইযে অতসী, সময় বড় আর হাতে নেই। রাত বারোটার দার্জিলিঙ মেলেই আমরা যাব। পথে গাড়ী বদ্‌লাব। তুমি তৈরি ত? তোমার জিনিষ-পত্র যা সঙ্গে নেবে গুছিয়েছ?

অতসী (হাতব্যাগটি তাহাকে দিয়া)। যা কিছু সঙ্গে নেবার এতেই রইল।

শেষাদ্রি। এই ছোট্ট হাতব্যাগে? কী আছে এতে অতসী?

অতসী। তোমার চিঠিগুলো। কেবল এগুলোই নিলাম। আচ্ছা, আমি এখন আসি, দিদি এসে পড়তে পারেন।

শেষাদ্রি। যথাসময়ে আমি হুইস্‌ল্ দেব, তুমি প্রস্তুত থেকো।

[অতসী প্রস্থান করিল। বিকাশ প্রবেশ করিল ; রিভল্ভারটা তার কাছে থেকে লইয়া শেষাদ্রি হাতব্যাগটি তাহার হাতে দিল]

তোমার জিনিষপত্রের সঙ্গে এটাও বেঁধে নিয়ো। অতসীর।

[রিভল্ভারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ; তারপরে উভয়ে জানালার কাছে গেল]

বিকাশ। নর্দমার নল বেয়ে সেই তেতালায় উঠবে?

শেষাদ্রি। সেইটেই ত সোজা রাস্তা।

বিকাশ। দেখো, খুব সাবধান। পড়ে গেলে—বুঝতেই তো পারচ!

শেষাদ্রি। তুমি এই জানালার কাছে কিম্বা আশেপাশেই কোথাও থেকো। প্রয়োজন হলে আমি সঙ্কেত করতে পারি—

বিকাশ। তা থাকৃব। কিন্তু খুব সাবধান। মহিমবাবুর কাছে সব সময়ে পিস্তল থাকে আর তাছাড়া তাঁর চাকর বাকর লোক-জন বিস্তর।

শেষাদ্রি। কিচ্ছু ভেবনা, কোনো ভয় নেই—।

বিকাশ। আর দেখ, শুনেচি লোকটার যেমন অগাধ টাকা, তেমনি অব্যর্থ লক্ষ্য! একবার ডাকাত পড়েছিল, তিনি একা এক বন্দুকে দলকে-দল হটিয়েছিলেন—। খুব সাবধান!

শেষাদ্রি। তা বল্‌তে হবে না। এধারে তুমি একটু নজর রেখ। সেই টিকৃটিকি ব্যাটার তো আর টিকি দেখ্‌চিনে—

বিকাশ। সে টিকৃটিকি নয়—। সে আমাদের—

[শেষাদ্রি জানালার উপরে উঠিল।

থাক্ ভাই, কাজ নেই। মন বল্‌চে এ যেন মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া। আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না।—নেমে এস, ওতে কাজ নেই।

শেষাদ্রি (হাসিয়া)। পাগল!

[গবাক্ষপথে অন্তর্হিত হইল। বিকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাতব্যাগ্‌টি রাখিতে ছাত্রমহলে গেল। কিঙ্কর প্রবেশ করিলেন—ক্ষণপরে বিকাশ ফিরিয়া আসিল।]

কিঙ্কর। শৈলেশ্বর ফিরেচেন?

বিকাশ। এসেছিলেন, আবার বেরিয়েচেন। এতক্ষণে ফেরার সময় হয়েচে।

কিঙ্কর। তাহলে অপেক্ষাই করি—[চেয়ার টানিয়া বসিলেন। বিকাশ সদর পথে বাহির হইয়া গেল, কিঙ্কর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জানালার কাছে গেলেন এবং বাহিরে তার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।]

বিকাশ দেখি, মহিমবাবুর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে—

[ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া]

শেষাদ্রি কি তাহলে ঐখানেই এখন? তাই হয়ত হবে।.... দেখিগে।

[কিঙ্কর বাহির হইবে, এমন সময়ে শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন]

শৈলেশ্বর। এই যে কিঙ্কর। জানি তোমাকে আস্তেই হবে। এক্ষুনি তোমাকে লিখছিলুম, কিন্তু বারো ঘণ্টাও তর্ সইলনা, ছুটে আসতে হোলো!

কিঙ্কর (আশ্চর্য হইয়া)। আমি আস্ব তুমি জান্তে নাকি?

শৈলেশ্বর। জানব না? একেই তো বলে প্রেম! রাণী এলে তাঁর কিঙ্করটিও যে আস্বেন তা আর হাত গুণে বল্তে হয় না!

কিঙ্কর। কী বাজে বক্‌চ, তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কথা আছে।

শৈলেশ্বর। দোহাই তোমার, ছেলেমানুষি কোরো না। শরতের সহজ স্বচ্ছ মেঘকে গুরুতর করে তোলার কিচ্ছু নেই—তার গর্জনও নেই, বর্ষণও নেই—তার কেবল চপল লঘু নৃত্য।

কিঙ্কর। অবাক্ করলে! তামাসার কথা নয়, সত্যিই গুরুতর ব্যাপার—

শৈলেশ্বর। লঘু-গুরু জ্ঞান কি আর তোমার আছে হে? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো দেখি—তাহলেই দাম্পত্য কলহ সম্পর্কে বনবাসী ব্রহ্মচারী মহর্ষিরা যে-তত্বকথা বলে গেছেন তার মর্ম উপলব্ধি হবে।

কিঙ্কর। বাক্য ব্রহ্ম, সুতরাং অক্ষয় অব্যয়—যতখুসি বাজে খরচ করতে পারো, ফুরোবে না, কিন্তু তার অর্থ না থাকলেই অনর্থ ঘটে!

শৈলেশ্বর। নারীর মন কেমন জানো? জলে থাক্‌লে ডাঙায় আস্‌তে চায়, আবার ডাঙায় থাক্‌লে জলের জন্যে তার মন কেমন করে। এতদিন তাদের একটির সঙ্গে ঘর করেও যদি তাদের না বুঝে থাকো—

কিঙ্কর। ভালো বিপদ! নারীর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তোমার Sermon কে চাইচে যে তুমি চার মণ মোহমুদ্গর আমার ঘাড়ে চাপাচ্চো? এখন আমার কথাটা শোনো, আমি খানিক আগে আরেকবার এসেছিলুম, তুমি ছিলেনা—

শৈলেশ্বর। ডাক্তারের কাছে গেছলুম, তিনি বাড়ী নেই কিন্তু এখানে না বসে এতক্ষণ ছিলে কোথায়? অত্যন্ত চটে মটে পথে পথে ঘুরছিলে বুঝি?

কিঙ্কর। যখন চোখে চোখে মিলনের দিন ছিল তখন ঢের ঘুরেচি এখন আর পথে পথে ঘোরার বয়স নেই, অবসরও কম। এতক্ষণ ছিলাম পুলিশ সাহেবের বাসায়, তারপর তাঁকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—

শৈলেশ্বর। সেখানে কেন?

কিঙ্কর। আরে জানোনা বুঝি? মাষ্টারি ছেড়ে আমি যে পুলিসে কাজ নিয়েচি।

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? দেখ্‌চি নমিতার মতো তুমিও একটি surprise packet! কিন্তু মাষ্টারি ছাড়লে কেন?

কিঙ্কর। ছেলেরা বড্ড পেছনে লেগেছিল।

শৈলেশ্বর। তাই বুঝি এবার তাদের পেছনে লাগ্‌লে? Noble revenge বটে!

কিঙ্কর। ছাড়তে বাধ্য করলে, এমনকি শেষটা আমাকে খুন করবার মৎলব পর্যন্ত দেখা গেল—

শৈলেশ্বর। ইস্কুলের শিশুদের? বলো কি! তাই বুঝি জীবনে শিশুপাল বধের ব্রত নিয়েছো?···যাক্, দুটো কাজে তফাৎ বড় নেই হে—মাষ্টারের কাজ গাধা পিটে ঘোড়া করা, আর পুলিসের কাজ ঘোড়া পিটে গাধা করা,—দুইই সমান পিটুনি।

কিঙ্কর। কিন্তু যাই বল, দুদলের কাজের সামঞ্জস্যে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাচ্ছে—আসলে যে গাধা সেই গাধাই থেকে যাচ্ছে!

(হোষ্টেলের চাকর প্রবেশ করিল)

চাকর। বাবু!

শৈলেশ্বর। কিরে? চুণকাম ধোয়া মোছা শেষ? ঘরগুলো সব সাজানো হয়েচে? মিস্ত্রিদের মজুরি চুকিয়ে দিয়েচিস্?

চাকর। সন্ধ্যের আগেই। চৌকি, টেবিল গুলোও সব সাজানো হোলো। আপনি একবার দেখবেন না?

শৈলেশ্বর (উঠিলেন)। চল্, দেখি—

কিঙ্কর (ব্যস্ত হইয়া)। কোথায় চল্লে আবার?

শৈলেশ্বর। কাল সব ছেলেরা ফিরবে, এই কদিন হোষ্টেলের ঘর গুলোর চূণবালি খসিয়ে চেহারা ফেরানো হচ্ছিল। কেমন হয়েচে দেখিগে—

কিঙ্কর। আমার কথাটা শুনে যাও, আসল কথা তো এখনও পাড়িইনি—

শৈলেশ্বর। ব্যস্ততার দরকার কি, সমস্ত আসল কথা যিনি আস্‌লেই ফুরোয়, আমি তাঁকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন—চা জলখাবার সমেত। ততক্ষণ জিরোও একটু।

(শৈলেশ্বর চাকরসহ ছাত্রমহলে গেলেন।

কিঙ্কর। ভালো পাগলের পাল্লায় পড়িচি!

(অন্দরমহল হইতে নমিতার প্রবেশ।

নমিতা। শৈলেশ!

(কিঙ্করকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

কিঙ্কর (একান্ত বিস্ময়ে)। একি! তুমি এখানে!

নমিতা। কেমন করে' জানলে, এখানে এলে কি ক[illegible]?

কিঙ্কর। আমারো ত সেই প্রশ্ন! শৈলেশ্বর কি এতদিনে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আবিষ্কার করলো নাকি!

নমিতা। আমার চিঠি পাওনি? তোমার টেবিলে রেখে এসেচি।

কিঙ্কর। বাড়ী ফিরে' পাব বোধকরি। কিন্তু তার জন্যে তত ব্যস্ত নই—

নমিতা। না পেয়েচ ভালোই হয়েচে। আজ তোমাকে সমস্ত

খুলে বলব,—চিঠিতে যা লেখা ছিলনা, যা কোনদিন তোমাকে বলিনি। তারপর তুমি যা ভালো বোঝো কোরো।

কিঙ্কর। সব কথার আগে এই কথাটা বলে বাঁচাও, তুমি এখানে কেন এবং এমন হঠাৎ কেন ?

নমিতা। সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবে।—আমাদের বিয়ের আসরে শৈলেশ্বর যে গানটা গেয়েছিল তোমার মনে আছে ?

কিঙ্কর। গেয়ে শোনাতে হবে ?…"একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে, বসেচ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে। সেথা যে বহে নদী—"

নমিতা। ভুলে যাওনি দেখছি।

কিঙ্কর। না। এতদিনেও ভুলতে পারিনি এইজন্যে যে এটা ভোলা একটু শক্তই—তোমারো এবং আমারো। গুলির দাগ কিনা, কেবল গানের ফাঁকা আওয়াজই তো নয় !

নমিতা। তা বটে।—এত গান থাকতে এই গানটাই শৈলেশ কেন গাইল, ফুলশয্যার রাত্রে বারবার এই কথাটাই তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—

কিঙ্কর। করেছিলুম, ফুলশয্যাটা কণ্টকশয্যার মতই ঠেক্‌ছিল আমার !

নমিতা। সেদিন আমি কোনো জবাব দিইনি, আজ আমি সেই গানটারই জবাব দিতে এসেচি—সেই গায়ককে।

কিঙ্কর। কী জবাব ?

নমিতা। ভুলিনি—ভুলিনি। কেবল এই কথাটা।

কিঙ্কর। আর আমাকে বুঝি একবারে জবাব দিলে ?

নমিতা। তুমি এত সহজে ব্যাপারটা নিতে পারবে আমি আশা করিনি।

কিঙ্কর। শৈলেশ আমামার জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে পারে আর আমি তার জন্যে পারিনে ?

নমিতা। পারলে সুখের, কিন্তু সত্যি কথাটা শুনেই কোরো। তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে শৈলেশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কাজেই ন্যায়ের দিক থেকে আর সামাজিক নিয়মেও আমাদের বিবাহ সিদ্ধ হতে পারে না।

কিঙ্কর (কিছুমাত্র আশ্চর্য না হইয়া)। সিদ্ধ না হোক, আমাদের বিবাহটা কাঁচাই রইল ; কিন্তু আমরা এতদিন একত্র ঘর করবার পর যদি পরস্পরকে পর করি, তাহলে আমার আর কি! তুমিই সমাজের চক্ষে পতিতা বলে গণ্য হবে।

নমিতা। তোমার কথায় আমার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়্‌ল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, এক জায়গায় পিছল ছিল, পড়ে গেলুম। চারিদিকের লোক দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল, সমালোচনা কর্‌তে লাগ্‌ল, আমার পা মচকে গিয়ে উঠতে পার্‌ছিলুম না, কিন্তু কেউ উঠ্‌তে সাহায্যও করল না। সহসা একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসে আমাকে বল্লেন, বাছা, পড়ে গেছ—তুমি পতিতা। ব্যথা করছিল বলেই হোক্ বা তাঁর কথা শুনেই হোক্ আমি কাঁদতে লাগলুম। তিনি আমাকে তুলে ধরে বল্লেন, এই যে দাঁড়িয়ে গেছ, আর তুমি পতিতা নও। আমি সেই কথাই তোমাকে আজ বলি, এতদিন পতিতা ছিলুম বটে, কিন্তু এখন দাঁড়িয়েছি, আর আমি পতিতা নই। এখন রাস্তা দিয়ে যারা চল্‌ছে তাদেরই একজন আমি।

কিঙ্কর। বেশ, তবে আমার কথাও শোনো। ফুলশয্যার পরদিনই শৈলেশকে ওই গানটার মর্ম আমি জিজ্ঞেসা করি। গানটার সুর আমার মনের অসুরকে জাগিয়ে তুলেছিল।—এবং বুঝতেই পারচ, সুরাসুরের দ্বন্দ্বে আমার অবস্থাটা কেমন মর্মান্তিক দাঁড়িয়েছিল।

নমিতা। সে কি বল্লে?

কিঙ্কর। সে যা বল্লে তাতে বুঝলুম যিনি বলেছিলেন অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্—তিনি সার কথাই বলে গেছেন। তোমার সঙ্গে বিবাহের অভিনয়ের কোনো কথাই সে গোপন করেনি।

নমিতা। বিবাহের অভিনয়!—

কিঙ্কর। সে ত তাই বল্লে। কিন্তু আমার মনে হয় অভিনয়টা সুরু হোলো যবনিকার পর—আমাদের ঘরের নেপথ্যে। যখন জগৎসিংহ রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন! তুমি আরেক জগতে চলে এলে।

নমিতা। কথা কাটাকাটি করতে চাইনে, আমি স্থির করেচি তোমার বাড়ী আজ থেকে আর আমার বাড়ী নয়।

কিঙ্কর। বেশ ত, থাকো না দিন-কতক এখানে। শৈলেশ ভদ্রলোক—আমি বল্লে হয়ত তার আপত্তি হবে না, কিছুদিন থেকে তোমার মনটাও ভালো নেই, শরীরও সুবিধে যাচ্ছে না—এখানে থাকলে হয়তো হাওয়া বদ্‌লানোর কাজ হবে।

নমিতা (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল)। কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে!

কিঙ্কর। বারে! আমি কী করলুম? কাঁদ কেন? তুমি যা করবে তাতেই ত আমি রাজি।

নমিতা (বাষ্পরুদ্ধস্বরে)। কেন তুমি বিয়ে করে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে ?

কিঙ্কর। বিয়ে-করার দায়িত্ব আমার একার নয়, তুমিও যে করেছিলে। একই অপরাধের আসামী হয়ে, অভিযোগও করচ, আবার ফাঁসিও দিচ্চ! বলিহারি!

নমিতা। সবারই কোলজোড়া চাঁদমাণিক আছে, আমার খোকা যদি না বাঁচে আমি তাহলে বাঁচ্‌ব কি নিয়ে ?

কিঙ্কর। এ ত ভগবানের হাত নমিতা, তুজন বাঁচেনি বলে যে কেউই বাঁচবে না তা কে বল্লে ?

নমিতা। ডাক্তার বলেচেন আমাদের ছেলে কখনো বাঁচবে না, আর যদি কদাচিৎ বেঁচে যায় সে সুস্থও হবে না, সুশ্রীও হবে না।—

(কিঙ্কর ক্ষণেক গম্ভীর ম্লানমুখে নীরব রহিল।)

কিঙ্কর। ডাক্তার বলেচে!···কেন, তা কিছু বলচে ?

নমিতা। সমস্তই তিনি বলেচেন, কিছুই গোপন করেন নি। (একটু থামিয়া) কেন এ পাপ করেছিলে ?

কিঙ্কর (মাথা নত করিয়া)। তুমি সব জেনেচ তাহলে!

নমিতা। সব জেনেচি। কিন্তু যদি না জান্‌তে হোতো—!

কিঙ্কর। হয়ত আমার খুব দোষ ছিল না। বিয়ের আগে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গান বাজনা শুনতে 'তাদের' কাছে যেতুম—তারা বল্‌তো নির্দোষ আমোদ। তারপরে মুহূর্তের ভুল—সে আমার প্রথম যৌবনের অপরাধ নমিতা!

নমিতা। এই মুহূর্তের ভুল—যার জের সারাজীবন টেনে চল্‌তে হবে ?

কিঙ্কর। হ্যাঁ, যদি ছেলেপিলে হয়—বাঁচে, তবে বংশানুক্রমে—

নমিতা (শিহরিয়া)। কী ভয়ানক!—

কিঙ্কর। একটু আগে তুমি বল্‌ছিলে যে ইচ্ছে করলেই কেউ আর পতিত নয়, কিন্তু সে কেবল মনের দিক দিয়েই। দেহের দিক দিয়ে পড়লে কি আর ওঠা যায়? মনের আঘাত কখনো সারে হয়ত, কিন্তু দেহের আঘাত? পক্ষাঘাত?

(নমিতা নীরব।)

কিঙ্কর। তুমি হয়ত বল্‌বে নিজে নষ্ট হয়ে কেন তোমাকে নষ্ট করতে গেলুম—বিবাহের অধিকার তো আমার ছিল না। কিন্তু নমিতা, তোমাকে আমি চেয়েছিলুম কেবল তোমারই জন্যে, তোমার ছেলের জন্যে নয়—এই কথাটা তুমি আমার বিশ্বাস কোরো।

নমিতা। কিন্তু আমি যে—

কিঙ্কর। প্রলোভনে পড়ে জীবনের প্রথম ভুল করেছিলুম, বিবাহ করে' দ্বিতীয় ভুল করা আমার উচিত ছিল না।……আমায় ক্ষমা কর নমিতা!

(নমিতা চোখে আঁচল চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিঙ্কর গম্ভীরমুখে স্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেকপরে সাধারণ পোষাকে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল।)

সেই ব্যক্তি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু আছেন?

কিঙ্কর। শৈলেশ্বরবাবু? তিনি ভেতরে। কী দরকার?

সেই ব্যক্তি। আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আস্‌চি, তাঁর কম্পাউণ্ডার। তাঁর ছেলের এই রিপোর্টখানা কলকাতা থেকে এসেচে,

দেবেন তাঁকে। ডাক্তারবাবু বল্লেন ঘণ্টখানেক পরে একটা 'কল্' থেকে
ফিরে এখানে আস্বেন।

কিঙ্কর। দেখি রিপোর্ট—

(খামখানা লইয়া বাস্কেটে রাখিয়া দিলেন)

সেই ব্যক্তি (চলিয়া যাইতেছিল)। আমি তাহলে আসি।

কিঙ্কর (কী ভাবিয়া)। ওহে শোনো শোনো, একটা কাজ
পারবে?

সেই ব্যক্তি (ফিরিয়া দাঁড়াইল)। কি কাজ বলুন।

কিঙ্কর (পকেট হইতে একখানা নোট বাহির করিলেন)। দশটা
টাকা পাবে, একটা জরুরি চিঠি এক্ষুণি পুলিস সাহেবের বাড়ী পৌঁছে
দিতে পারবে?

সেই ব্যক্তি (উৎসাহের সহিত)। কেন পারবো না মশাই, খুব
পারবো।

[কিঙ্কর তাড়াতাড়ি কি লিখিয়া কাগজখানা ও
নোটটা সেই ব্যক্তির হাতে দিল।

কিঙ্কর। খুব জরুরি, এক্ষুণি যাও—খোদ্ পুলিশ সাহেবের হাতে,
মনে থাকে যেন।

সেই ব্যক্তি (নমস্কার করিয়া)। আমি ছুটে যাচ্ছি—

[প্রস্থান করিল।

কিঙ্কর। কর্তব্য আগে। মহিমবাবুর বাড়ীতে নাটকের কোন
অঙ্ক সুরু হয়েচে দেখি গে, বোধহয় যবনিকাপাতের দেরি নেই—
আমি গেলেই সেটা হবে। [বাহির হইলেন।

বিকাশ বাহির হইতে আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ছাত্রমহল হইতে শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর (প্রসন্ন তৃপ্তিতে)। ঘরগুলো কেমন হয়েচে দেখেচ বিকাশ। বেশ পরিচ্ছন্ন নয় কি? যেন নতুন বাড়ীর মত ঝক্‌ঝক্‌ করচে—! ছেলেরা কাল হোষ্টেলে পা দিয়েই কেমন আশ্চর্য হবে আমি তাই ভাবচি—যেন কারাগার থেকে প্রাসাদ!

বিকাশ। কিন্তু সার্‌, প্রাসাদ থেকে কারাগার—তাও তো কেবল এক পা'র ব্যবধান!

শৈলেশ্বর। মেঝেগুলো সিমেণ্টেড্‌ হয়েচে, দেয়ালে চূণবালি পড়ল, চারিদিকের বনজঙ্গল পরিষ্কার—ছেলেদের অভিভাবক হয়ে থাকা তো মুখের কথা নয়। এই যে একটি ছেলে সেদিন inflamation of lungsএ মারা গেল—তার কারণ কি জানো? ডাক্তার আমাকে বলেচেন।

বিকাশ। কিন্তু এই বাজে খরচটা তো কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করবেন না। আপনার নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

শৈলেশ্বর। তা হবে, কিন্তু আমার নিজের স্বার্থ যে একেবারে নেই তা মনে করোনা। অনিন্দ্য—অনিন্দ্য ত এই আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠবে।—

বিকাশ। তার জন্য আপনি অতো ভাবেন কেন? সেত বেশ আছে, বাহির থেকে তাকে ত অসুস্থ দেখায় না—

শৈলেশ্বর। তাই ত আরো ভাবনা। ছোটোখাটো অসুখগুলো সোরগোল করে এসে পড়ে, লড়াই করে তাদের হটানো যায়। কিন্তু বড় বড় অসুখের ভারী চাল—এসেচে কি না বোঝবার যো

নেই ; যখন যায় একেবারে সবটাই নিয়ে যায়। বিকাশ, তুমি ঘূণধরা বাঁশ দেখনি ?……এই লম্বা খামখানা আবার কোত্থেকে এল ?…

(বাস্কেট হইতে খামখানা তুলিলেন। নমিতাকে আসিতে দেখিয়া বিকাশ সদর-পথে বাহিরে গেল।)

নমিতা। শৈলেশ !

শৈলেশ্বর (খামখানা বাস্কেটে রাখিয়া দিলেন)। কি নমিতা ? কিঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েচে ?

নমিতা। হয়েচে।

শৈলেশ্বর। বোঝাপড়া চুকল ত ? এই সব দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধে, জানি, শাস্ত্রকার সার কথাই বলে গেছেন—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

নমিতা। লঘু ক্রিয়া কি না বলতে পারিনে, তবে বোঝাপড়া একটা চুকেচে ; আমাকে মুক্তি দিতে তাঁর তেমন আপত্তি নেই—

শৈলেশ্বর। বলো কি ? অমৃতে অরুচি ?

নমিতা। অমৃত নিঃশেষ, এখন মন্থনে কেবল বিষই উঠ্‌চে—

শৈলেশ্বর। কিন্তু কিঙ্কর তো সে-রকমের নয়—

নমিতা। সেরকম নয় বলেই ত আমাকে ছাড়তে পারচে,—সে জানে একজনের কাছে যা বিষ হয়ে উঠেচে, আরেক-জনের কাছে তাই অমৃত। যেমন মহাদেবের কাছে।

শৈলেশ্বর। গর্বের কথা, গৌরবের কথা বটে। এবং আনন্দিত হতে পারতুম, কিন্তু নমিতা, আমি ত মহাদেব নই, অতি সাধারণ এক মানুষ।

নমিতা। আমিও ত মহাদেবী নই, অতি সাধারণ নারী, তবে আমাকেই বা কেন গণ্ডী দিয়ে তুমি দূরে সরিয়ে রাখবে?

শৈলেশ্বর। সেকথা নমিতা, তুমি বুঝবে না। আমাদের এই সনাতন ধর্মে অন্য সমাজের মত বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই যে একজন পরিত্যাগ করলেই আরেক জন তাকে গ্রহণ করতে পারে।

নমিতা। একদল মেয়ে রক্ষিতা, আরেক-দল সুরক্ষিতা—তফাৎটা কি তুমি খুব বেশী বলে' ভাবো?

শৈলেশ্বর। নমিতা, তুমি পাগল! তফাৎ কোথায় এখন তুমি বুঝবে না—যে-দশজনের মধ্যে বাস করতে হবে তারাই একদিন বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু তর্ক থাক্, আমার প্রথম যৌবনের প্রিয়াকে এত নিচুতে নামাতে পারবো না আমি কিছুতেই—

নমিতা। কিন্তু যেখানে নামাতে ভয় পাচ্চ সেটা নরক নয়—সেইখানেই স্বর্গ,—স্বর্গের আনন্দ, অমৃত, উৎসব, দেবশিশু—সব সেখানেই।

শৈলেশ্বর। পারব না আমি, স্বর্গের লোভেও না—

নমিতা। আমার প্রথম যৌবনের উপাস্যকে এতদিন পরে এত ভীরু দেখ্‌ব আমি আশা করিনি—

শৈলেশ্বর। তুমি আমাকে পাগল করে দেবে নমিতা। কি—কি—কী চাও তুমি আমার কাছে?

নমিতা। একটি সুস্থ সবল সুন্দর শিশু—

(শৈলেশ্বর নিষ্পলক চাহিয়া রহিল, কথা ফুটিল না।)

—দেবে, দেবে শৈলেশ, দেবে আমাকে তেমনি একটি সোনার

খোকা? আমার খেলার জন্যে আকাশের চাঁদের একটুকরো, দেবে আমার হাতে তুলে?

শৈলেশ। সেই আকাশের চাঁদকে নামাবে কোথায়—পৃথিবীর অবজ্ঞা, অবহেলা, অনাদরের মধ্যে! এই ধুলার ধরণীতে তার জন্য কি কোথায় একটুখানি জায়গা আছে! মায়ের বাহু দিয়ে কদ্দিন তাকে ঘিরে রাখবে তুমি নমিতা! আর সকলের লাঞ্ছনার অপমানের হাত থেকে!

[নমিতা নীরব।]

—তবে শোনো, যে-কথা কাউকে কোনোদিন বলিনি তাই বলি—আমার মার কাহিনী। তাহলে বুঝবে আমার ছেলের মাকে কেন তার ঠাকুরমার মত করতে আমি চাই না।

[ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন।]

—মা যখন আমাকে ছেড়ে যান তখন আমি ছ'বছরের, কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে বাবা ও মার মনের মিল ছিল না, যতদিন তাঁরা একত্র ছিলেন একটি দিনের জন্যেও সুখশান্তি পাননি—

নমিতা। অনুস্বর বিসর্গ দিয়ে দুটো জীবন জোর করে হয়তো বা জোড়া যায় কিন্তু কেবল জুড়ে দেওয়াই যায় তাদের অন্তরের সুরে মেলানো যায় না।

শৈলেশ্বর। শুনেচি বাবা নাকি শেষটা মদ ধরেছিলেন, মাতাল হয়ে মাকে খুব মারধোর করতেন। অভাগিনী মার আমার কোনো দোষ ছিল না, খুব অসহ্য না হলে তিনি বাবার কিছুর প্রতিবাদ করতেন না, কিন্তু বাবাই তাঁর জীবন দুর্বহ করে তুলেছিলেন—অবশেষে এক রাত্রি থেকে তাঁকে আর পাওয়া গেল না।—

নমিতা। কী হোলো তাঁর ?

শৈলেশ্বর। বাবা বল্‌তেন,—তাঁর বন্ধুদের কাছেই বলতেন, আড়াল থেকে আমার শোনা—কার সঙ্গে নাকি তিনি বেরিয়ে গেছেন! আমার কিন্তু কী মনে হয় জানো? মুক্তির জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন—তাই যে কোনো একটা উপলক্ষ্য ধরে—! কিম্বা হয়তো সর্বনাশের নেশায় পাগল হয়েই তিনি বেরিয়েছিলেন—

নমিতা। এই যদি আমাকে গ্রহণ করার তোমার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয় তবে বলি যে আমিও খুব উঁচুতে নই; আমিও এমনই একটি পতিতা মায়ের মেয়ে—

শৈলেশ্বর। নমিতা!

নমিতা। এক শীতের রাত্রে তাঁকে বাবা পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। বাবা সমাজ মান্‌তেন না, কেবল নিজেকে মান্‌তেন। কারুকে তাঁর কোনো পরোয়া ছিল না।...বাবা বল্‌তেন, পাছে সমাজ পায়ে দলে এই ভয়ে নিজেরাই নিজেদের দল্‌চি কিন্তু দল্‌বার এতটুকু শক্তি ঐ সমাজের পায়ে নেই। হাতীর মত দেখ্‌তে বটে, কিন্তু মমির হাতী!

শৈলেশ্বর। হয়ত সত্যি নমিতা, আমাদের সমাজ, আমরা, কোন্‌ কালে হয়ত ছিলাম বেঁচে,...কিন্তু এখন সব মমি। কিন্তু তাই যদি হয়—

নমিতা। (শ্লেষাত্মক সুরে) তুমি সাধু পিতার ছেলে, সমাজকে ভয় করে চলো তুমি, আমি চলিনে। আমার বাপ মা সাধু না হোন্‌, মানুষ ছিলেন—অতি সাধারণ মানুষ—এই আমার গর্ব। ঘর ছেড়ে বেরিয়েচি বলে তুমি দোষ দিচ্চ, কিন্তু আমার মাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-

ছিলেন—ঘর ছেড়ে বেরুনোর বীজ যে আমার রক্তে—তাকে আমি এড়িয়ে চলব কি করে'? আর চলবারই বা আমার কী দরকার?

শৈলেশ্বর। নমিতা, নমিতা, তাই হবে। আমরা যদি পতিতা মায়েরই সন্তান হই, পাতিত্যই যদি আমাদের মজ্জাগত সত্য হয়—কলঙ্কের পঙ্ক ছাড়িয়ে ওঠা যদি আমাদের অসম্ভবই হোলো,—তবে তাই হোক্ নমিতা। কিন্তু এখানে না, এই ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে দশজনের মধ্যে নয়,—চলো আমরা চলে যাই সমাজের বাইরে, বহুদূর দেশে—অন্য কোথাও—

নমিতা। (আনন্দে) সত্যি বলচ শৈলেশ, সত্যি আমরা যাব?

শৈলেশ্বর। সত্যি না ত কি? যে ধূলায় আমরা জন্মেচি, সেই ধূলাতেই পড়ে থাক্‌ব, সেইখানেই আমাদের সন্তানকে উত্তীর্ণ করে দেব। আমাদের মা যে ধূলায় পড়ে রইলেন, তাঁকে নিয়ে উঠতে পারতুম ত উঠ্‌তুম—তাঁকে ছাড়িয়ে উঠতে আমরা চাইনে।

নমিতা। কিন্তু ধূলার সম্বল বড় কম সম্বল নয়, শৈলেশ! খুব নিচুতে আছে বটে, কিন্তু আছে বলেই উঁচুতে ফল ধরচে, ফুল ফুটচে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু একটা কথা নমিতা, আমার মা যে কোথায় তা জানিনে, তোমার মাকে আমাদের সঙ্গে নেব।

নমিতা। তিনিত নেই।

শৈলেশ্বর। কেন, কী হোলো তাঁর?

নমিতা। আমার যখন ন বছর বয়স, আর আমার ভাইটির বয়স বছর চার, সেই সময়ে একদিন কি নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বাধল। বাবা ছিলেন ভালোমানুষ ত ভালোমানুষ, কিন্তু রাগলে যম! একেবারে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠ্‌তেন—যে গোঁ ধরতেন তা থেকে

নড়ায় কার সাধ্যি!—ঝগড়ার ফলে বাবা ভয়ানক রেগে গেলেন, একটি মাত্র বস্ত্রে মাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। সেদিনও ছিল শীতের এক রাত্রি—বাইরে হু হু বাতাস, ঘরে হাড়-কাঁপুনি ঠাণ্ডা!—

শৈলেশ্বর। বলো কি? একি সম্ভব?

নমিতা। সেই দেশেই সম্ভব যেখানে নারীকে আজীবন রুদ্ধ ঘরের ভিতর বন্দী রেখে তাকে অকস্মাৎ একদিন একান্ত অসহায় ভাবে অপরিচিত অনাত্মীয় পথে বিসর্জন দিতে সমাজের একটুও বাধে না।—

শৈলেশ্বর। তারপর, নমিতা, তারপর?

নমিতা। তারপর? আমার আজো মনে পড়ে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মা আমার কেঁদে কেঁদে আমাদের দুটিকে ভিক্ষে চাইছিলেন—কিন্তু সেই রুদ্ধ দ্বার আর খুলল না। শেষ রাত অবধি হাহাকার করে' কোথায় যে তিনি চলে গেলেন আর তাঁর দেখা পাইনি। এখনো যেন দরজায় তাঁর করাঘাতের শব্দ পাই!—সে রাত্রে দুই ভাই বোনে কী কান্নাই কেঁদেছিলুম। শিরীষ কিছু বোঝেনি কিন্তু সে-ও কাঁদ্‌ছিল।

শৈলেশ্বর। আমি কিন্তু তারপরেও মার দেখা পেয়েছিলুম—তখন আমি সতের কি আঠারো। ছ' বছরের সময় মা ছেড়ে গেছলেন, তবু দেখা মাত্রই তাঁকে চিন্‌লুম। কি করে জানো? আমার এক জন্মদিনে তাঁর কাছে এক লকেট্ উপহার পেয়েছিলুম—তাতে ছিল তাঁর ফটো। দিন রাত সেই ছবিখানি দেখে-দেখে মাকে আমার মুখস্থ হয়ে গেছল। আর তা ছাড়া মা-ও আমার তেমন কিছু বদ্‌লাননি—

নমিতা। এসেছিলেন তিনি? তারপর?

শৈলেশ্বর। ভিখারিণীর বেশে মা এসেছিলেন—কেবল আমাকে একটিবার দেখতে। আমার অভাগিনী মা। আমাকে স্পর্শ করতে সাহস হচ্ছিল না, অথচ মুখে চোখে সেই ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল। আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলুম, বল্লুম, চিনেচি, তুমি আমার মা।...তখন তিনি আমাকে কোলের ওপর টেনে নিলেন, তাঁর দীর্ঘ বিরহের সমস্ত আদর সব নিঃশেষে আমার ওপর ঢেলে দিলেন। সেই দিনটির স্মৃতিই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সুখ। তারপরে বল্লেন—

নমিতা (সাগ্রহে)। কী বল্লেন? কী বল্লেন মা?

শৈলেশ্বর। আমাকে ছোট বেলায় যে ছেড়ে গেছলেন আমার কাছে তার মার্জনা চাইলেন। আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে বল্লুম, আর যেন আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।—নমিতা, রক্ত-মাংসের যে অপরাধ, তার বিচার করবার অধিকার স্বয়ং স্রষ্টারই নেই ত, যে-ছেলে সেই মার রক্তমাংস নিজের দেহে বহন করচে সে করবে তাঁর অপরাধের বিচার? বিচার করে দেব দণ্ড কিম্বা করব মার্জনা, এত বড় স্পর্দ্ধা হবে আমার!

নমিতা। তারপরে কী হোলো?

শৈলেশ্বর। মা একটুখানি মাথা গুজ্‌বার জায়গা চেয়েছিলেন কিন্তু বাবা তাঁকে একটা রাতও থাক্‌তে দিলেন না। মাকে দেখেই তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। মা বাড়ীর দাসীবৃত্তি করে খাবেন, চাক্‌রাণীদের সঙ্গে শোবেন—কেবল আমাকে দুবেলা দেখতে পাবেন—এই জন্য!—

নমিতা। এতটুকু কৃপাও বাবা তাঁকে কর্‌লেন না?

শৈলেশ্বর। (বেদনায় অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া) নাঃ।—এতদিন

পরে আমাকে পেয়ে ছেড়ে যেতে মার বুক ফেটে যাচ্ছিল, মাকে নিয়ে পৃথক থাক্‌তে চাইলুম, বাবা আমাকে খুব মারলেন আর মাকে তাড়িয়ে দিয়ে মদ খেতে আরম্ভ করলেন।

(সহসা আর্তনাদে ফাটিয়া

কী ভুলই করেচি নমিতা, কী ভুলই করেচি, কেন সেদিন মার সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম না!

(একটু থামিয়া

কেন পারিনি জানো নমিতা? মাকে বার করে বাবা ভেতর থেকে চাবি এঁটে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার গায়ে ত ছিল অসুরের মত বল, আমি ত সহজেই তাঁকে পরাস্ত করে চাবি কেড়ে নিতে পারতুম। তবু কেন পারিনি?

(অর্থহীন হাস্য করিতে করিতে

কী জানো নমিতা? পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার শিরশ্ছেদ করেছিল, বোধহয় সেই পুণ্য আর্য-শোণিত এই সনাতন ধমনীতে বইছিল বলেই—

(শোকে মুহ্যমান হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন)

নমিতা (সান্ত্বনার সুরে)। তোমার কী দোষ শৈলেশ? পতিতা স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিতে তোমার বাবা হয়ত এতটা কঠোর হতেন না—কিন্তু সমাজই তাঁকে এমন করে তুলেছিল। আবার সমাজও হয়ত এতটা কঠোর নয়—তোমার বাবার মত লোকেরাই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে এমন করে গড়ে তুলেছেন। এটা একটা পাপচক্র বইতো না।

শৈলেশ্বর। পাপচক্রই বটে নমিতা, পাপচক্রই বটে! নিত্যই তো সমাজের চাকার তলায় এরকম কত প্রাণই পিষ্ট হচ্চে আমরা দেখি, কিন্তু খবরও রাখি না। দশজন একজোট হলেই কি একজনকে পিষবার তাদের অধিকার জন্মায়?

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া

নমিতা, তুমি কখনো কাউকে চাকার তলায় পড়তে দেখেচ? আমি দেখেচি। এক বিরাট লোহার কারখানা দেখতে গেছলাম—কারখানা তো নয় একটা সহর, হাজার কুলী সেখানে খাটচে। আমারই সামনে একটা মেশিনের চাকায় একজনের কাপড় আটকে গেল—বেচারা টের পেতে না পেতেই যন্ত্রটা তাকে নির্মম আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়েছে—কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার! বেরিয়ে আসবার জন্যে কুলীটার কী প্রাণপণ চেষ্টা! যখন তার একটা হাত কাটা পড়েচে তখনো বেরিয়ে আস্‌তে চাইচে যখন একখানা পা কাটা পড়ল তখনও—কিন্তু যখন—ওঃ!······কুলীটার মুখে আমার মার মুখের ছবি দেখেছিলুম—মাকে যখন বের করে দেয় তখনকার!

নমিতা (আর্তস্বরে)। ও মা—মা গো!

শৈলেশ্বর। যাবার সময় মা বলে গেছেন, আমার আরো নাকি ভাই বোন আছে, তাদের যেন নিজের কাছে এনে রাখি। কিন্তু তারা যে কোথায় তাই এখনো জানিনে। তাদের যদি পেতুম, তবু আমার এই জীবনে একটা সান্ত্বনা থাকৃত যে মার একটা কাজও আমার দ্বারা হোলো, একটা আজ্ঞাও তাঁর পালন করতে পারলুম।

নমিতা। তারপর আর তাঁর দেখা পাওনি?

শৈলেশ্বর। না। তারপরে তাঁর কী হতে পারে সেই সর্বনাশের

কথা ভাবলেও বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়!—তারপরে এমন অবস্থায় অসহায়া নারীর যে-গতি হতে বাধ্য—!

নমিতা। তেমন দুর্গতি হয়েচে কেন ভাবচো? তিনি তো আত্মহত্যা করতেও পারেন!

শৈলেশ্বর। না, তা করবেন না, মা আমাকে ভালোবাস্‌তেন। যাবার সময় বলে গেছেন, আমার সঙ্গে মিলবার জন্যে তিনি বেঁচে থাক্‌বেন।···আর, কত বেশি মূল্য দিয়েই যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে হয়! আত্মহত্যার চেয়েও বড় ট্রাজেডি, কি জানো নমিতা, আত্মাকে হারানো।······অভাগিনী মা আমার!···

নমিতা। তুমি কি পরে আর কখনো তাঁর খোঁজ করোনি?

শৈলেশ্বর। হাঁ, বাবা মারা যাবার পরেই।···কলকাতার ঐ ধরণের সব আড্ডাই খুঁজে দেখেচি—কোনো খোঁজ পাইনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন দেখা পাবই, একদিন তাঁকে আস্‌তে হবেই। আমার পতিতা মা তো মাতৃত্বে কারু চেয়ে খাটো নন্! মাকে নিয়ে আমি থাক্‌ব। যে সুখশান্তির মরীচিকার পেছনে সারাজীবন তিনি ছুটেছেন, পাননি—তাই আমি মাকে দেব। নমিতা, তোমাকে আমি কতদিন বলেচি না, আরেকটি নারীকে আমি ভালোবাসি—বলিনি? সেই নারী, সেই নারী—সে আর কেউ না—সে আমার—আমার মা—আমার মা!

নমিতা। তাই তুমি আমাকে বিয়ে করোনি? মাকে ভালোবাসো বলে'?

শৈলেশ্বর। তাই নমিতা তাই। বিয়ে করলে সমাজের কাছে গোষ্ঠীর কাছে, পরিবারের কাছে বাঁধা পড়তে হয়—তাই আমি বিয়ে

করিনি। আমার জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মার জন্যে প্রতীক্ষা করব, তবু কি মা আস্‌বেন না? মা আমাকে জীবন দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে নবজীবন দেব, এই হবে আমার প্রতিশোধ।

নমিতা। কিন্তু সমাজকেও আমাদের প্রতিশোধ দিতে হবে সে কথাটা যেন ভুলে যেয়োনা।

শৈলেশ্বর। না।—সে শোধ তুল্‌ব আমরা ছুজনে।

নমিতা। আমরা ছুজনে? হ্যাঁ, আমরা ছুজনেই ত!

শৈলেশ্বর। আমরা ছুজনে, এবং আমাদের ভাবী সন্তানেরা মিলে। বংশানুক্রমে আমাদের এই দেনাপাওনা মিটাতে হবে।

নমিতা। বংশানুক্রমে?—তাইত বটে? আমাদের এখান থেকে যাওয়া স্থির হোলো তাহলে? কিন্তু কোথায় গিয়ে আমরা বাস করব শৈলেশ?

শৈলেশ্বর। কোথায় আবার? এইখানে, এই সমাজের বুকে;—তার হাড় পাঁজরার মধ্যে ক্ষয়রোগের মত আমরা বাসা নেব।

নমিতা। কিন্তু ক্ষয়রোগ ত নয়, শৈলেশ, বিধাতার দেওয়া এ যে অক্ষয় রোগ,—এইত চিরদিনের স্বাস্থ্য।

শৈলেশ্বর। রোগই হোক, আর স্বাস্থ্যই হোক্‌—এই আমাদের পুঁজি! সমাজই আমাদের এই দিয়েচে, এই দিয়েই আমরা তাকে আক্রমণ করব।

নমিতা। এর সংঘর্ষে তার মৃত্যু হবে না শৈলেশ, সে নতুন জন্ম পাবে।

শৈলেশ্বর। পাবে কি পাবে না তা আমাদের ভাবনা নয়। যে প্রাসাদ থেকে বঞ্চিত করে' আমাদের মাকে তারা ধূলায় ঠাঁই দিলে,

আমাদের নিষ্কলঙ্ক ভাবী সন্তানদের জন্যে যে ধূলার আসন তারা পেতে রেখেচে—সেই ধূলাতেই তাদের সবাইকে টেনে আন্‌ব। সেই প্রাসাদের ভিত্তিমূলে হবে আমাদের আঘাত—একদিন তার উঁচু মাথা নিয়ে তাকেও সেই ধূলায় লুটিয়ে পড়তে হবে। হবেই।

নমিতা। সেদিন দেখতে পাব সেই প্রাসাদেরও অস্থিপঞ্জরে ছিল কেবল ধূলা! ধূলাই ছদ্মবেশে আপনাকে গোপন করে উঁচু মাথায় দাঁড়িয়েছিল, আজ ধূলায় ধূলা হয়ে মিশে গিয়ে নিজের সত্য পরিচয় পেল সে।

শৈলেশ্বর। তার পরিচয় তাকে দেওয়াই হবে আমাদের প্রতিশোধ নমিতা।

নমিতা। হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু কই তোমার মার ফটোটাতো আমাকে দেখালে না! সেই লকেটটা কোথায়?

শৈলেশ্বর। দেখবে—দেখবে নমিতা, দেখবে আমার মা-কে?

(জামার বোতাম খুলিয়া কণ্ঠ হইতে লকেটটা উন্মোচন করিলেন

মা আমার অসামান্যা রূপসী ছিলেন—এই ছাখো।

নমিতা (বিস্ময়-বেদনার চমকে)। এ যে আমার মা।

শৈলেশ্বর। য়্যাঁ? তোমার মা? নমিতা, নমিতা, তোমারও মা? (আনন্দে সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল) তুমি তবে আমার—

নমিতা (শৈলেশ্বরের মুখে হাত চাপা দিয়া)। না না, আমি তোমার—

শৈলেশ্বর (হাতখানি অত্যন্ত আদরে ধরিয়া)। তুমি আমার বোন—আমার সহোদরা। (নমিতার মাথাটি হাতের মধ্যে লইলেন]

সেদিনের সেই বিয়ের সন্ধ্যায় তুমি আমার কাছে কী চেয়েছিলে মনে পড়ে? একটি চুমো। আমি দিইনি, দিতে পারিনি।

(নমিতার ললাট চুম্বন করিলেন]

আজ আমি তাই দিয়ে আমার সহোদরাকে প্রথম অভিনন্দিত করলুম।

নমিতা (কাঁদিয়া ফেলিল)। একী হোলো—শৈলেশ—এ কী করলে!

(চোখের জল গোপন করিতে শৈলেশ ভিতরে গেলেন। কিঙ্কর সদর পথে ঢুকিল।)

কিঙ্কর। শৈলেশ কোথায়?

(কোনো জবাব না দিয়া নমিতা ভিতরে চলিয়া গেল। কিঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে শৈলেশ্বর আসিলেন।)

কিঙ্কর। এই যে শৈলেশ। সেই কথাটা—

শৈলেশ্বর (ম্লান হাসিয়া)। এখনো কি সেটা শেষ হয়নি ভাই?

কিঙ্কর। এ পর্যন্ত পাড়তে দিলে কই? এখন শোনো, এই হোষ্টেলে বিকাশ বলে একটি যুবক থাকে, আবার শেষাদ্রি নামে আজ তার এক বন্ধু এসেচে। এদের দুজনকে আমি গ্রেপ্তার করতে চাই। বল্‌তে গেলে এই জন্যই আমার এখানে আসা। তোমার ছাত্রদের ধরতে হলে—তোমাকে জানানো উচিত বলেই জানালুম।

শৈলেশ্বর। ও, বুঝেচি। কিন্তু গ্রেপ্তার না করলেই কি নয়?

কিঙ্কর। তুমি জানো না,—তারা বিপ্লববাদী। তাদের গ্রেপ্তার করবার আগে একবার হোষ্টেলটা সার্চ করতে চাই—হোষ্টেল মানে

কেবল বিকাশের ঘরটা। আমার মনে হয় তারা অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করেচে।

শৈলেশ্বর। সার্চ করে কিছু না পেলে ত তাদের গ্রেপ্তার করবে না? অনর্থক দুটি ছেলেকে প্রথম যৌবনেই কেন এমন সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেবে?

কিঙ্কর। না পেলে পরে সে বিবেচনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস পাবই। তাদের গ্রেপ্তার আর সার্চের ওয়ারেণ্টগুলো তুমি দেখ,—

(কতকগুলি কাগজ দেখাইল।

শৈলেশ্বর। অন্তত তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেচ দেখচি। ঐ সঙ্গে আমার খানাও বের করে ফেল—আছে নাকি সঙ্গে? বিপ্লবীদের আশ্রয় দিই, সেও ত কম অপরাধ নয়—পেনালকোডের পাতায় তারও একটা ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

কিঙ্কর। তুমি সঙ্গে এসো—খানাতল্লাসীর সাক্ষী হবে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু আরেকজন সাক্ষীও ত দরকার?

কিঙ্কর। তুমি এলেই হবে। তুমি একাই এক শ'!

শৈলেশ্বর (যাইতে যাইতে)। কিন্তু দেখ, তুমি কথা দিয়েচ, কিছু না পেলে ওদের অনর্থক ক্ষতি করবে না। তুমি আমার অনেকদিনের বন্ধু, তোমার কাছে এ-আশাটুকু আমি করতে পারি?

(উভয়ে ছাত্রমহলের ভিতরে গেল।

[কিছুক্ষণের বিরতি, কিন্তু পটক্ষেপ হবে না]

(অতসী উদ্বিগ্নমুখে প্রবেশ করিয়া টাইম্‌টেবলের পাতা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে অনিন্দ্যর প্রবেশ।)

অনিন্দ্য। দিদি!

অতসী (চোখ তুলিয়া চাহিল)। কিরে, তুই এখনো ঘুমুস্‌নি?

অনিন্দ্য। ঘুম পাচ্চে না যে। আজকের রাতটা যেন কিরকম! তুমি কী করচ দিদি?

অতসী। অনিন্দ্য, বিকাশবাবুর এক বন্ধু এসেচেন, দেখেচিস্‌?

অনিন্দ্য। কই না তো! কখন্‌ এলেন?

অতসী। বাইরে গিয়ে একবার ছ্যাখ্‌না, তিনি কী করচেন! দেখ্‌তে পেলে ডাকিস্‌, আর না পেলে বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করবি—

অনিন্দ্য (দুষ্টুমিভরা চোখে)। কিন্তু বাইরে যে বড্‌ডো হিম পড়চে দিদি! তোমরা যে বাইরে যেতে মানা করেচ।

অতসী। একবারটি গেলে কিচ্ছু হবেনা। লক্ষ্মিসোনা!

আনিন্দ্য। না দিদি, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে আমার।

অতসী। তবে তোকে যেতে হবে না—যাঃ!

অনিন্দ্য। না না, যাব বই কি, একবারটি যাব। চাঁদের আলোয় গা-ধোয়া হবে, অম্‌নি বিকাশদাকেও ডেকে আন্‌ব।

অতসী। না না, বিকাশবাবুকে নয়, তাঁর বন্ধুকে—বুঝিস্‌নে বোকা?

অনিন্দ্য (মাথা নাড়িয়া)। হ্যাঁ, বুঝিচি। এখন বলনা দিদি তুমি ওই বইখানিতে কী দেখছিলে?

অতসী। দেখ্‌ছিলুম দার্জিলিঙ মেল কখন্‌ এখান দিয়ে যায়।

অনিন্দ্য। (সাগ্রহে)। কখন্‌ যায় দিদি?

অতসী। আর ঘণ্টা দুই পরে যাবে।

অনিন্দ্য। আমি আজ নমিতাদির সঙ্গে দার্জিলিঙ্‌ যাব।

অতসী। শীতকালে দার্জিলিঙ্ কেউ যায় বোকা? আর নমিতাদি যে আজ যাবেন তোকে কে বল্লে?

অনিন্দ্য। আমি যদি তাঁকে সঙ্গে নিই আর কাকীমা বলে ডাকি তাহলেই নমিতাদি যাবেন। তা—আমি অনেক ভেবে চিন্তে রাজি হয়েচি।

অতসী। বটে? কিন্তু দাদা তোকে নমিতাদির সঙ্গে ছাড়বেন কেন?

অনিন্দ্য। সেইত হয়েচে ভাবনা। নমিতাদিকে যে কাকা মোটেই চেনেন না, কিন্তু নমিতাদি খুব ভালো লোক, নয় দিদি? আমার সঙ্গে দেখা করতে ইষ্টিশান থেকে এলেন, বেশ কিন্তু! আমার সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছে ভাবতে আমার বেশ লাগে।

অতসী। নমিতাদির সঙ্গে কেন দাদার আলাপ করিয়ে দে না!

অনিন্দ্য। সে সময় আর নেই দিদি, দার্জিলিঙ্ থেকে ঘুরে এসে এর পরে করিয়ে দেব। এখন আমি এই ভাবচি, নমিতাদির সঙ্গে ত কাকা আমায় যেতে দেবেন না, তার চেয়ে আমি যদি নমিতাদির আগেই ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকি—তা হলে কি ভালো হয় না দিদি? নমিতাদি এলে তখন দুজনেই এক সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়ব?

অতসী। নমিতাদি যেদিন যাবেন সেদিন না হয় তাই করিস্। এখন ঘুমুবি চল্।......আচ্ছা, অনিন্দ্য, কাল্ যদি তুই ঘুম থেকে উঠে দেখিস্ আমি নেই তোর খুব দুঃখু হবে?

অনিন্দ্য। আচ্ছা দিদি, তুমি যদি ঘুম থেকে উঠে ছাখো আমি নেই, তোমার মন কেমন করবে আমার জন্যে?

অতসী। করবে না? তোকে আমি কতো ভালোবাসি—

[তাহাকে চুম্বন করিল।

অনিন্দ্য। আমিও তোমাকে খুউব ভালোবাসি দিদি!—

[সেও অতসীকে চুমু দিল

কিন্তু আমি কাকাকেও ভালোবাসি আর নমিতাদিকেও ;—আচ্ছা নমিতাদির কী হয়েচে দিদি, বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদচেন খালি ?

অতসী। কাঁদচেন ? কাঁদচেন কিরে ?

অনিন্দ্য। হ্যাঁ, ভয়ানক! আমি জিজ্ঞেস করলুম, তিনি বল্লেন পেট কামড়াচ্চে তাই। আচ্ছা দিদি, বড় হলে' কি আর পেট কামড়ায় ? কাকার, কি তোমার তো কখনো কামড়ায় না ?

অতসী (ব্যস্ত হইয়া)। চল্ তো দেখিগে, কী হয়েচে।

(অতসী ও অনিন্দ্য অন্দরমহলের ভিতরে গেল। ছাত্রমহল হইতে শৈলেশ্বর ও কিঙ্কর আসিলেন, কিঙ্করের হাতে অতসীর হাতব্যাগ)

শৈলেশ্বর। যাকে বলে পর্বতের মূষিক-প্রসব!—যাক্, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল এতক্ষণে!

কিঙ্কর। এই ব্যাগ্‌টার ভেতরে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

(কিঙ্কর ব্যাগটাকে ভাঙ্গিয়া খুলিল। কাগজপত্রগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল)

কিঙ্কর। আরে, এ যে দেখ্‌ছি কতকগুলো প্রেমপত্র!

শৈলেশ্বর। বোধ হচ্ছে যেন তোমার উদ্দেশ্যে লেখা নয় ? প্রেমপাত্র তুমি নও যেন!

কিঙ্কর। নাঃ! আমি ভাব্‌ছি রিভলভার কার্টিজ এগুলো সব গেল কোথায় ?

শৈলেশ্বর। কাম্‌স্‌কাট্‌কা থেকে যা ওরা আমদানি করেছিল, লোপাট্‌কায় চালান দিয়েচে বোধহয়—

কিঙ্কর। একটা নোটবুক, কি নক্‌সা, কি নামের তালিকা কিচ্ছু নেই। একটা কিছু পেলেও যে চল্‌ত—

শৈলেশ্বর। অত্যন্ত পক্ষে একখানা গীতা কি গীতাঞ্জলি—!

কিঙ্কর। আর ফোড়ন কাটতে হবে না। (বাস্‌কেট্‌ হইতে খামখানা তুলিয়া) এই চিঠিখানা দেখেচ—ডাক্তারের কাছ থেকে এসেচে,—এসেচে অনেকক্ষণ।

শৈলেশ্বর। (ব্যস্তভাবে) তাই নাকি ? দেখি দেখি—

(খামখানা কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁর সমস্ত মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল।)

সর্বনাশ !—

কিঙ্কর। কি হয়েচে, কি—কি ?

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্যর থাইসিস্‌!—এক্‌স্‌রে ফোটোয় ধরা পড়েচে।

(বিভ্রান্তের মতন অন্দরমহলের ভিতরে চলিলেন। কিঙ্কর অনুসরণ করিল।

(অনিন্দ্য চোরের মত পা টিপিয়া বাহিরে আসিল, তাহার বগলে একটি ছোট্ট পুঁটুলি—তেমনি পা টিপিয়া চারিদিকে চাহিয়া চুপি চুপি সদর পথে বাহির হইয়া গেল।

(ক্ষণপরে সদর দ্বার দিয়া বিকাশ ব্যগ্রভাবে ঢুকিল ও জানালার সন্নিকটে গেল।

(পর মুহূর্তেই একটি থলিহাতে শেষাদ্রি জানালাপথে নামিয়া ঘরের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল।)

বিকাশ। তোমাকে কার্ণিশ বেয়ে নাম্‌তে দেখে আমার যা বুক কাঁপছিল—

শেষাদ্রি। বাড়ীটা বড্ড উঁচু।...এদিকে পুলিশে সব টের পেয়েছে, কিঙ্কর ওখানে গেছল। সে একটা আস্ত সি-আই-ডি।

বিকাশ। বল কি? তবে ত সর্বনাশ!

শেষাদ্রি। সে সমস্ত জান্‌তে পেরেচে, আমাদের ফাঁসাবার প্রমাণপত্র সব তার হাতে। অন্তত তার কথা শুনে তো তাই মনে হোলো...সে গেল কোথায়?

বিকাশ। একটু আগে এসেছিল, এখন কোথায় জানিনে। যাক্, এর মধ্যেই আমরা পালাতে পারব। পারব না? আমি মোটর তৈরি রেখেচি—। দরজাটা বন্দ করে দিই—কিন্তু কী ব্যাপার বল তো?

[সদর দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিল।

শেষাদ্রি। আর কি এখন ট্রেন ধরা যাবে?

বিকাশ। ষ্টেশন দিয়ে নয়, পুলিশ যখন জেনেচে তখন সেখানে ফাঁদ পাততে কি বাকী আছে? মোটরে করে' পুলের ধারের রাস্তা দিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ!—

শেষাদ্রি। বেশ তাই। কিন্তু অতসীকে খবর দিতে হয়—

বিকাশ। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আমি বলি—অতসীকে কাজ নেই এই হাঙ্গামার মধ্যে।

শেষাদ্রি। বারে! রাজকন্যা না মিললে অর্দ্ধেক রাজত্বও যে ফাঁকি!

বিকাশ। কিন্তু রাজকন্যা পেতে গেলে স্বয়ং রাজা পেয়ে বসবেন। তার হিসেব রাখো? রাজার আতিথ্য লাভের লোভ আমার একটুও নেই ভাই!

শেষাদ্রি। আরে এত ভয় কিসের? [রিভলভার দেখাইল] ইনি আছেন কিজন্যে? সীতা উদ্ধার করতে গেলে দশাননের মুণ্ডপাতে পেছলে চলে কখনো?

বিকাশ। থলিতে কি? টাকা?

শেষাদ্রি। এই ক'টি টাকা নিয়ে আমি ফিরবো? এতে কেবল মোহর—আসরফি—! প্রত্যেকটি মোহরে আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন মূর্ত্তিমান!

বিকাশ। বলকি! কার্যোদ্ধার তাহলে! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিলাম—।

শেষাদ্রি। দরকারই হয়নি। মহিমবাবু লোকটি ভারি ভদ্র।

বিকাশ। কিরকম? আগাগোড়া বলো, তো শুনি।

শেষাদ্রি। নর্দমার নল বেয়ে ত উঠলুম, তেতালায়; আস্তে আস্তে যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল তার পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। দেখি ভদ্রলোক এক গ্লাস ডাবের জল নিঃশেষ করে পাত্রটা খানসামার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, বল্লেন, দরকার হলে ডাকবেন।

বিকাশ। তারপর?

শেষাদ্রি। চাকরটা চলে গেল ; পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই, অনেকক্ষণ কাটল, দেখি ভদ্রলোকের ঘুমোবার নামটি নেই। শেল্‌ফ্‌ থেকে মোটা মোটা বই বের করছেন, পড়চেন, দাগ দিচ্ছেন, খাতায় লিখচেন—কেবল এই! আমি আর অপেক্ষা না করে' নিঃশব্দে রিভলভার হাতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিকাশ। তারপর—তারপর?

শেষাদ্রি। এলার্ম বেল্‌টা তাঁর হাতের কাছেই ছিল, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তেই টিপ্‌তে পারতেন, আর চাকরটা ছিলো পাশের ঘরেই—কিন্তু ওটা তিনি স্পর্শই করলেন না। আমাকে দেখে একটু হেসে বল্লেন, তুমি বুঝি স্বদেশী ডাকাতদের একজন? তাই না?

বিকাশ। তুমি কী বল্লে?

শেষাদ্রি। আমি যথারীতি রিভলভার উঁচিয়ে সিন্দুকের চাবি চাইলাম—তিনি একটুও ভয় পেলেন না। কেবল আরেকটু হেসে চাবিটা ফেলে দিলেন। সেই ঘরটিতে তিনটে সিন্দুক, আর তিনটে বইয়ের আল্‌মারি—

বিকাশ। তুমি তখন চাবি নিয়ে একটা সিন্দুক খুলে ফেল্লে আর থলে ভরতে মন দিলে?

শেষাদ্রি। মন দেব দেব করচি এমন সময়ে চাকরটা একখানা কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখে ত সে অবাক! কার্ডখানা দেখে তিনি নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন, আর আমায় বল্লেন, ওহে, তোমার একজন বন্ধুব্যক্তি আসচেন। এক পুলিশের কর্মচারী। তোমাকে হয়তো পছন্দ নাও করতে পারেন,—তুমি একটু ওই পর্দাটার আড়ালে দাঁড়াও।

বিকাশ। বলো কি হে? তারপর?

শেষাদ্রি। তারপর শেষাদ্রির নেপথ্যে অবস্থান, রঙ্গমঞ্চে কিঙ্করের প্রবেশ। তাকে দেখে আমি ত চমৎকৃত! বহুক্ষণ ধরে' ষড়যন্ত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে' মহিমবাবুকে ধনে প্রাণে রক্ষা করতে চাইলেন। তদুত্তরে মহিমবাবু ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করে বল্লেন, ধন্যবাদ, আপনার কষ্ট-স্বীকারের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এতদ্বারা আত্মরক্ষা করতে আমি অভ্যস্ত।—অগত্যা, ম্লানমুখে কিঙ্কর-বাবাজীর মহাপ্রস্থান!

বিকাশ। এবং তোমার পুনঃ প্রবেশ!

শেষাদ্রি। একটা সিন্দুক খুলে দেখি, অজস্র টাকা! একদম্ বোঝাই! যখন থলে ভরে নিয়েছি, ভদ্রলোক মৃদু হেসে আরেকটা সিন্দুক দেখিয়ে বল্লেন, ওটা খুল্‌লে কেবল মোহর পেতে, আর তাতে বোধহয় তোমার কিছু সুবিধা হোতো!

বিকাশ। তাই না কি? ভদ্রলোক তাই বল্লেন?

শেষাদ্রি। হ্যাঁ, তারপরে আমার রিভলভারটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন, শেষে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটু হেসে বল্লেন, এপথে দেশের মুক্তি হবে না, ত্রিশকোটী লোক এক সঙ্গে চল্‌তে পারে এত বড় পথ চাই।—এই বলে' মোটা বইখানা টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়তে লাগ্‌লেন।

বিকাশ। আশ্চর্য ত! তুমি কি করলে তারপর?

শেষাদ্রি। আমি আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাক্‌লুম। তারপরে নমস্কার করে বল্লুম—তবে আসি। তিনি শুন্‌তে পেলেন না বোধহয়,—বই নিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন। আমি চলে এলুম।

বিকাশ। বল কি হে? এ যে আরব্য উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়। সেই সব উপকথার দিন কি ফিরে এলো নাকি হে!

(রিভলভার হাতে কিঙ্কর অন্দরমহল হইতে আসিল।

কিঙ্কর। ফিরে এল বই কি বিকাশ! আলাদীনের প্রথম প্রদীপটা ঘষলে ধনরত্ন আস্‌তে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রদীপে খালি দৈত্য! এখন উপকথার সেই দৈত্যের আবির্ভাব!

(সদর দ্বারের অর্গল মোচন করিল

বিকাশ। আপনি? আপনি ভেতরে ছিলেন?

কিঙ্কর। তুমি শেষাদ্রি, আর তুমি বিকাশ, তোমাদের দুজনকেই আমি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম। ওয়ারেন্ট আমার সঙ্গেই আছে—

বিকাশ। (আত্মগত)। কারাগার—নির্বাসন!...(হাসিবার ভঙ্গীতে) চরম পরিপূর্ণতা—! আর কী চাই?

(শেষাদ্রি এতক্ষণ কি করিবে ঠিক পাইতেছিল না, এখন মোহরের থলিটা মেঝের মাঝখানে ছুঁড়িয়া ফেলিল; মোহরগুলি ঝম্ ঝম্ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেই—কিঙ্করের বিস্মিত দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইবার অবসরে—শেষাদ্রি নিজের রিভলভার বাহির করিয়া কিঙ্করের ললাট লক্ষ্য করিয়াছে।

শেষাদ্রি। আমার জন্যে হাতকড়ি বা কারাগার এখনো তৈরি হয়নি। আমি মেরে মরব।

(মোহরের ঝনৎকার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নমিতা ও অতসী প্রবেশ করিল।—অতসী স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।—নমিতা গিয়া শেষাদ্রিকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইল।

নমিতা। (কিঙ্করকে)। ওগো, এ যে আমার ভাই! এই শিরীষ!—

কিঙ্কর। (বিস্মিত)। এই শিরীষ?—একেই ধরতে বেরিয়েছি, এই ডাকাতটিকে!—

(একটু থামিয়া

নমিতা, কতদিন যে তোমার হারানো ভাইকে খুঁজে আনতে বলেছিলে, এইবার এতদিনে তাকে ধরে দিয়েচি। কিন্তু—

(হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আমার brother-in-lawই বটে।

[রিভলভার নামাইল।

শেষাদ্রি। দিদি, তোমার স্বামী?

[রিভলভার ফেলিয়া দিল।

বিকাশ। Brother-in-Law, না, Brother-out-Law?

নমিতা। শিরীষ, ভাই, আমার মাথা খেতে কেন একাজ করলি?

[শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর। এ কী?—শিরীষ,—কে শিরীষ? শিরীষ বলে কাকে তুমি ডাক্‌লে নমিতা?

নমিতা। এই যে—আমার সেই ভাইটি!

[শেষাদ্রিকে দেখাইল।

শৈলেশ্বর। এই—এই আমার ভাই? আমার সহোদর? এই সুদর্শন সুঠাম স্বেচ্ছাচারী যুবক! এই আমাদের ভাই, নমিতা? (কিঙ্করকে) তুমি বুঝি একে ধরেচ? কিন্তু এ ত শৃঙ্খলে বাঁধবার নয়, এযে বাহুডোরে বাঁধবার।

কিঙ্কর। কিন্তু তোমরা আমাকে বিপদে ফেল্‌লে! একদিকে

His Majesty, অন্যদিকে Her Majesty—সমস্যা আমার কোনোদিকেই কম নয়,—আমি এখন কী করি?

শৈলেশ্বর। Ladys' first! কি করবে আবার? যা করতে হয়—মধুরেণ সমাপয়েৎ! তাই করো।

কিঙ্কর। সমাপ্তিটা আমার হাতেই নির্ভর করচে কিনা! তোমরা বোঝোনা, দেশে যে বিরাট শাসনযন্ত্র চল্‌চে আমি তার একটি চাকামাত্র। নিজের ইচ্ছায় চলবার যো কি আছে আমার!

নমিতা। কেন এ সর্বনাশ করলি, ভাই!

কিঙ্কর। এ মন্থনে ত দেখা যাচ্চে চিরদিন কেবল গরলই উঠ্‌চে। বারম্বার কেন এ সব তবে?

শেষাদ্রি। গরল উঠ্‌চে সে গরল আমরা নিজেরাই পান করচি। কিন্তু যদি কোনোদিন অমৃত ওঠে তার অধিকারী হবে আমার সমস্ত দেশবাসী।

নমিতা (কিঙ্করের কাছে নতজানু হইয়া)। তুমি এদের ছেড়ে দাও। এতদিন পরে আমার ভাইটিকে পেলুম—

কিঙ্কর। আমি ছেড়ে দিচ্চি, কিন্তু ছেড়ে দেওয়া বোধকরি আর আমার হাতে অপেক্ষা করে' নেই।—

শেষাদ্রি। আমরা এখনো পালাতে পারি—

বিকাশ। বাইরে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে—

কিঙ্কর। কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে আরো অনেক। এর মধ্যে পুলিস পাহারোলা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে, পুলিসসাহেবও হয়তো এসে পড়লেন বলে'।

[ঘড়ি খুলিয়া দেখিল।

বিকাশ (হতাশভাবে)। তবে পাক্কা দশবছর! শেষাদ্রি, বলি, শিরীষ—সেই যে কবিতাটা আমরা খুব উৎফুল্ল হয়ে আবৃত্তি করতাম, সেটা যে আমাদের জীবনেই এত কঠোর সত্য হয়ে দেখা দেবে কে ভেবেছিল! সেই যে—কোন্ কবির রচনা হে!—

"নির্বাসনের দণ্ড শিরে তাঁহারি জয় গান গাহো,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙো হেঁইয়া হো!"

শেষাদ্রি। অতসী, বিদায়! চিরবিদায়!

অতসী। আমি প্রতীক্ষা করব, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি এসো, ফিরে এসো।

শেষাদ্রি (ম্লান হাসিয়া)। হ্যাঁ, যদি কখনো ফিরে আসি—

নমিতা (কাঁদিতে কাঁদিতে)। শিরীষ—ভাই—!

শেষাদ্রি। বিদায়—দিদি!

[ডাক্তার সদর দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

ডাক্তার। ইস্, বাইরে এত পুলিস কেন?

শৈলেশ্বর। এই যে ডাক্তার!—আমার অনিন্দ্যকে তুমি বাঁচাও!

ডাক্তার। হুঁ, তার কথাই বলতে এসেছি। এখানে আসবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, দেখি, অনিন্দ্য এত রাত্রে রাস্তা দিয়ে চলেছে—একলা হন্ হন্ করে'—বগলে একটা ছোট্ট পুঁটুলি।—

শৈলেশ্বর (ব্যস্ত হইয়া)। অনিন্দ্য রাস্তায়? এত রাত্রে? এই হিমে?

ডাক্তার। আমি ধরে জিজ্ঞেস্ করলুম, কোথায় যাচ্চো অনিন্দ্য? সে বল্লে—দার্জিলিঙ্। তারপর চুপি চুপি বল্লে, কাকাকে বলবেন না যেন, আমি সেখান থেকে সবাইকে খবর দেব। আমি বল্লুম, কাল

যাবে, এখন আমার সঙ্গে ফিরে চলো। সেও কিছুতে শোনে না—আমিও তাকে ছাড়ি না—

শৈলেশ্বর। যাক্, তাকে ধরে এনেচ ত? ধন্যবাদ ডাক্তার!—সে কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝি? তার কোনো ভয় নেই, আমি তাকে কিচ্ছু বল্‌ব না। ডাকো তাকে।

ডাক্তার। সে দার্জিলিঙ্‌ চলে গেছে, শৈলেশ! এই হিমের রাত্রেই সে যাত্রা করেছে।

শৈলেশ্বর। চলে গেছে? আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল? তবে যে তুমি বল্লে তাকে ধরে এনেচ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাকে ধরেও এনেচি—তাও বটে!

শৈলেশ্বর। ডাক্তার, ডাক্তার,—তুমি কি বল্‌চ? তুমি কি—?

ডাক্তার। আমি তাকে কিছুতেই যেতে দিইনি, খুব শক্ত করেই ধরেছিলুম। হঠাৎ কেমন করে' আমার হাত ফস্‌কে এক দৌড়ে যেমন সে রাস্তা পেরুতে যাবে, উল্‌টো দিক থেকে একখানা মোটর—

শৈলেশ্বর (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে)। আর অনিন্দ্য—অনিন্দ্য?…

ডাক্তার। অনিন্দ্য তার চাকার নীচে।—

বিকাশ (আত্মগত)। চা—কা—র—নী—চে!—

শৈলেশ্বর (আর্ত কণ্ঠে)। অনিন্দ্য!—

ডাক্তার। আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না।—কচি বুক, আর ভারী চাকা!—এই যে তারা আস্‌চে।

[অনিন্দ্যকে বহন করিয়া দুই ব্যক্তি ঢুকিল। রক্ত ও কাদায় মাখামাখি দেহ।

ডাক্তার। পুঁটলিটি তেমনি বগলে।…দেখি কী আছে।

[পুঁটুলি খুলিতে একখানা জামা ও কাপড় ও একটা বই বাহির হইল।] দার্জিলিঙে ব্যবহারের গরম পোষাক বটে। আর এখানা ত দেখ্‌চি একটা নভেল।

বিকাশ। "শ্রীকান্ত"!—

শৈলেশ্বর। (উর্দ্ধে হস্তোৎক্ষেপ করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গীতে) এর পর যেন ও কাঠুরের ছেলে হয়েই জন্মায়! এরপর যেন ও বিশ্বজয় করে।

[বেদনায় মূর্ছিতের মত বসিয়া পড়িলেন—সকলে স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে অদূরে মোটর আসিয়া দাঁড়ানোর অশ্রান্ত গর্জন]

ডাক্তার। (জানালার বাহিরে চাহিয়া) একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েচে। প্রকাণ্ড মোটর।

[মোটরের সার্চ-লাইটের অত্যুজ্জ্বল আলো জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিল।

কিঙ্কর। পুলিশ সাহেব এসে পড়েছেন—তাঁরি গাড়ির আলো।

শৈলেশ্বর (যেন জাগিয়া)। যে অন্ধকার। কোথায় আলো অতসী, কোথায় আলো?

—য ব নি কা—

সংশোধনী

এই নাটিকাটির মধ্যে (বইয়ের ২১২ পৃঃ [illegible]) একটি মারাত্মক প্রুফের ভুল রয়ে গেছে। উল্লিখিত পৃষ্ঠার শেষ ইনে কিছুদিনের বিরতি-র স্থলে কিছুক্ষণের বিরতি হবে। নাটিকাটি অভিনয় করতে যতখানি সময় লাগে, এর ঘটনাগুলিও প্রায় সেই য়টুকুর মধ্যেই ঘটেছে বলে' ধরতে হবে।

সময়নিষ্ঠ

সময়ের কারুকার্য শ্রীহস্তে তোমার।
যে-হাতে ফোটাও ফুল, পাহাড় বানাও,
মরুভূমি করো যে শ্যামল।
হিংসুটে, বিচ্ছিরি আর ব্যর্থ ও বেকুবে
যেভাবে সার্থক করো,
করো সুন্দর।
মুমূর্ষুরে মুক্ত করো নবীন জীবনে—
প্রাণহীনে নব প্রাণে—প্রেমে।
তোমার সময় আর আমার সময়
কি করে' যে এক করে' দাও।
তোমার আমার ভালোবাসা
এক পাত্রে কি করে' মেলাও!
আমার আশ্চর্য লাগে!

একটি মায়ার কাঠি—আদরের যাদু
কেবল তোমার হাতে :
সময়ের হাড়॥

কালক্রম

সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে এই যে
তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই ;
কিছুমাত্র তাড়া নেই তোমার কোনো কিছুতেই।
কত যুদ্ধ, বিগ্রহ, অশান্তি, উপদ্রব—
কত হাহাকার, মড়ক, মন্বন্তর—আর মারী—
কত চক্র আর চক্রান্ত,—
ফুলের মত যারা ফুটতে পারত—
হয়ত বা ফুটেছিল—
কতো যে তাদের দলে দলে ঝরে পড়া—
অকাতরে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কতই না!
কিন্তু তোমার কোনো গরজ নেই গর্জন করে' আসবার

আমরা দুশ্চিন্তায় জরো জরো,
ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরো মরো—
কিন্তু তুমি একটির পর একটি দল মেলে চলেছ
তোমার মহাজীবন-পদ্মের
নিজের মনে—আপনার অপার লীলায়।
অফুরন্ত সময় তোমার হাতে, অনন্ত তোমার অবকাশ—
তোমার হাতের চাকা ঘুরছে ধীর মন্থর গতিতে।

কিন্তু—কিন্তু কী তার ঘূর্ণাবেগ!
দেখতে না দেখতে উড়ে যাচ্ছে শতাব্দীরা—
মিলিয়ে যাচ্ছে সম্রাটদের মুকুট—
কতো নক্ষত্রের আলো যাচ্ছে ফুরিয়ে—
আর তোমার হাতের মহাপদ্ম—
পৃথিবীর এই মানুষ—
মানুষের এই জীবন—
সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে দলে দলে।

আর আমরা? এক জন্মে লক্ষ জন্ম যাপন করছি—
এক জীবনে অযুত জীবন—
এক মুহূর্তে পরম চেতনা—
পলকের পরমায়ুজীবী আমরা।

তোমার এই অফুরন্ত কালস্রোত—
বলো, এ কি আমারো সময়?
তোমার এই সীমাহীন পরিবেশ—
এ কি হতে পারে আমারো অবকাশ?

তুমিই জানো॥

মিরাক্‌ল্‌

দুঃখকেই অনেক কষ্টে পেতে হয়, বহুৎ সাধ্যসাধনা করে'।
সুখ তো আপনিই আসে।
শতদলের মতো সহজেই ফোটে জীবনের সরোবরে আনন্দ।
কিন্তু কতো না পরিশ্রমে দুঃখের কবর খুঁড়ি—
কতো মাথা খাটিয়ে আর মানুষকে খাটিয়ে—
নিজেকে এবং অপরদের তাতে সমাহিত করতে।
কুশ্রী আর কদর্যতার অন্বেষণে বেরুতে হয়—
কিম্বা হয়ত তারা আশেপাশেই থাকে—
তবু কখনো তারা কারো গায়ে পড়েনা
অভ্যর্থনা করে' না আনলে।
কিন্তু রূপ? সে তো নিজেই বেরিয়েছে অভিসারে—
বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ের অভিযানে বিজয়িনীর মতো;
বেরিয়েছে দিগ্বিদিকে, বেরিয়েছে নানা রূপে:
তার সাম্‌নে কেবল আত্মসমর্পণ করলেই তো হয়।
কতো চেষ্টা করেই না মৃত্যুকে আমরা ডাকি—
অপমৃত্যুকে ডেকে আনি—
কতো না চক্রান্তে, কতো না আত্ম-অস্বীকারে—
কিন্তু অমৃত এগিয়ে আসে, আলোর মত, আপনা থেকেই—
তার অঞ্জলি পূর্ণ করে' মুক্তহাতে।

আর তোমাকে ?   তোমাকে তো ডাকতেও হয় না।
তুমিই আমাদের ডাকছো অনুক্ষণ—অনন্তকাল ধরে'।
কান পাতলেই শোনা যায় তোমার ডাক,
শুধু তার সাড়া দিলেই হয়।
তোমার দিকে এক পা এগুলে একশ পা তুমি এগিয়ে আসো।
তবু দ্যাখো, কতো না ষড়যন্ত্রে নিজেদের আমরা ব্যর্থ করি—
ব্যর্থ করি—বৃদ্ধ করি—নিষ্ফল ও নিরর্থক করি—
আহত এবং নিহত করি কতো না পাকচক্রে।
তোমার কাছে চাইলেই মেলে (না চাইতেই পাই),
তবু চাই না কখনো।
অম্‌নি পেলে অবহেলায় ফেলে দিই।
তুমি তো তা দ্যাখো, কিন্তু তোমার কি দেখে হাসি পায় ?

সুখ, আনন্দ, অমৃত
আমার কাছে মিরাক্‌ল্ নয়—
মিরাক্‌ল্ নয় রূপ আর পরিপূর্ণতা।
আমার কাছে মিরাকল্,
এই দুঃখ আর দারিদ্র আর এই কুশ্রীতা ;
এই ব্যর্থতা আর এই বার্দ্ধক্য ;
এই রোগব্যাধি, জরা-মরণ আর অজ্ঞান ;
এই আত্মহনন আর অপরকে হানা—পরস্পর হানাহানি ;
এই আত্মপর-নির্বিভেদে বঞ্চনা—
এ-ই আমার আছে বিস্ময়কর।

তুমি আছো—তোমার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে
আমাদের বিলিয়ে দেবার ব্যগ্রতায় উন্মুখ ঃ
আর এরাও আছে ঃ
পাশাপাশিই রয়েছে ঃ
এইটেই আমার কাছে আশ্চর্য।
তোমার সুরধুনি বয়ে চলেছে
আমাদের দেহমন আর জীবনের ভেতর দিয়ে,
তবুও সুর, সুরভি আর সুষমা
সবচেয়ে সহজ হয়েও সুলভ হয় না কেন ?
এর চেয়ে পরমাশ্চর্য কী আছে আর ?
মিরাক্‌লের দিন, হায়, এখনো বুঝি ফুরায়নি !

সুন্দর

ঘাতককেও অপেক্ষা করতে হয়
বধ্যের জন্য ওৎ পেতে গোপনে।
সূর্যকেও অপেক্ষা করতে হয়
রাত্রি-প্রভাতের প্রত্যাশায়।
সত্যও অপেক্ষা করে' থাকে
আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে'।
প্রেম জেগে থাকে অনির্দিষ্ট কাল
শুভদৃষ্টির ভরসা নিয়ে।

মৃত্যুও অপেক্ষা করে দিন গুণে'।
এমন কি তুমি—তোমাকেও প্রতীক্ষা করতে হয়
অনন্তকাল ধরে—
আমার উন্মুখ হওয়ার মুখ চেয়ে।
ত্রিভুবনে কেবল একজন অপেক্ষা করে না—
সব সময়েই তার সংক্রমণ—
প্রতিমুহূর্তেই তার বৈজয়ন্তী উড়ছে :
সে সুন্দর।
সে অপেক্ষা করে না তার প্রিয়পাত্রর জন্যও—
এমন কি, নিজের জন্যও নয়—
নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে সে চলে যায়,
এমন কি, নিজেকে ছেড়ে ছেড়েই সে চলে—
প্রাণে বেঁচে থাকতেই চলে' যায় সে—
নিজদেহের যৌবরাজ্য ত্যাগ করেই।
এ-ই দেখি তার সংক্রান্তি, এ-ই সমাপ্তি, এ-ই তার দেহান্তর-লাভ
কারো মুখাপেক্ষা তার নেই।
এমনকি, কারো চুম্বনের জন্যও নয়।

তুমি চিরন্তন।—
কিন্তু তোমার সুন্দর ক্ষণভঙ্গুর।—
(ও কি তোমারই সৌন্দর্য ?)
সমস্ত ছাড়তে পারি তোমার জন্য,
কিন্তু সুন্দরের জন্য তোমকেও বুঝি ছাড়া যায়।

সুন্দরের অভিসারে

কিন্তু তোমাকে ভুললে সুন্দরকেও ভুলি বুঝি—
ভুল বুঝি হয়ত বা—
তোমাকে ছাড়লে সুন্দরকেও ছেড়ে যাই।
সুন্দরের আঁচল ধরে' যেতে যেতে
সৌন্দর্যকে হারাই কখন্ যে!
প্রদীপ তো আলো নয়—তার শিখাই আলো ঃ
কিন্তু আলোকে ফেলে দীপকেই ভালোবাসি হয়ত কখন্।
দীপদানকেও ভালো লাগে ক্রমে ক্রমে।
মধুর চেয়ে মধুর পাত্রকেই মিষ্টি লাগতে থাকে।
রূপের অনুসরণে রস—
রসের অন্বেষণে গন্ধকেই রস বলে' রূপ বলে' ভ্রম হয়—
সুরভির টানকে সুর বলে' ভাবি।
সুরাকে সোমরস।
আস্তে আস্তে স্পর্শসুখকেই স্বর্গসুখ বলে'
জ্ঞান করি কোনোদিন।
স্পর্শময়ীকেই রূপময়ী বলে' মনে হয়।

চোখ ইন্দ্র।
রূপের অহল্যাকেই খুঁজে ফেরে দিনরাত।
কিন্তু সহস্রাক্ষ হলেই কি খুঁজে পাওয়া যায় রূপকে ?
অপরূপকে ?—

অহল্যাকে পেতে গিয়ে তার প্রস্তরমূর্তি পাই।
ইন্দ্রের পিছু পিছু আসে ইন্দ্রিয়রা—
আরো যতো অনুচর!
তাদের দিয়ে
প্রস্তরময়ী স্পর্শকেই খোদাই করে'
মনের মত প্রতিমা করে' গড়ে তুলতে চাই বুঝি তখন?
পাথরের পরশকেই পরশপাথর বলে' ভ্রম করতে থাকি!

স্পর্শের পরে শব্দ!
তার পরে কেবল শব্দের শবাধারে খুঁজি সৌন্দর্য—
আর্টে আর কাব্যে—
সাহিত্যে আর শিল্পকলায়—
রূপ যেখানে রঙ্ হয়ে—সুর যেখানে শব্দ হয়ে নেমেছে:
শব্দরূপের মধ্যে সুন্দরের রূপ!
শব্দ-অর্থ-গন্ধ মিশিয়ে রূপের ব্যঞ্জনা:
রসের রসায়ন:
রসায়ন কিম্বা রসাতল কে জানে!
(রসায়ন থেকে রসাতল কতই বা দূর আর?)
তারপরেই তো শব্দে আর অর্থে মিশিয়ে গড়ি
আরেক মিশ্রণ:
রাজনীতি আর অর্থনীতি—
দর্শন পুরাণ আর আইনকানুন।
অবশেষে অর্থ: বিশুদ্ধ অর্থই বুঝি অবশেষে!

অর্থের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে
বিষয় আর বিলাসের মধ্যেই সুষমা খুঁজে বেড়াই।
অর্থে আর অনর্থে মিশিয়ে
বানাই কল আর কারখানা—
প্রাসাদময়ী নগরী আর নগরময় বস্তি—
সাম্রাজ্য আর উপনিবেশ।

শেষে থাকে অনর্থ।
অনর্থ আর নিরর্থকতা।
কদর্যতা, জীবন্মৃতি আর অপঘাত।
তিলে তিলে পলে পলে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া—
নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যক্ষ্মারুগীর মতন।
আর থাকে আত্মঘাত—
আত্মঘাত ও আত্মীয়হনন—
অন্য-হনন আর অগণ্য হনন—
ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধ—
তার মধ্যেই পাই আমার অনন্যসুন্দরকে।

কিন্তু তুমি—তুমি তখন কোথায়?
আর কোথায় তোমার সুন্দর?

অপ্রস্তত

তুমি এসেছিলে অনেক রূপে অনেকবার।
কিন্তু আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

অর্ধ ইচ্ছায়, বিরুদ্ধ ইচ্ছায়,
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জড়িয়ে
একটুও সামর্থ্য ছিল না আমার
এগিয়ে গিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করে' আনতে।

আমার আবরণ আমাকে ঘিরে রেখেছিল,
তোমায় বুঝি বরণ করতে দেয়নি।

আজ আবার তুমি এসেছ—
তুমিই এসেছ প্রস্তুত হয়ে।
আর আমি? আমি তো চিরদিনই অপ্রস্তুত!

আমার আবরণ ভেঙে তুমিই কি আমাকে বরণ করে' নেবে?
আমার মুখোস্ খুলে ফেলে দেখবে তুমি আমার মুখ?

আর দেখতে দেবে কি আমাকেও—
আমার আসল চেহারা—
তোমার ঐ উজ্জ্বল চোখের আয়নায়?

সম্ভাবনা

সেইখানে আছে সম্ভাবনা—
আমাদের সকলের—
তোমার আমার।

যে অদ্ভুত আশ্চর্য কলায়
আলকাতরা বদ্‌লায় রঙে,
রঙে আর সুরভি-নির্যাসে,
সেইরূপ কোনো এক অদ্ভুত নিয়মে
তোমার আমার রূপান্তর
হয়তো রয়েছে।

অক্লান্ত চেষ্টায় আর আপনার বলে—
ক্রিয়ায়, কৌশলে,
আর, সাধ্য-সাধনায়—
আজকের কাতরতা থেকে
হয়তো আমরা যেতে পারি—
যেতে পারি এই আমরাও—
অন্য অমরায়—অন্য এক
সুরভিত প্রভার জগতে
কোনো এক অপূর্ব প্রভাতে।

এ ছাড়াও আরেক বিস্ময়
আছে বুঝি তোমার আমার।
কোনো চেষ্টা, কর্মকলা, সাধনায় নয়—
যোগে নয়, উদ্যোগেও নহে,
ক্ষুরধার দূর পথে দুঃখভোগে নয়,
নয় কোনো সুদুশ্চর উগ্র তপস্যায়—
ঐকান্তিক কামনায় নহে!

ভাবনার সীমানার পারে—
নিয়ম-লঙ্ঘন-করা কোনো এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে
রয়েছে আরেক সম্ভাবনা—
হয় তো বা মোদের সবার।

আপনার কণ্টকিত পথে
ছন্দহীন বাধবাধ-গতি—
বিশ্রী বাহানার—
শুঁয়োপোকা যেই অকৌশলে
হয় প্রজাপতি
ঝল্‌মলে উড়ন্ত ডানার;
কোনো বিধি—কিছু না মানার
পথ ধরে'—অমোঘ নিয়তি!—
একান্ত নিজের অগোচরে।

অপ্রার্থনার
অত্যন্ত সহজে, আর,
কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের বরে।

অযোনি-সম্ভব-রূপান্তর—
সেই যে পরম সম্ভাবনা
সকলের—তোমার আমার ॥

তথাস্তু

তুমি তো বাসিয়াছিলে ভালো।
তুমি তাই ইচ্ছা করেছিলে
আমরাও কিছু ইচ্ছা করি।
অম্‌নি না, চেয়ে চেয়ে পাবো।
আমরাও একটু ফলাবো
আমাদের আয়নায় ধরি'
তোমার ইচ্ছার ঐ আলো।
কিন্তু মোরা দশচক্রে মিলে,
আঁধারের আলেয়াকে চুমি—
অমৃতে বানাই মরুভূমি—

ইচ্ছামৃত্যু বর দিলে তুমি,
মৃত্যু-ইচ্ছা হয়ে তা দাঁড়ালো!

আমাদের ইচ্ছারূপ ধরি'
তোমার স্নেহ কি বদ্‌লালো?

তোমার আঁক

আমি জানি সমস্ত আঁকই মিলে যাবে একদিন,
তোমার অঙ্কে এসে মিলে যাবে শেষটায়—
সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে মেশে।
সব সীমারেখা আকাশে।
সমস্ত যোগের ভুল আর বিয়োগের গোলমাল,
যতো না গুণফল আর ভাগের গরমিল,
যা কিছু মিলল না আর যা নাকি ফাজিল্ থেকে গেল,
আর যতকিছু গোঁজামিল দিলাম—
সবারই অর্থ পাওয়া যাবে একদিন,
সমস্তই মিলে যাবে অবশেষে।
আমি জানি।

যে সব আলোরা তোমার থেকে ছাড়া পায়,
আলেয়ার মত হয়ে দেখা দেয় নাকি
তারা কখনো কখনো ?
তারাও কি হারায় না পথ ? আর
পথহারা করে না অপরকে ?
কিন্তু হারায় কি তারা কেউ ?

সমস্ত আলোই ফের তোমার কাছে ফিরে আসে।
ছাড়বার পাত্র তুমি নও, হায়, কাউকেই।
তোমার কোল থেকে কেউ কখনো হারায় না :
তোমার অঙ্কে সবাই এসে মিলে যায়।

আশ্চর্য তোমার নিজের আঁক—
আর আশ্চর্য তার কষবার নিয়ম—
সব গরমিল আর গোঁজামিল কি করে' যে তুমি মেলাও!
কিন্তু তুমি মেলাবেই, আমি জানি,
তোমার আশ্চর্য সহজ কৌশলে!
তাই বসিয়েছি আমাদের ভুলের মেলা,
যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের কুরুক্ষেত্র,
প্রত্যেক যোগে গোলোযোগ আর প্রত্যেক গুণে গলদ্—
আমাদের খাতার প্রত্যেকটি পাতায়।
নিশ্চিন্ত আছি, তুমিই এসে কষে' দেবে—
তোমার আঁক তুমিই শেখাবে একদিন॥

কুমারী স্বর্ণলতার স্বয়ম্বর !

কুমারী স্বর্ণলতাকে আমরা কুমারী বলতে বাধ্য হলেও স্বর্ণলতা বুঝি বলা যায় না। আবলুস কাঠের মত চেহারা ব্যজস্তুতিতে বুঝি বা সোনার পাথর বাটিকেও হার মানায়। কেবল নাম-রূপের বৈলক্ষণ্যই নয়, স্বর্ণলতার বয়সটাও কৌমার্যদশার ভেতর দিয়ে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে—উত্তর-তিরিশ কবে পেরিয়ে হয়ত বা চল্লিশের বরাবরই হবে।

বেঁটে খাটো স্বর্ণলতাকে মোটা সোটা না বলা গেলেও নেহাৎ ক্ষীণাঙ্গী বলাও কঠিন। মাথার চুল আলগোছে বাঁধা—ঠিক খোঁপার মত করে' নয়। পরণের শাড়ীটিকেও খুব সৌখীন বলা চলে না। কিন্তু বাহিরটা যতই গদ্যময় হোক না, নের ভেতরটা ওর সদাই গদগদ। অন্তরে ও রোম্যান্টিক,—সব মিলিয়ে স্বর্ণলতা একটি আস্ত গদ্য কবিতা।

"মাকালী, কোনো সুশ্রী চেহারার বড়লোকের ছেলের সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়।" কলেজে পড়তে এই ছিল ওর মনের কামনা।

কলেজ ছাড়বার পর প্রার্থনাটা একটু বদ্‌লালো। "বড়লোক না হলেও চলবে, ছেলেটি যেন বেশ সুশ্রী হয়।" তাহলেই সে খুসি।

পঁচিশ বছর পেরুবার পর স্বর্ণলতা দাবীটাকে আরো একটু খাটো

করে আনল। "সুশ্রীও চাইনা, বড়লোকও চাইনে, কেবল কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হলেই বাধিত হই।" স্বর্ণলতার আর্জিটা হোলো তখন এই রকম।

ত্রিশে পৌঁছে স্বর্ণলতা বিবাহের দাবীটাও বাদ ছিল। কেবল একটি প্রণয়ী পেলেই ওর চলে যায়, মাকালী যদি কোনো গতিকে সেরূপ কোনো সুরাহা করতে পারেন তাহলেই সে কৃতার্থ হবে। কিন্তু এতকাল অপেক্ষা করেও বিধাতার তেমন কোনো মতিগতি না দেখে, অবশেষে পঁয়ত্রিশ পার হয়ে, স্বর্ণলতা হাল ছেড়ে দিল। মাকালীকে তার মাকালের মতই অসার জ্ঞান হতে লাগল। মাকাল না হলেও মা যে কালা সে বিষয়ে তার সন্দেহমাত্র রইলো না।

কিম্বা হয়তো প্রণয়ী লাভ করার মতো যোগ্যতাও তার নেই, সে ভাবল। যতখানি মানসিক বিনয় থাকলে বিধাতার কৃপালাভ করা যায় তা বোধহয় তার ছিল না। অতি বরন্তী না পায় বর— অতটা বর্বরতা হয়ত বিধাতার বরদাস্ত নয়। যে সময়ে যেটি চাইলে তার পক্ষে সঙ্গত ও শোভন হোতো তার চেয়ে বাড়িয়ে চাইতে গিয়েই হয়ত তার এই বাড়ন্ত দশা। প্রথম যৌবনে শুধু একটি মাত্র বর চাইলেই বোধহয় যথেষ্ট ছিল। সেই সাথে সেই বরটিকে সোনার তবকে আর রূপোর পাতে মুড়ে পাবার বাসনা জানানোটা হয়ত তার উচিত হয়নি। রূপবান ও ধনবান এই দুটি বিশেষণে তেমন জোর না দিলে, এবং তার বরণীয়তার অতখানি ওজোর না করলে, নির্বিশেষ একটি প্রণয়পাত্র পাওয়া কি খুব কঠিন ছিল তখন? আজ চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছে এই সব প্রশ্নপীড়িত স্বর্ণলতার মনে হয়, যৌবন ত প্রায় গেছেই, জীবনটাও বুঝি এবার যায়—বিফলেই যায়।

তাই সাহিত্যের মারফতে ধাবমান সময়কে ধরে বেঁধে যতটুকু সার্থক করা চলে সেদিকে স্বর্ণলতার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। উপন্যাসের ভেতর দিয়ে রোমান্সের ক্ষুধা যথাসাধ্য সে মিটিয়ে নিত। এই অপরাহ্ন বেলায়, নিজের নিঃসঙ্গ বাংলোর এলাকায়, ছোট লন্‌টিতে বসে বাংলা একখানি উপন্যাসের মধ্যে সে বিভোর হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক বিয়ে করার পক্ষপাতী নন্, বিবাহের চেয়ে বড় ব্যাপারগুলির দিকেই তার বেশী টান, আর এই ধরণের নামমাত্র বিবাহকে উপলক্ষ্য করে' প্রেমের টানা-পোড়েনের গল্পই স্বর্ণলতা পড়তে ভালোবাসত।

মানস-মিলন!

কাঁকর নামক উপন্যাসের নায়ক তার নায়িকাকে, যতই নরম করে বিছানা পাতা হোক না, কাঁকর তবুও ফুটবে, যেখানে এই রহস্য বিশদ করে বোঝানোর ব্যাপারে ব্যগ্র ছিল স্বর্ণলতা এখন পরিচ্ছেদের সেই অংশে মশগুল। মিলনদৃশ্যটা সে যেন ননশ্চক্ষে দেখছিল। নায়িকাটি, নাম যদি তার কাঁকড়াই হয়, তারও তো কামড় কোনো অংশে কম্‌জোর হবার কথা নয়, নায়কের প্রশ্নের কী সদুত্তর দিয়েছে স্বর্ণলতার সবখানি মন সেই দিকে থাকলেও, তার লোকালয়ের জনহীন রাস্তায় সহসা ধুপ্‌ধাপ্‌ পায়ের আওয়াজ তার কানে এল। তার কান এবং চোখ এক সঙ্গে টান্‌ল সেই আওরাজ। বিস্মিত হয়ে বই থেকে মুখ তুলে সে দেখল অচেনা এক যুবক, তাদেরই সাম্‌নের রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে।

"ভারী যে তাড়া দেখছি!" আপন মনে এ[illegible] ব্য ঝেড়ে স্বর্ণলতা আবার তার বইয়ের পাতায় ফিরে গেল।

পদশব্দ তাকে পেরিয়ে চলে গেল—কিন্তু একটু [illegible]রে গিয়েই যেন থম্‌কে গেল হঠাৎ। স্বর্ণলতা সচেতন হয়ে উঠ[illegible] অম্‌নি। চোখ বইয়ের পাতায় ঝোঁক রাখলেও, কাণ তার টান[illegible] পায়ের পাতা। এবং তার মনে হোলো সেই পায়ের পাতা যেন বইয়ের পাতার দিকেই মুড়ে আস্‌চে।

স্বর্ণলতার কানের পাতা গরম হয়ে উঠল, বইয়ের একটি অক্ষরও আর তার চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘাসের মধ্যে দিয়ে মস্‌ মস্‌ করে সংকল্পদৃঢ় একজোড়া পা যে তার দিকেই এগিয়ে আসছে তার আর ভুল নেই। স্বর্ণলতার বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। সেই পদক্ষেপের শব্দ যেন নিজের বুকের মধ্যেই শোনা যায়।

পরমূহূর্তেই একজোড়া তরুণ সবল বাহু এসে জড়িয়ে ধরল স্বর্ণলতাকে। কিছুটা সেই বাহুর আকর্ষনে, কিছুটা বা অবচেতন মনের অনুকম্পনায়, লনের পুরু ঘাসের ওপরেই এলিয়ে পড়ল স্বর্ণলতা। তার গালের নাগালে দ্রুত নিশ্বাসের স্পর্শ পেল, এবং তার সাথে সাথেই নিজের উদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরে—! স্বর্ণলতার সারা দেহ কেঁপে উঠল থর থর করে'। তার মনে পড়ল একটু আগেই সে বিধাতার প্রতি দোষারোপ করেছে। বিধাতা অকস্মাৎ তার এতদিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। একটি প্রণয়ীকে অবশেষে পাঠিয়ে দিয়েছেন—পত্রপাঠ!

সিগ্রেট এবং কার্বলিক সাবানের গন্ধ জড়িয়ে অদ্ভুত গন্ধ সেই যুবকের! নাকের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে উদ্বেলিত করে তুলছিল স্বর্ণলতাকে। আরামে তার চোখ বুজে এসেছিল। পুরুষের রূঢ় স্পর্শের মধ্যেও এমন এক আদর আছে যা অসহ্য—সত্যই অসহনীয় সুখদায়ক।

"তোমার কোনো ভয় নেই, লক্ষ্মি মেয়েটি।" বল্ল সেই যুবক: "অমন বিমুখ হোয়োনা। তোমার মুখটা আমার ঘাড়ের পাশে রাখো।"

তাই করল স্বর্ণলতা। যুবকটি চোখ নামিয়ে ভু কুঁচ্‌কে দেখছিল ওকে—তার চাহনির মধ্যে ছিলো—কৌতূহল নয়—কৌতুক।

"কেমন? ভালো লাগ্‌ছে?" জিজ্ঞেস কর্‌লো সে। তারপরেই সে কাঠ হয়ে গেল—রাস্তার ওদিক থেকে আবার কতকগুলি দ্রুত পদধ্বনি ভেসে আসতেই, যেটুকু অস্থিরতা যুবকটির দেখা গেছল, চকিতের মধ্যে যেন স্তব্ধ হয়ে এল।

একজন দারোগা দৌড়তে দৌড়তে সেই যুবক আর স্বর্ণলতা-জর্জরিত লন্‌টির সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করল বুঝি,

বাল্মিকীর সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে পড়ে গেল বোধ হয়। এই ক্রৌঞ্চ-লীলার হন্তারক না হয়েও, ভেবে দেখতে গেলে, একজন পুলিশ কর্মচারীর পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভের অবকাশ কোথায়? অন্য কেউ হলে হয়তো আড়াল থেকে এই আদিরস—এবং এই আদিম দৃশ্য উপভোগ করার চেষ্টা পেত, কিন্তু দাঁড়াবার তার সময় কই? তাছাড়া, এই মুহূর্তেই একজন পলাতক অপরাধীর পেছনে তাকে দৌড়তে হয়েছে, দুর্জনতা দূরে থাক, কোনো সৌজন্য প্রকাশের সময়ও বুঝি এখন নয়।

"এই তোমরা", বাধ্য হয়েই হাঁক পাড়তে হোলো দারোগাকে—"প্রেম করছো ওখানে! শুনছো?"

"সাড়া দাও।" যুবকটি ফিস্‌ফিস্ করল স্বর্ণলতার কানে।

লজ্জার মাথা খেয়ে স্বর্ণলতা প্রণয়ীর কাঁধের ফোকর থেকে মুখ বাড়ালো।

"এখান দিয়ে একটু আগে একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছ?" জিজ্ঞেস করল দারোগা।

"না তো। আমি—আমরা তো অনেকক্ষণ থেকেই এখানে আছি। কেউ তো আসেনি।" জড়িত কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল স্বর্ণলতা।

পরপর আরো কতকগুলি পায়ের শব্দ দৌড়ে এল। তাদের সম্বোধন করে দারোগার গলা শোনা গেল—"অন্য পথে পালিয়েছে। এবারেও চোখে ধূলো দিয়ে গেল হতভাগা।"

তারপর সমস্ত পদশব্দ একজোট হয়ে লনের ত্রিসীমানা পার হয়ে চলে গেল।

"চমৎকার মেয়ে তুমি!" স্বর্ণলতার কানের কাছে গুঞ্জরিত হয়ে

উঠল : "তোমার মতো মেয়ে আর হয় না।" আদরে আদরে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্বর্ণলতাকে।

বুটের আওয়াজ নিঃশেষে বাতাসে মিলিয়ে গেলে ঘাড় তুলল ছেলেটি : "একটুর জন্যেই বেঁচে গেলাম। আর তোমার জন্যেই! তুমি না হলে—।" শীস্ দিতে দিতে সে উঠে দাঁড়াল।

"কালকের খবর কাগজেই দেখতে পাবে, এযুগের রঘু ডাকাত পুলিশের হাত থেকে আবার উধাও!" বলেই সে হাসল একটুখানি। তারপর জামার দুই পকেটে হাত গুঁজে শীস্ দিতে দিতে সে চলে গেল।

স্বর্ণলতাও উঠে দাঁড়ালো। যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইলো সেই চলমান মূর্তির দিকে। তারপর আপন মনেই সে বল্ল, "তোমার কোনো ভয় নেই, লক্ষ্মি ছেলেটি! আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।"

বলেই একটু হাসল সে। তারপর বেশবাস বিন্যস্ত করে নিয়ে তার নিঃসঙ্গ বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করল। এখন আর সে সামান্য মেয়ে নয়—সাধারণ একটি স্ত্রীলোক মাত্র নয়। একজন অসাধারণ যুবকের সে প্রণয়িণী। হোলোই বা ক্ষণিকের প্রেম, হোলোই বা সে প্রণয় পুনর্মিলনহীন। তবু ভবিষ্যত তার না থাকলেও (কবেই বা ছিল?) আজ থেকে তার একটা অতীত রয়ে গেলতো!

কালোবাজার

রজনী স্খলিত পায়ে মই বেয়ে উঠছিল। সিদ্ধিলাভের পর অবিচলিত থাকা সকলের পক্ষে সহজ নয়। তখন পদে পদেই পতনের সম্ভাবনা। বড়ো বড়ো সাধকেরও।

সিদ্ধির মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে বুঝি। ভারতের স্বাধীনতা আর পাকিস্থান-লাভের পর এই প্রথম বিজয়া-ঈদ্-সম্মিলনী। বিজয়ীদের শুভ সংঘটন! নতুন নেশানের নতুন নেশা—তাই আর সব কিছুর মত এদিকটাতেও একটু মাত্রা ছাড়াবে বিচিত্র না!

কিন্তু বাঁশের সিঁড়ি ধরে ওঠা সোজা নয়। এমনকি, পনেরই আগষ্টের পরেও কাজটা সহজ হয় নি। স্বাধীনতা পাবার পর দেশের যত কিছুই অদল বদল হয়ে থাক্, বাঁশ এবং বংশধারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

পড়তে পড়তে বার কয়েক টাল সামলাতে হয়েছে রজনীকে। ধীরে, রজনী, ধীরে! অধোগতির পথে সুরুৎ করে নামা গেলেও উন্নতির সোপান—জীবনের যে কোনো দিকেই, সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান টলায়মান।

রাত হয়েছে বেশ। সহরতলীর পথ এম্‌নিতেই একটু নিরালা, তার ওপর এদিকটা আবার নিরালোও মনে হয়। লক্ষ্মীপূজা পেরিয়ে, কালীপূজোর কাছ ঘেঁষেই ওদের বৈঠকটা বসেছিল, তাই অমায়িক

রজনীকে এই মুহূর্তে অমারজনীর হাত ধরে এগুতে হয়েছে। নির্জ্যোৎস্না রাত্রি, দূরে দূরে এক একটা গ্যাসবাতি জ্বলছে—মাঝের গুলো হয় জ্বালা হয়নি নয়তো কেউ দয়া করে নিবিয়ে দিয়েছেন। এই আলো আঁধারের আবছায়া পথে একলা চলতে চলতে হঠাৎ সে এই সিঁড়ির সামনে এসে হাজির। কাছেই একটা গ্যাস্ জ্বলছিল কাজেই জিনিসটা তার নজরে ঠেকলো। একখানা অনেক ফ্ল্যাটওয়ালা বাড়ীর দোতলার একধারের একানে এক অলিন্দের সঙ্গে লাগানো বাঁশের মইটা একটু অদ্ভুত দৃশ্যই মনে হয়।

থমকে দাঁড়াতে হোলো রজনীকে।

কলকাতা এবং সহরতলীর সব লোকচরিত্র তার নখদর্পণে নয় তা সত্যি, কিন্তু তাহলেও যদ্দূর তার ধারণা, এধারের নাগরিকদের গৃহ-প্রবেশের ধরণটা ঠিক এরকম নয়। ইঞ্জিনীয়াররা সাধ্যমত বাড়ীর যত সর্বনাশই করুক, পারৎপক্ষে সিঁড়ির একটা ব্যবস্থা রাখেই। নিশ্চয়ই তার বাসিন্দাদের সপরিবারে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে যাতায়াত করতে হয় না।

রজনী গভীর। রজনী মাত্রই যেমন হয়ে থাকে। আমাদের রজনীও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই এই গভীর রজনীতে, গভীর ভাবে তলিয়ে এটাকে কোনো বদ্‌লোকের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই তার মনে হয় না। দেশটা বিলেত এবং সিঁড়িটা দড়ির হলে ব্যাপারটাকে ইলোপ্‌মেণ্ট বলেই সে ঠাওরাতে পারত ; এবং ঠাউরে খুসি হতে পারত ; কিন্তু এদেশে এই বিদ্‌ঘুটে বংশপরম্পরার সাম্‌নে খাড়া হয়ে খুন্‌খারাপী ছাড়া আর কিছু যেন ভাবতেই পারা যায় না। হয়তো বা চুরি-চামারিও হতে পারে।

রজনী নিজের মহল্লার পীস্‌কমিটির একজন। অশান্তির গন্ধ পেলে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে। রজনী বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো।

সিঁড়িটা অলিন্দের গায়ে-পড়া। অলিন্দ দোতলার সঙ্গে লাগানো। অলিন্দ ও ঘরের মাঝে কালো রঙের পর্দা ঝুলছে। বারান্দা উৎরে রজনী পর্দার কাছে পৌঁছুলো। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটু সঙ্কুচিত হয়েই ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো সে। হিমশীতল শবদেহটা কোন্‌খানে পড়ে আছে কে জানে! প্রতিপদক্ষেপেই তার স্পর্শলাভের প্রত্যাশা করছিলো সে। কিন্তু বেশ কয়েক পা এগিয়েও তেমন কিছুর ওপর তাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হোলো না দেখে শেষ পর্যন্ত হয়তো সে একটু হতাশই হোলো যেন।

হঠাৎ টিক্‌ করে আওয়াজ—আলো জ্বলে উঠেছে! একটি রূপময়ী যুবতী বিপর্যস্ত বেশে আরো অপরূপ হয়ে বিছানার উপরে বসে—সে-ই বেড্‌-সুইচ্‌ টিপে বাতি জ্বালিয়েছে। সদ্যমাত্র তার ঘুম ভাঙলো দেখলেই বোঝা যায়। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে সে রজনীর দিকে তাকিয়ে।

রজনীর অবশ্যি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব ছিল না। তাছাড়া, ভাঙ্‌ খাবার পর উক্ত মতিগতি আরো বেশি মাত্রায় উৎপন্ন হতে থাকে। তখন লোকে ভাঙে তো মচকায় না।

রজনী মেয়েটিকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছে। আর বলেছে, "নমস্কার। বিজয়ার প্রীতি নমস্কার! আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারী খুসি হলাম। কিছু মনে করবেন না।"

বল্তে বল্তে সে পর্দা-বরাবর পিছিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে আরেকবার সে ভালো করে আরেক নজর মেয়েটিকে তাকিয়ে দ্যাখে। অপূর্ব রূপসী—বেশহীনতার মধ্যে আরো বেশ, এতো চমৎকার যে মাথা ঘুরে যাবার মতোই। পর্দার সাহায্যে নিজেকে সামলে নিয়ে কোনো রকমে সে দাঁড়াতে পারে।

"কে আপনি? আমার ঘরে কী করছেন?" রমণীর কণ্ঠস্বর মোটেই রমণীয় নয়: "য়্যাতো রাত্রে?...আর—পর্দা ধরে—অমন করে ঝুলবেন না। দামী পর্দা, ছিঁড়ে যাবে।"

রজনী পর্দানসীন হয়েছিল আগেই বলেছি। এইবার পর্দার আসক্তি ত্যাগ করে সরে দাঁড়ালো। আমতা আমতা করে তার আরম্ভ হয়—"...আমি ভাবলাম..." বল্তে গিয়ে রজনী ঢোঁক গেলে। উপর্যুপরি গিল্তে থাকে। "...ভাবলাম কি..."

মেয়েটি নিজের বেশবাস গুছিয়ে নিলো। বুঝতে পারলো তার অর্দ্ধাবৃত দেহসুষমার জন্যেই আগন্তুক কথ্য ভাষা খুজে পাচ্ছে না। গরম চাদরটা নিজের চারদিকে জড়িয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো: "হ্যাঁ, কী ভাবলেন শুনি....?"

"আমি ভাবলাম যে চোর ছ্যাঁচোর কেউ ঢুকে—এ রকম তো ঘট্তেই আছে আকচার...কেউ ঢুকে হয়তো আপনার..."

তারপর ফের রজনীর আটকে যায়, কী বল্বে ভেবে পায় না। মেয়েটির ধনরত্ন—তার চেয়েও মূল্যবান প্রাণরত্ন—ততোধিক মহার্ঘ অন্যান্য রত্নাদি অপহরণের কথা সবিস্তারে তার মুখের উপর উল্লেখ করা উচিত হবে কি না ভাবতে থাকে। আদালতের বিচিত্র খবরে যে সব বার্তা পুংখানুপুংখরূপেই বলা হয়, একটি ভদ্র-

মহিলার মুখোমুখি
গুলির উচ্চারণে একজ
ভদ্রলোকের স্বভাবত
বাধবার কথা।

"আপনার তো ভারী
বুকের পাটা!—" মেয়েটি

"এত রাত্রে আপনি পরের ঘরে—" সেও ঠিক ভাষা খুঁজে পায় না।

"সিঁড়িটা দেখলাম কিনা! আপনার বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া বাঁশের মইটা দেখলাম যে। তাই আমার মনে হোলো ··"

"যে সুবর্ণসুযোগ? ওইটা ধরে একজন নিদ্রিত ভদ্রমহিলার শোবার ঘরে নিশুতি রাতে সেঁধিয়ে পড়ি? কেমন এইতো?"

"ঠিক বলেছেন!" আপনা থেকেই রজনীর সব কেমন গুলিয়ে

দেখলেই আমার পা সুড়সুড় করে। ভারী মজার ওঠা-নামা। যখন ছোট্ট ছিলাম তখন এন্তার উঠেছি। মই দেখলেই উঠতাম।"

"তুমি একটা পাগোল!" মেয়েটি না বলে আর পারে না।

"শীলাও ঠিক ঐ কথাই বলে থাকে।"

"বুঝেছি।" মেয়েটি ফোঁস করে উঠ্‌লো: "শীলার ওখানেও বুঝি এমনি আন্‌কোরা পথেই যাতায়াত করা হয়?"

"না না। সে আমার বৌ।"

"চমৎকার!...তাহলে এইবার আমি পুলিস ডাকি?"

এই বলে' মেয়েটি আলোয়ানে ভালো করে নিজেকে মুড়ে নিয়ে শয্যা ত্যাগ করে। "রসিক নাগর! বদ্‌মাইস্‌ কোথাকার!...শীলা যদি টের পায় যে এইভাবে তুমি মেয়েদের শোবার ঘরে এসে লীলা করো তাহলে সে কী বলে জানতে আমার ইচ্ছে করে।"

"রাত একটা...। না না, নিশ্চয়ই এত রাত হয়নি..."

"হয়নি! দেয়ালঘড়ির দিকে দেখেছো?"

কথাটা মিথ্যে নয়। রজনীর অতদূর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার পক্ষে একটি মেয়েই এত বেশি যথেষ্ট যে তা ছাড়িয়ে দেয়ালের দিকে তার চোখ পড়ার সুযোগ হবার কথা নয়। এতক্ষণে তাকিয়ে দেখল রজনীর মতো ঘড়িটারও তেরটা বেজেছে। সত্যিই!

"ঠিকই তো। তাহলে তো এখন আমার যাওয়াই উচিত।" রজনী পর্দা ফাঁক করে যাবার উদ্যোগ করে। এক পা তোলে।

কিন্তু হায়, রজনী তখনো বাকী। অন্ততঃ রজনীর তো বটেই।

"খবর্দার! নড়েছো কি, অম্‌নি আমি ডাক ছেড়ে বাড়ীর লোক জড়ো করেছি।" তারপরে টিপয়ের টেলিফোনটার দিকেও

সে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেঃ "দাঁড়াও, এখুনি আমি থানায় জানাচ্ছি।" .

"সর্বনাশ!" হেমন্ত-রজনী বৈশাখের-রাত্রির মতো ঘামতে থাকে।

"আপনার বাড়ীর ফোন্ নম্বর কতো? শীলাকেও কথা‍টা আমি জানাতে চাই। সে কী বলে শুনি একবার।"

"সর্বনাশ! তাহলে কিছু না বলে' সোজা সে বাপের বাড়ী চলে যাবে...." রজনীর গলা যেন রজনীর গলা নয়।

"তাহলে আজকের রাত্রের মতো থানাতেই যাও। পুলিসই ডাকি..." মেয়েটি পর্দা সরিয়ে অলিন্দের ধারে দাঁড়ায়। "কী ভাগ্যি! গ্যাস-বাত্তিটার কাছে এক পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে না? সার্জেন্ট কিম্বা সাবইন্‌স্‌পেক্‌টার গোছের কেউ—তাই যেন মনে হচ্ছে।"

সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রজনীরও ঠিক সেই কথাই মনে হয়।

"আমাদের বরাত ভালো! নইলে এমন সময়ে একজন পুলিসের লোক এই নিশুতি পাড়ায় ল্যাম্প্ পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে! লোকটা সিগারেট টান্‌ছে—তাই না?"

"হ্যাঁ..." রজনী কম্পিত কণ্ঠে সায় দেয়। পুলিসকর্মচারীর চুরোটের মতো নিজেও যেন সে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষিত হতে থাকে। চোখের সামনে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই যেন দেখা যায় না। এমনকি, অমন সুন্দর মেয়েটিও কেমন ধোঁয়াটে।

"ডাকি তাহলে? নারীর শ্লীলতাহানি করার মজাটা কী—তোমার মতো লোকের সেটা শিক্ষা হওয়া দরকার।"

"না না। আমি সমস্ত খোলসা করে বল্‌ছি। বল্লেই তুমি বুঝতে পারবে। কোনো কথা আমি গোপন করব না।"

"তোমার কৈফিয়ৎ শোনার আগ্রহ আমার চেয়ে ঐ লোকটারই বেশি হবে বলে' মনে হয়। ওর জন্যেই ওগুলো জমা রাখো না।"

"এই ব্যাপার যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বেজায় কেলেঙ্কারি হবে।" রজনী আর্তনাদ করে ওঠে।

"এরকম কাজে কেলেঙ্কারি তো রয়েছেই।"

"আর শীলাকে তাহলে আমি চিরদিনের মতো হারাবো।"

"সেতো আরো ভালো—আরো সুখের কথা।"

"আমার চাক্‌রি বাক্‌রি সব যাবে। আমি পথে বস্‌বো।" রজনী আর বেশি বল্‌তে পারে না। উদাহরণস্বরূপ সেইখানেই বসে পড়বার উদ্যম করে। তার গাল বেয়ে জল গড়াতে থাকে।

কাঁদলে কেবল মেয়েদেরই নয়, এক এক সময় এক একটা পুরুষকেও মন্দ দেখায় না। মেয়েটি তার অশ্রুবর্ষণ লক্ষ্য করে। যেন ভিজতে থাকে মনে হয়।

"আমি একটা কথা বল্‌বো?..." কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রজনী আবেদন জানায়: "তুমি যে ওই বল্লে—তোমার শ্লীলতাহানি না-কি—তার জন্য কী খেসারৎ দিতে হবে বলো আমায়। শাড়ী-ব্লাউস্‌,- গয়না-গাঁটি—মণি-মুক্তো,—হীরে-জহরৎ—চুনি-পান্না—যা চাও বলো—কেবল দোহাই তোমার, ওই পুলিসকে ডেকো না।"

মেয়েটির মেজাজে একটু যেন পরিবর্তন দেখা যায়। এমন কি, তার দেহাবরণের খানিকটা ফের খসে পড়তেও সে বাধা দেয় না।

"বটে? কী আছে তোমার কাছে—দেখি।"

রজনী এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কয়েকটা দস্তার টাকা আর কিছু খুচরো রেজকি বার করে। সেই সঙ্গে একটা চুলের কাঁটাও।

"এই তোমার সম্বল!" মেয়েটি হাসে। "এই খুচরো কারবার?"

"ভেতর পকেটে আমার চেক বই আছে। কখন কী হয় তাই সব সময়ে কাছে রাখি। ভাগ্যিস্, আজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম।"

"কতো টাকা আছে তোমার ব্যাঙ্কে, শুনি?"

"হাজার দশেক। আমার এতদিনের জমানো।"

"আচ্ছা, তোমার নিজের মত কিছু রেখে ন'হাজার টাকা আমার নামে লিখে দাও। নগদ্ হলেই ভালো হোতো, কিন্তু তা আর কি করে হচ্ছে? চেকই সই!"

"ন-হাজার?" রজনীর মন নানাকার করে। হাহাকারের মতই।

"তোমার একটু আগে দিল্‌দরিয়া দাক্ষিণ্যর কথা ভাবলে অনেক কমিয়ে-সমিয়েই বলেছি—নয় কি? আজকালকার বাজারে মণি-মুক্তো হীরে-জহরতের জড়োয়া গয়না লাখ টাকার কমে হয় না। কিন্তু তোমার অতো নেই তো, কী করবে! ওই ন-হাজারই দাও।"

চেক্‌টা হাত বদ্‌লালো। অবশেষে মেয়েটি সদয় হয়ে বল্‌লে, "তোমাকে আর এই বিপদের মুখে মই বেয়ে নামতে দিতে পারি না। পুলিসের লোকটা এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। দেখতে পাবে। চলো, তোমাকে সদর পথে বার করে দিয়ে আসি।"

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্যাস্-বাতিটার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পুলিসের লোকটা কটমট করে তাকায়। কী বিচ্ছিরি তার গোঁফ-জোড়া—দেখলেই প্রাণ শিউরে ওঠে। তার চাউনির মতই ভয়াবহ।

"বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম..." জড়িত কৈফিয়তের সুরে অকারণে আপনা থেকেই সে জানায়। জানিয়েই এগুতে থাকে। জবাবে পুলিসটির কিঞ্চিৎ বক্র হাসি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পরদিন সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে দিনের আলোয় আগের রাত্রের ব্যাপারটা সমস্তই কেমন তার বেখাপ্‌পা লাগে। তার মনটা কর্‌কর্‌ করে। তার অতোদিনের সঞ্চয়—কর্‌করে অতগুলো টাকা, শীলা—এমন কি, তক্ষশীলার খাতিরেও জলাঞ্জলি দেয়া যায় না। যা হয় হোক্—যে করে হোক্—এই টাকা সে একটা সর্বনেশে মেয়ের খর্পরে যেতে দেবে না—না, কিছুতেই না। বৌ যদি বাপের বাড়ী যায় সেওভি আচ্ছা! সেই দণ্ডেই সে ট্যাক্‌সি হাঁকিয়ে ব্যাঙ্কে যায়। গিয়ে শোনে, আধঘণ্টা আগে তারা এসে চেক্ ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বেয়ারার চেক্—ক'মিনিটের আর মামলা!

"তারা!...তারা মানে...?" রজনী চেঁচিয়ে ওঠে..."মেয়েটির সঙ্গে কোনো পুরুষ ছিলো নাকি?"

"ছিল বইকি! পুরুষটার আবার যা বদ্‌খৎ গোঁফ।" ব্যাঙ্কের কেশিয়ার মুখবিকৃত করেই কথাটা জানায়।

শিল্পের প্ররোচনা

"রুচিরিন্দ্র বাবু ঋষিতুল্য লোক। আমি একটুও বাড়িয়ে বল্‌চি না মেজমামা।" বল্ল প্রিসিলা: "আপাতঃদর্শনে তাছাড়া আর কিছুই তাঁকে মনে হয় না।"

"পরণে সালোয়ার, পাঞ্জাবি গায়ে, আধ হাত দাড়ি নিয়ে যেকোনো লোককেই খুব নেংরা দেখাবে, তা সত্যি, কিন্তু রুচিন্‌বাবুর কথা আলাদা। তাঁর দাড়িও একটা আকর্ষণীয় বস্তু। (প্রিসিলা বল্‌তে লাগলো) না না, আমি সে-আকর্ষণের কথা বল্‌ছি না—দাড়ি ধরে টান মারার কোনো কথা নয়। আমার মতে তাঁর দাড়ি একটা প্রাণকাড়া দৃশ্য। তাই বল্‌ছি।

বেশ সুবিন্যস্ত, সযত্ন-রচিত, সুচারু দাড়ি। রাখতে হলে ওমনি করেই ওকে রাখা উচিত। তা নাহলে পাড়াগেঁয়ে জঙ্গলের মত জিনিসটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তখন সেসব ঝোপ্‌ঝাড়ে ফ্লিট্‌ ছড়ানোর দরকার করে। ডি-ডি-টি মার্কা ফ্লিট্‌! কিন্তু রুচিনের দাড়ি মোটেই সেজাতের নয়। যেমন রুচিকর তেমনি হাইজিনিক্‌।

রবির সঙ্গে বেড়াচ্ছি এমন সময়ে রুচিন্‌বাবুর সঙ্গে দেখা। আমাদের আলাপ খানিকটা এগিয়েছে এমন সময়ে রবিন দূরে কাকে দেখতে পেয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বল্ল—পিসে মশাই না কিসের কথা—বল্‌তে বল্‌তে কোথায় যে সরে পড়লো আর তার পাত্তা নেই!

সত্যি বল্‌তে, হাওয়ায় যেন সে মিলিয়ে গেল মেজমামা! আশ্চর্য!

রবিনের এই একটা বিচ্ছিরি দোষ। কখন্‌ যে কী করে বসবে কিছুই স্থিরতা নেই। তার ওপর কিছুতেই ভরসা করা যায় না। এদিকে আমার দিকটাও একবার ভাবো! না ম মা ত্র-প রি চি ত রুচিনবাবুর কাছে আমাকে একলা ফেলে বিনা বাক্যব্যয়ে সে উধাও— ভাবো একবার ব্যাপারখানা!

"কী করা যায় এখন?" জিজ্ঞেস করলেন রুচিনবাবু। রবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই।

"রবিবাবুর জন্যে অপেক্ষা করাই কি আমাদের উচিত হবে না?" আমি বল্লাম।—

"পা গ ল!" উনি হাসলেন: "আজ আর ওর দেখা মিলছে না। রবিরা একবার অস্ত গেলে—"

"তাহলে—" আমি বলি: "আপনার যদি তেমন তাড়া থাকে—" আমি ওঁকে বিদায় গ্রহণের সুযোগ দিতে চাই।

"তাড়া আছে।" তিনি বল্লেন: "এসো আমার সঙ্গে।"

এমন সুরে বল্লেন যেন আমি—আমি তাঁর খাস্‌ তালুকের একজন প্রজা আরকি! আর এই না বলে' আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্লেন।

"খাসা!" আমি বল্লাম—বলবার একটু ফাঁক পেয়ে। অবশ্যি, খাসি বল্‌তেও কোনো বাধা ছিল না, দাড়ির কথাটা বিবেচনা করলে। কিন্তু প্রিসিলা আমার টিপ্পনিতে কর্ণপাত না করে নিজের গল্পের তোড়ে ভাসতে থাকে।

"ঐ রবিটাকে আদৌ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।" বল্লে

তিনি: "এমন ক্লান্তিকর! বিচ্ছিরিরকমের—একটু মিশলেই যেন মনপ্রাণ একেবারে মুষড়ে দেয়। তোমার মতো মেয়ে ওর মধ্যে যে কী অমূল্য বস্তু পেয়েছে তা বিধাতাই জানেন।"

"য়্যাঁ?..." চম্‌কে উঠে নিজেকে সামলে নিতে হয়: "রবিবাবুর স্বভাবে অনেক ত্রুটি আছে আমি মানি," আমি বলি: "কিন্তু এটাও জানি যে ওঁর অর্থের কোনো ত্রুটি নেই।"

"টাকা, টাকা, টাকা! টাকা কী! টাকায় কী হয়?" তিনি জবাব দিলেন: "বলি, মস্তিষ্ক বলে' কিছু আছে রবির? আদপে না—আর আত্মা? আত্মা বলে আছে কিছু? একদম্ নিল্। এমন কি, এক ফোঁটা দাড়িও ওর নেই—"

"ও কথা থাক্।" আমি বাধা দিলাম। সত্যি বল্‌তে, সব জিনিসেরই একটু সীমা থাকা উচিত।

"টাকা, টাকা! কেবল টাকা।" রুচিনবাবু বলেই চল্লেন: "এই টাকাওয়ালা লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এদের সমূলে ধ্বংস করা দরকার। প্লেগের ইঁদুরদের যেমন আমরা সাব্‌ড়ে থাকি, ঠিক তেমনি করে'। এই যে আমি! আমার কি কোনো টাকা আছে? নাঃ। টাকার কি আমি কোনো ধার ধারি? আদৌ না। আর এই তুমি, তোমারই বা টাকার কী দরকার? কিসের তোয়াক্কা? তোমার মত মেয়ে টাকা নিয়ে কী করবে?"

"ঠিক এই মুহূর্তে থাকলে চমৎকার আইস্‌ক্রীম খাওয়া যেত।" অদূরবর্তী ম্যাগ্‌নোলিয়ার ঠেলাগাড়ির দিকে আমি ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম: "তাছাড়া, কোথায় যাচ্ছি জানিনে, কিন্তু সেখানে আমরা

আরাম করে' ট্যাক্সি চেপে যেতে পারতাম।" সেই সঙ্গে একথাটাও না জানিয়ে পারা যায় না।—"ভালো কথা, যদি না কিছু মনে করেন, কোথায় আমরা এমন ছুটে চলেছি জানতে পারি কি?"

রুচি-শিলা

বলব কি, মেজমামা, ছুটে চলার কথাটা আমার এক ফোঁটাও বাড়িয়ে বলা নয়। অত্যুক্তি দূরে থাক্, তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে আমাকে দস্তুরমত দৌড়তে হচ্ছিল। কী বল্লে? বেগ? বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল? হ্যাঁ, যা বলেছো, মেজমামা! রীতিমত বেগ।

আবেগময়ী ভাষা আর বেগময়ী আমাকে—তিনি একসঙ্গে ছুটিয়েছিলেন। ঠিক বলেছো।

"আমার ধারণা তুমি আমার ষ্টুডিয়ো দেখতে চলেছো?"

"আপনার ষ্টুডিয়ো?"

"ষ্টুডিয়োই তো। সেখানে আমি তোমাকে আমার যতো সব দেহসুষমা দেখাবো। তা দেখে তোমার কেমন প্রতিক্রিয়া হয় আমি জানতে চাই। কিন্তু—কিন্তু কী মুস্কিল! তুমি কি এর চেয়ে আর একটুও জোরে হাঁটতে জানে না?"

শোনো মেজমামা! কথাটা শোনো একবার!

শুনে তো আমি থ! সেইদিনই—একটু আগে—ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ। এর আগে জীবনে আমি তাঁকে দেখিনি। আর মাত্র আধঘণ্টার পরিচয়েই কি কেউ প্রতিক্রিয়ার জন্মে প্রস্তুত হতে পারে? না, কেউ কারো কাছে সে জিনিস দাবি করতে পারে কখনো? ভাবো একবার!

শুনে আমি কী করলাম? কী করলাম তা শুনতে চাও? থমকে দাঁড়ালাম—তক্ষুনি। একেবারে ডেড্ ষ্টপ্। ভদ্রলোকের মুঠোর থেকে আমার আঙুলদের মুক্ত করে নিলাম। সেই মূহূর্তেই। নিয়ে বেশ একটু চড়া গলাতেই শুনিয়ে দিলাম—"শুনুন রুচিনবাবু! আপনার বন্ধুরা আপনার দেহসুষমার ভক্ত হতে পারেন, আশ্চর্য নয়। আর

হতে পারে তাঁরা সকলেই অকপটে আপনার চেহারার প্রশংসা করে থাকেন। আপনার কাঠামো যে নেহাৎ খারাপ এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু তাহলেও আপনার দেহসৌষ্ঠব দেখবার জন্য আপনার ষ্টুডিয়ো পর্যন্ত ধাওয়া করব এমন যদি আপনি মনে করে থাকেন তো আপনায় খুব ভুল। কারো ব্যক্তিগত মাধুরি দেখবার অতটা উৎসাহ আমার নেই। বরং আপনি আমায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন্—"

তারপর কী হোলো, বলি মেজমামা। আমার কথা না শুনে—বেচারি রুচিন বেশ ঘাবড়ে গেল। কিন্তু একটুক্ষণের জন্যেই। তারপরেই সে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলে।

যাই বলো মেজমামা, তোমার রুচিনের আর যাই থাক—সুরুচির যথেষ্ট অভাব। একথা বলতে আমি বাধ্য। কথাটা তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলবার জন্যে নিজেকে আমি আরো একটু কঠোর করলাম।

"শুনুন্ রুচিরিন্দ্রবাবু—" বলে' আমি আরম্ভ করলাম এবার।

"আমার দেহসুষমা? হাঃ হাঃ হাঃ!" হাসতে হাসতে সে বল্লে: "আমি ভয়ঙ্কর দুঃখিত কিন্তু না হেসেও পারছিনে। হো হো হো। আমায় মাপ করো—প্রিসিলা দেবি, আমার ধারণা ছিল যে তুমি জানো। আমার বন্ধু রবিন তোমাকে সব বলেছে বলে আমি ভেবেছিলুম।"

"না তো! রবিন্ আবার আমায় কী বল্‌বে!" আমি জবাব দিই—বেশ একটু অবাক হয়েই, বল্‌তে কি!

"এই—আমার সম্বন্ধেই।" সে বল্লে: "আমি যে একজন ভাস্কর, মূর্তিশিল্পী, এবিষয়ে কি রবিন কিছুই তোমায় বলেনি?"

"ভাস্কর? কী বল্লেন?" আমি আরো অবাক হই।

"হ্যাঁ, ভাস্কর।" জবাব দিলো রুচিন। "যে-দেহসুষমার কথা তোমাকে আমি বলে'ছি তা হচ্ছে আমার শেষের কাজ। কাজটা অব'শ্যি এখনো শেষ হয়'নি। তা বেশ তো—য'দি তুমি না দেখতে চাও—"

"কিন্তু রুচিনবাবু, আপনি যে শিল্পী তা আমার মোটেই জানা ছিল না," আমি বল্লাম: "আপনার ভাস্কর্য দেখতে আপনার ষ্টুডিয়োয় যাবো —সে তো আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা রুচিন্ বাবু।"

মুক্তকণ্ঠেই আমি জানলাম। কলেজের সহপাঠিনিদের কাছে শিল্পী-দের কীর্তি শোনা ছিল। তাদের মহিমার কথা আমার একেবারে অজানা ছিলনা। তার থেকে আমার ধারণা জন্মেছিল যে, কারো ষ্টুডিয়োয় যেতে পাওয়া যেকোনো মেয়েরই সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করা উচিত। এমন কি আর্টের খাতিরে, সেখানে যদি কোনো রকম প্রতি-ক্রিয়াও করতে হয়—তাহলেও তার জন্য পিছিয়ে আসা কোনোমতেই ঠিক নয়। শুনেছিলাম ষ্টুডিয়োয় না কি মেয়েরা নাচতে নাচতে যায়। কী বল্লে, মেজমামা? সে হচ্ছে সিনেমার ষ্টুডিয়ো? সিনেমার না হয় নাই হোলো, কিন্তু রুচিনবাবুর ষ্টুডিয়োই তো। কাজেই আমি অকা-তরেই যেতে রাজি হলাম। খুশি মনেই। আবার আমার আর এক-চোট নাচবার পালা এল—বলাই বাহুল্য! তা, যেমন রাম-ছুট্, তাকে প্রায় নাচাই বল্‌তে হয়।

রুচিনবাবুর মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ছুট্‌তে ছুটতে তাঁর ষ্টুডিয়োয় গিয়ে পৌছলাম। বাড়ীটার একতলায় দাড়ি কামানোর সালুন, আর পাশেই এক কয়লার দোকান। দোতলায় ওঁর ষ্টুডিয়ো।

তা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সামান্য জিনিসের ওপরেই

অসামান্য জিনিসরা নির্ভর করে। সামান্য বীজের ওপর যেমন বিরাট বটগাছ—একটুখানি বীজাঙ্কুর ওপর একখানা মহামারি। এর নাম সম্ভাবনা। সুতরাং কারো ক্ষৌরকর্মের ওপরে রুচিনবাবুর ভাস্কর্য যদি স্থান লাভ করে থাকে তাতে মনে করবার কিছু ছিল না। আর, আমি মনেও কিছু করিনি। বরঞ্চ এই অতি সাধারণ ভিত্তি দেখে রুচিনবাবুর ভবিষ্যৎ আরো বেশিরকম উজ্জ্বল বলেই আমার মনে হোলো। ওঁর সম্বন্ধে আমার ধারণাও বেশ উঁচু হয়ে গেল, বলতে কি! তিনি যে একদিন ভয়ঙ্কররকম বিখ্যাত হবেন সেবিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ আমার রইলো না।

ওপরে উঠে আরো চমক লাগ্‌লো আমার। এমন সব অদ্ভুত সৃষ্টি এর আগে আর কোথাও দেখিনি। কোনোকোনোটা আবার এরকমের যে তার দিকে তাকানো পর্যন্ত যায় না! কিন্তু না যাক্‌, তাহলেও তারা তাক্‌ লাগায়। বলতে আমি বাধ্য।

"অদ্ভুত, রুচিন বাবু, অদ্ভুত!" আমি উচ্ছসিত হয়ে বললাম: "এরকম আনকোরা কাণ্ড আর কোথাও আমি দেখিনি—দেখবো বলে' আশাও করিনি কোনোদিন।"

"ভালো লাগ্‌ছে তোমার?" উনি বিনয়ে গদগদ হয়ে গেলেন, "আহা, শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!"

"এসো, তোমাকে আমার আরো কতকগুলো কাজ দেখাই," এই বলে তিনি আমাকে তাঁর নানাবিধ শিল্পকীর্তির নিকটে টেনে টেনে নিয়ে চল্লেন। দেখাতে লাগলেন একে একে।

বলব কি মেজমামা, এমন সব আজগুবি চীজ তুমি এজন্মে ছাখোনি! তারাযেমন স্বর্গীয় তেমনি সৃষ্টিছাড়া! তাদের মানে যে কিছু

বুঝেছিলাম তা বলে তোমার কাছে আমি কোনোবাহাদুরি নিতে চাইনে, কিন্তু এমনিই সেই শিল্পের মহিমা, কিছু না বুঝলেও যেন তার সবকিছুই বোঝা যায়। মর্ম না বুঝেও তুমি তাদের মর্মে যেতে পারো। দেখবা মাত্রই! কিম্বা, মর্ম না বুঝলেও তারা মর্মে এসে প্রবেশ করে—কী বল্লে? গুণ্ডার ছুরির মতই? ঠিক! তুমি ঠিকই বলেছো মেজমামা!

কিন্তু গুণ্ডার ছুরির মতন অত সোজা নয় জিনিষগুলি মোটেই! যেমন বীভৎস, তেমনি বেখাপ্পা। দেখলেই যেন প্রাণ কেমন করে। অবশ্যি, রুচিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সব পরিষ্কার করে' দিচ্ছিলেন। বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সব, বলাই বাহুল্য।

বলতে বলতে তিনি পর্দানশিন্ এক পেল্লায় ব্যাপারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। "—এই আমার সেই শিল্পকীর্তি যার কথা রাস্তায় আমি তোমায় বলছিলাম। দেখাই তোমাকে।" বল্লেন তিনি অবশেষে।

তারপরে তিনি তার আবরণ উন্মোচন করলেন! "আমার সব শেষের কাজ—আমার চূড়ান্ত সৃষ্টি—এই—এই সেই দেহসুষমা!"

"রুচিন বাবু··!" আমার যেন দম আট্‌কে এল, "আহা, কী সুন্দর! কী অপূর্ব! কী—কী—কী অবর্ণনীয়—যেন একটা অবদান! কিসের মূর্তি এটা রুচিন বাবু?"

"নারীর।" তিনি বল্লেন: "একে আমি নারীই বলি।"

"তাই তো! নারীই তো বটে!" আমি বল্লাম—যদিও একটু আনাড়ির মতই, বলতে কি!

"ভালো লাগলো তোমার?" তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন: "কেমন অপরূপ, কিন্তু তেমনি একটু ধাক্কা-মারা—তাই না, তোমার কী মনে হয়?"

দুই নারী।

"অপূর্ব!" আমি বলে উঠলাম: "সত্যিই অপূর্ব রুচিন বাবু! এরকম দেহসুষমা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আর, যথার্থই ধাক্কা মারে—যা বলেছেন। বেজায়রকম!"

কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি, বুঝলে মেজমামা! এমন নিখুঁৎ আর এত বিচ্ছিরি বপু সচরাচর চোখে পড়ে না। এই নারী—যেমন অপার্থিব তেমনি অপদার্থ, এত জঘন্য যে ভাষায় তার রূপ বর্ণনা করা যায় না! যেমন তার অবয়ব, তাও একেবারে উদোম—দেখলে ভির্মি খেতে হয়। তাছাড়া ও-ধরণের কারো চেহারা—অ্যাতো বিটকেল্ কোনো নারীর চেহারা যে হতে পারে একথা ভাবাই যায় না। অ্যানাটমির দিক দিয়ে—বা যে কোনোদিক দিয়েই ভেবে ছ্যাখো—অসম্ভব ব্যাপার। মেয়েটা তার দেহের স্থানে স্থানে বেরিয়ে এসেছে, আবার কোথাও কোথাও ঢুকে গেছে—কিন্তু সমস্তই ভুল জায়গায়।

"রুচিনবাবু, আপনি এই দেহসুষমার দুটো মাথা কেন দিয়েছেন আমায় বলবেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম : "ওগুলো ওর মাথাই তো, নাকি, মাথা মুণ্ডু কিছুই নয় ?"

"দুই মাথা, দুটো মুখ···" বলতে তাঁর খুব উৎসাহ দেখা গেল : "বেশির ভাগ মেয়েরই যা হয়ে থাকে। স্বভাবতই তারা দুমুখো। এই হচ্ছে ওর মানে।"

"এখন বুঝলাম। আর ঐ যে—ওই তিনটে করে'—ওগুলো কী—যা উনি ওঁর বাহুর তলদেশে ধারণ করে' আছেন ?"

"ওর হাত—ওর গোগ্রাসী হাত।" সগর্বে উনি ব্যাখ্যা করলেন : "নারীর স্বাভাবিক লোভের প্রতীক হচ্ছে ঐ। তাছাড়া কিছু না।"

"উঁ!" আমি বল্লাম : "এখন টের পাচ্ছি। পরের যথাসর্বস্ব যারা হাতিয়ে নেয়—তারাই ? নাঃ, মোটেই ভালো নয়।"

"ভালো ? ভালো কে বলছে ?" উস্‌কে উঠ্‌লেন উনি।—"আমার হাত সত্যকেই সৃষ্টি করে—যে সত্য আমার মনের সামনে ধরা দিয়ে থাকে। স্বার্থপর, ক্রুর, কপট, ঈর্ষাতুর, অবিশ্বাসিনী—নারীর এই চিরন্তন রূপ। এ হচ্ছে নিষ্ঠার সত্য। আসলে এই সত্যই কদর্য, আমার প্রস্তুতমূর্তি নয়। আমি নারীর সেই সত্যকেই রূপ দিয়েছি। কিন্তু তুমি কিছু মনে কোরো না। তুমি হয়তো এই নারীত্বের ব্যতিক্রম হতে পারো। সব মেয়ে কিছু সমান হয় না। সবার সত্য এক নয় কখনো। হয়তো বা কোনোদিন আমি তোমার সত্যকেও আবিষ্কার করব। আমার শিল্পরচনায় রূপ দেব—মৃন্ময়ী প্রতিমায়, ব্রোন্‌জে, পাথরে কিম্বা চক্‌চকে ওই মর্মরে। তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?"

এমন চমৎকার করে কথাগুলো বলল যে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম।

"তোমার সেই মর্মরমূর্তিই হবে আমার মর্মের প্রকাশ। আমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমাদের মর্মান্তিক পরিচয়! যার মধ্যে আসল তুমি ধরা দেবে—যার মাধ্যম দিয়ে তুমি আর আমি একাধারে অমর হব। কিন্তু তুমি কি আমাকে···তুমি কি রাজি আছো? বিয়ে না করলে কোনো মেয়েকে সম্পূর্ণরূপে সত্য করে পাওয়া যায় না। সমস্ত তত্ত্ব জানা যায়না তার। আর সত্যই হচ্ছে আসল—শিল্পের সত্যিকার প্ররোচনা।"

মন্ত্রের মত তার কথাগুলো আমার কানে এসে বাজ্‌ছে, মুগ্ধের মত আমি শুন্‌ছি, বেচারি রবিনের সর্বনাশ আসন্ন আর আমার প্রতিক্রিয়া কম্‌প্লিট্—তাকে প্ররোচনা দিতে আমি প্রায় প্রস্তুত··· বিয়ের কথা দিয়ে ফেলি আর কি...

এমন সময় এক দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ সেই ঘরে তাড়া করে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অপরূপ মূর্তি আমাদের সামনে স্ফূর্তি লাভ করলেন! আশ্চর্য রকমের কদাকার এক নারী! আরেক নারী। কী বিভীষিকা তার চেহারায়—কী বলব!

রুচিন একলাফে তিন হাত পিছিয়ে গেল। কে যেন সজোরে তাকে ধাক্কা মেরেছে। আমি একবার সেই মেয়েটির দিকে তাকালাম, আরেকবার সেই পাথুরে মূর্তির দিকে।

"আপনার মডেল, রুচিনবাবু!" আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই যেন বেরিয়ে গেল।

তারপর সেই ভূতের মত চেহারার থেকে আওয়াজ বার হোলো।

না না, সেই প্রস্তরীভূত চেহারার থেকে নয়—তার কথা বলছিনা। পাথরের মূর্তি কি আবার কথা বলতে পারে? তুমি অবাক্ করলে মেজমামা! সেই নবাগতা নারীর কথাই বলছি—তিনিই কথা বল্লেন। কী বাজখাঁই তার আওয়াজ বাব্বা! বুক কাঁপিয়ে দেয়।

ত্র্যহস্পর্শ?

"ভাত জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দয়া করে' দুটি গিলে আমায় উদ্ধার করবে?" বল্ল মেয়েটা।

আর বলার সাথে এমন করে তাকালো আমার দিকে যে আমি তো প্রায় খতম্! হয়ে গেছে আমার! তুমি তোমার আদরের ভাগনিকে চিরদিনের মতই হারাতে চলেছো। হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া—কিম্বা প্রতি-ক্রিয়া, যাই বলো, তা প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়।—"রুচিনবাবু আপনার মডেল—" কষ্টে সৃষ্টে আমি কেবল পুনরুক্তি করেছি মাত্র।

"আমার…অঁ হুঁ হুঁ…আমার বৌ।" গলা খাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে ফিস্‌ফিসানি শোনা গেল ওঁর।

জল পড়ে পাতা নড়ে

জীবনের উপন্যাসে এয়ীর যেমন অন্ত নেই—এয়োদশীরাও তেমনি চিরদিনের—স্বর্গের উপকূলে চিরন্তন উপসর্গ।

'ওই দেহখানি বুকে তুলে লবো বালা'—বলে' রবীন্দ্রনাথ মালিকা-তুল্যা যে বালিকার উল্লেখ করেছিলেন, শোনা যায়, যুগ-রুচি বদলানের সাথে সাথে, তাঁর বইয়ের সংস্করণ-পরম্পরায় বিশেষিত হয়ে ত্রয়োদশ বসন্ত শেষ পর্যন্ত সপ্তদশে গিয়ে উঠেছিল। চেষ্টা করলে এবং কষ্ট করলে অষ্টাদশ অবধি ওঠানো যেতো, যদিও ধাড়ী হয়ে ক্রমশঃ জিনিস-টার একটু ভারী হয়ে পড়বার কথাই। কিন্তু তোলা না গেলেও, যে কোনো বয়সের মেয়েকেই তের বছরের খুকীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

চিরন্তন ত্রয়ীরা যেমন সংক্রামকরূপে ছড়ানো, ত্রয়োদশীরাও তেমনি চিরন্তনা। দ্বন্দ্ব-সমাসিত সুন্দ এবং উপসুন্দের মাঝখানে, চিরকালের সুন্দর মেয়েটি, বোধ করি র-মেটিরিয়ালের অভাব মোচনের জন্যই, হাইফেনের মত রয়ে গেছেন!

সাদাসিদে শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি। যেসব ব্যাপারে অন্য কেউ হলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি হয় না। এই স্বভাবসুলভ কারণেই, যদিও আমার আগমনী আগেই তার যোগে জানিয়েছিলাম, তথাপি কল্পনা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করতে হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে গিয়ে হাজির থাকবে এতটা আমি আদপেই আশা করি নি।

এমন কি, তাকে বাড়ীর দোরগোড়ায়—অন্যূনপক্ষে বাতায়নেও, সহাস্যবদনে প্রতীক্ষমানা দেখব এটুকুও আমার প্রত্যাশা ছিল না।

তাই অপ্রত্যাশিত-কিছু না ঘটার জন্যে আমার অভ্যন্তরে বিক্ষোভ জাগবার কথা নয়।

'কী করবে বেচারী!'—আমার ক্ষমাসহিষ্ণু স্বগতোক্তি—'হয়তো তরকারি কুটছে এখন! কিম্বা মাছ ভাজছে হয়ত বা! বঁটির মায়া কাটিয়ে আসা কতো কঠিন! খুন্তিকেও তো ক্ষান্ত করা যায় না!'

অবশ্যি, অপর কেউ হলে, এতদিন পরে বাড়ী ফিরে, দরজার সম্মুখে 'স্বাগতম্'-এর একটা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই, দণ্ডায়মান দেখবার প্রত্যাশা করত। বহুদিন পরে পুনর্মূষিক রূপে নিজস্ব কোটরগত হয়ে নিজের কুটীর-রাণীর বিরহ-বিধুর ম্লান অধরে মিলন-মধুর হাসি দেখতে না পেলে ক্ষেপেই যেতো হয়তো, কিন্তু আমার কথা আলাদা! কোনো কিছুতেই আমার মানসিক শান্তিভঙ্গ হয় না। মানসীকে নিয়েও নয়।

দরজা পেরিয়ে দেখতে পেলাম—না, প্রিয়তমাকে নয়—আমার সেই টেলিখানা। লেফাফাদুরস্ত হয়ে লেটার্‌বক্‌স্ আলো করে' আছেন!

বাচ্চা চাকরটার মুখের ওপর বাদামী খামখানা তুলে ধরলাম: "এটা এলো কখন?"

"এই থোরা আগারি।"

বুঝলাম, তার্ করা ভুল হয়েছে; চিঠি ছাড়লে ঢের আগে পৌঁছত এর।

"মাইজি কাঁহা?" আমার পুনশ্চ প্রশ্ন।

"বাহার গিয়া।"

"বাহার গিয়া ? তব্ তুমভি বাহার যাও! হিঁয়া খাড়া কাহে? তোমার বাহার দেখে আর কি হবে বাবা?"

আমি চটিনি, তা ঠিক; তবু বল্‌তে কি, বাড়ীতে পদার্পণের আগে, মনের মধ্যে কেমন একটা চট্‌চটে ভাব মনের অগোচরেই জমে উঠেছিল, সেটা যেন ক্রমেই উপে গিয়ে চটে গিয়ে খট্‌খটে হয়ে আসে। তার ওপর বৃষ্টি নামল আবার। কলকাতা-সুলভ ইল্‌শেগুঁড়ি জাতীয় মধুবর্ষণ নয়—ঝমাঝম্ বর্ষা।

মেজাজ আরো খিঁচড়ে গেল, বল্‌তে চাইনে। আমার মেজাজ সহজে বেগড়ায় না। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে না অতো সহজে। তবু আকাশ না ফর্সা হলে কল্পনা ফিরতে পারছে না, তার আশা ভরসাও আপাতত ফর্সা—এই ভাবনাতেই আমাকে যা একটু কাৎ করল।

—ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে কাৎ হয়ে পড়লাম।···কি আর করা? অভাবিত—অনিবার্যরূপে দীর্ঘতর এই বিরহটা চেখে চেখে আরাম করে' এখন কাটানো যাক্!

কল্পনা ফিরল অবশেষে···

কল্পনা ফিরতেই, আমার অন্তর্গত বিক্ষোভ দমন করতে না পেরে উদ্দাম উচ্ছ্বাসে আমি মুক্তকণ্ঠ হয়ে উঠ্‌লাম—আপনারা ভাবচেন?

মোটেই না,—মোট্টেই না। অতো সহজে বিচলিত হবার পাত্র আমি নই। বরঞ্চ আমাকে তখন, সেই যে কী বলে 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' না কি!—হুবহু তার সঙ্গে তুলনা করা চলত। 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' হয়

না বুঝি? তাহলে তড়াগ কিম্বা হ্রদ কি মোহনা তা সে যাই হোক্—তরঙ্গহীন ঠিক তার মতই তখন আমি শান্ত—শান্ত সমাহিত।

একেবারে স্পীকৃটিনট্!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা (যুগের পর যুগ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না) কাউকে যদি কেবল নিজের সঙ্গে একলা আপন মনে কথোপকথন করে কাটাতে হয় তাহলে আপনা থেকেই তার বাক্শক্তি বিলুপ্ত হয়ে আসে। কথা বলবার ইচ্ছা স্বভাবতই থাকে না।

'কেমন আছো—ভালো আছি' এই ধরণের দু-চারটে না-বল্লেই-নয় কেজো কথা বিনিময়ের পরেই, ওর অধিক বাক্যব্যয় বাহুল্য মাত্র বলে আমার বিবেচনা হতে থাকে।

"কথাবার্তা নেই, হোলো কী তোমার?" কল্পনা নিজেই কথা পাড়ে: "অমন মুখ ভার করে' রয়েচো যে? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার চেয়ে সুপুরুষ কারো সঙ্গে আমি সরে পড়েচি?"

"যাও, বাজে বোকো না।" আমি বকে' দিই।

"বাজে বক্লুম না কি!" কল্পনার গলায় যেন গলাবার চেষ্টা।

"আমি যে সুপুরুষ একথা কেউ বল্বে না, আমরা তো নয়ই, এমন কি আমিও নই। আমার অতি বড়ো শত্রুও অত বড়ো অপবাদ দিতে আমায় সাহস করবে না।" ক্ষোভলেশরহিত কণ্ঠে আমি বলি: "আর, তুমি সরে পড়লেই বা কী! আমার ওপর তোমার যা টান্ তা জানা গেছে।"

"মহাপ্রভুর যে আজ পদার্পণ হবে তা আমি জানব কি করে'?" কল্পনার কৈ'ফয়ৎ: "তুমি কি কোনো খবর দিয়েছিলে?"

"না দিলে কি পেতে নেই খবর? স্বামী আস্ছে এতো মেয়েরা

আগে থেকেই টের পায়। কেমন করে, কে জানে, আপনা থেকেই তারা জানতে পারে—টেলিগ্রাম বা টেলিপ্যাথির সাহায্য না নিয়েও। ছোটবেলা থেকেই তো একথা শুনে আসচি। বইয়েও পড়েচি কতো! বাম চক্ষু—না—দক্ষিণ নয়ন না-কি—তারাই তো নাচা-নাচি করে জানিয়ে দেয়। কে না জানে একথা!" আমিও না জানিয়ে পারিনে।

"সকাল থেকে আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা টন্‌টন্‌ করছিল বটে! কিন্তু এই জন্যেই যে তা কি করে জান্‌ব!"

"করবে বই কি! তার তলায় যাকে দাবিয়ে রেখেছো সেই ব্যক্তি মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌ছিল কি না! টনক্‌ নড়েছিল যে, টন্‌ টন্‌ না করে পারে?"

"যাও, তোমার রসিকতা আমার ভালো লাগে না!"

"বিয়ের আগে তো তুমি এমনটি ছিলেনা কল্পনা? তখন তো তুমি, কখন্‌ আমি আস্‌ব কেমন করেই যেন টের পেতে। পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসেও কখনো তোমাকে চম্‌কে দিতে পারিনি—নিজেই বরং চমৎকৃত হয়েছি। আর আজ, বিয়ের এতদিন পরে—?"

বাকিটা আমি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে উহ্য রেখে দিই।

প্রকাশ করে' বল্‌তে হলে, সুরবল্লী কষায়ের সেই বিজ্ঞাপনের ভাষায় বল্‌তে হয়—তুমি কী ছিলে আর কী হয়েছো!—

প্রকাশ করেই বল্লাম: "সুর যা ছিল উড়ে গেছে, এখন পড়ে আছে কেবলমাত্র কষায়।"

"তুমিই ভালো জানো।" জবাব দিল কল্পনা: "চিনি কি তার নিজের আস্বাদ জানে? কুইনিনের বেলাও সেই কথা।"

আমি কুটিল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম—নিজের বউ হলেও, বল্‌তে কি, দেখতে ওকে ভালোই দেখায়। মুক্তচক্ষে ওকে সুন্দর বলে স্বীকার করা যায়—সর্বসমক্ষেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ পড়ল, ওর শাড়ী ব্লাউজ্ সব খট্‌খটে শুক্‌নো। এমন দুর্দান্ত বর্ষণের মধ্যে—এ কি। খট্‌কা লাগ্‌লো আমার।

"কারু মোটরে ফিরলে বুঝি?" আমার সন্দিগ্ধ স্বর।

"হ্যাঁ।"

"কার? আইভিদির?"

"কী তোমার আক্কেল, বলিহারি! যখন বৃষ্টি পড়ে, আইভিরা বুঝি তখন বাইরের দিকে তাকায়? তারা তখন মোটরের সাম্‌নেকার শার্সির পানে চেয়ে থাকে। শার্সির গায়ে বৃষ্টি-কণিকাদের লীলাখেলা ছাখে। কেবল পুরুষদেরই তখন ফুটপাথের দিকে এক আধবার দৃক্‌পাতের ফুরসৎ হয়। আর পুরুষ ছাড়া মেয়েদের কে আবার লিফ্‌ট্‌ দেবে? গায়ে-পড়া কার এত গরজ?"

আমার গলার মধ্যে কী যেন আটকায়। "তুমি বল্‌চো যে,' আমি দম নিয়ে বলি: "একজন ভদ্রলোক গাড়ী [illegible]রে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল? আমি—আমি কি সেই ভদ্রলোককে চিনি?"

"বোধ হয়না" প্রিয়তমা জানান: "আমার তো চেনা নয়।"

"য়্যাঁ, বলো কি? অচেনা একজন পুরুষ—তাছাড়া চেনা হোক অচেনা হোক্, যে-কেউ তোমাকে ডাকবে অম্‌নি তুমি তার গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌বে?"

"কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি? এই যে তুমি বলো (

কিছুতেই নাকি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। কারো প্রতিই তোমার ঈর্ষা নেই। তবে ?··· কিন্তু তাও বলি, অমন চমৎকার লোক দেখা যায় না। ইয়া ইয়া তার গোঁফ! কে যেন বলেছিল যে গোঁফ না হলে পুরুষকে মানায় না। গোঁফালো মুখের মতো তোফা নাকি আর কিছু নয়—কে বলেছিল ?"

'এবারকার সার্কাসে দাড়িওলা যে মহিলাটি দর্শন দিয়েছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যবান স্বামীই খুব সম্ভব।' কথাটা আমি বল্‌তে যাই, কিন্তু গলা দিয়ে বেরোয় না। উৎকণ্ঠা থেকে কণ্ঠাগত হবার পথে আমার বাণীর কোথায় যেন অঙ্গহানি ঘটে।

"খুব খাঁটি কথাই বলেছিলো সে।" কল্পনা নিজেই নিজের উপসংহার করে।

"মানে ? তার মানে ?" আমি চেঁচিয়ে উঠি : "তুমি বল্‌তে চাও যে তুমি তাকে তোমার চুমু খেতে দিয়েচ ?"

"আমি কিছু দিইনি। আমি কী দেব ? মেয়েদের কি নিজের থেকে কিছু দিতে হয় ? না দিয়েই তো তারা পেয়ে যায়। কেবল একটু উন্মুখ থাক্‌লেই হোলো।" কল্পনার মুখে হাসির ছিটে, "তাছাড়া, লোকটার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ম্যাগ্‌নেটিক পার্সোনালিটি যাকে বলে। চুম্বকের মতো আকর্ষণকারী ক্ষমতা ওর আছে—মানতে হবে।"

"আর সেই আকর্ষণে যত সব পড়তা চুম্বন, রাস্তায় হাঁ করে' পড়ে থাকা যত না চুমু, তার গোঁফে গিয়ে পটাপট্ সেঁটে যাচ্ছে, তাই না ?" আমার গলা ঘড় ঘড় করে ওঠে, কণ্ঠস্বর শ্লেষ্মাতেই রুদ্ধ হয়ে আসে বোধ করি, ঘর্ঘর-ধ্বনির মধ্যে শ্লেষের সুর নিজের সূক্ষ্মতায় কোথায় যেন তলিয়ে যায়।

"অম্‌নি কি আর যাচ্ছে? ওরকম লোক হাজারের মধ্যে একটাই মেলে—একথা বল্‌তে আমি বাধ্য।" ওর নির্বিকার সত্যনিষ্ঠা।

"তোমার বাধ্যতা তোমার থাক্‌। সেই হতভাগাটা তোমার চুমু খেয়েচে কিনা এই কথা আমি জানতে চাই।" আমি আরো রুক্ষ হয়ে উঠি।

"তোমার কী ধারণা? কী তোমার মনে হয়?"

"অতো—সতো জানিনে। সাদা বাংলায় আমি জানতে চাই—"

"অমন যদি তুমি রাগ করো তাহলে কিচ্ছু আমি বল্‌ব না—"

"না, রাগ আমি করিনি, তবে বল্‌তে কি, কিঞ্চিৎ আহত হয়েছি। আশ্চর্যও যে হইনি তা নয়। তবে তোমার আর দোষ কি? তোমার দিকে তাকালে কারো পক্ষে আত্মসম্বরণ করা একটু শক্তই মনে হয়। ভালো করে তাকিয়ে সেটা দেখতে পাচ্ছি এখন। ঠিক চুম্বকের মতো না হলেও, একটা আকর্ষণী শক্তি তোমার আছে। কিন্তু তাহলেও একথা আমি ভাবতে পারিনে যে যে-কেউ এসে গায়ে-পড়া হলেই অম্‌নি তুমি তাকে তোমার গায়ে পড়তে দেবে—"

"প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এমন সব মুহূর্ত আসে যে-সময়ে কেউ গায়ে-পড়া হয়ে এগিয়ে এলে তারা আর বাধা দিতে পারেনা—" কল্পনাকে সহসা কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠ্‌তে দেখা যায়: "আচ্ছা, তুমি যখন গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছিলে,—সেই একটা মনোহারী দোকানের সামনেই না? অবশ্যি, অচেনা এক কিশোরীর মনোহরণের সদভিপ্রায়েই যদিও—"

"আমার মনে নেই।" আমি এক কথায় ওর আত্ম-বিলাস উড়িয়ে দিই: "তাছাড়া, আমার কথা আলাদা। আমি কারো সঙ্গে ভাব

করতে গেলে তেমন দোষের হয় না। অন্ততঃ আমি নিজে তো তাতে কোনো দোষ দেখতে পাইনে।"

"ওঃ বুঝেচি! সেটা বুঝি অপরের অভাব মোচনের জন্যেই তোমার এগিয়ে যাওয়া! তাই বুঝি?"

"তা ছাড়া কি?" আমি বলি। সত্যি বল্‌তে, অমন একশোটা ...য়ের সঙ্গে ভাব হলেও আমার কাছে সেটা 'সদ্ভাবশতক'-এর আধুনিক সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়।

"কিন্তু পৃথিবীর সবার চোখ তো তোমার মতো নয়। তাছাড়া তোমার চোখে সবাই তোমায় দেখবে এটা নিশ্চয়ই তুমি আশা করো না?" কল্পনা বাঁকা পথ ধরে।

"অন্য সব হিংসুটেরা কী চোখে দেখল তাতে আমার বয়েই গেল।—"

"তুমি নিজে হিংসুটে নও তো? তাহলেই হোলো।"

"আমি! আমি হিংসুটে!" আকাশ থেকে পড়তে হোলো, "কেউ এমন কথা বল্‌তে পারে না আমায়। অতি বড়ো বন্ধুরাও আমার এরূপ গুণগান কখনো করে না। আমার মতো দেবতুল্য লোক আর আছে নাকি? কিন্তু সে কথা থাক্‌—" আত্মবিলাপ শেষ করে পরের কথায় গিয়ে পড়তে আমি উদ্‌গ্রীব—কেননা আত্মবিলোপ করতে হলে পরচর্চাই হচ্ছে একমাত্র উপায়।—"এখন তার কথা বলো! সেই বদ্‌খৎ লোকটা কে?"

"বদ্‌খৎ?" কল্পনার কণ্ঠস্বরে ক্ষুণ্ণতা—"তা, বদ্‌খৎ তুমি বলতে পারো বটে। তোমার বল্‌তে আর বাধা কি! কিন্তু ওই দুর্যোগের মধ্যে তাকে দেখে তাকে পেয়ে আমার কী মনে হয়েছিল জানো! মনে

হয়েছিল যে শিভাল্রির যুগ এখনো পৃথিবী থেকে চলে যায়নি। এবং না গিয়ে ভালোই হয়েছে।"

"যাবেও না কোনোদিন। যতদিন she-রা থাক্বে : তোমার মতো প্রেয়-she-রা থাক্বেন, ভ্যালারাও তার পেছনে এসে জুটবে— আপনা থেকেই। ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই। আর না জুটে পারে? যতো সব বিচ্ছিরি লোক ওই তালেই তো ঘুরছে দিনরাত!"

"বিচ্ছিরি! কী বল্লে? তার চেহারা যদি দেখতে!"

"শুনি, কিরকম চেহারাটা!" না দেখেও যা দেখছি, দেখতে হচ্ছে, তার ওপরে আর দেখবার প্রয়োজন না থাকলেও, পার্বত্য খাদের কিনারায় এসে তার তলায় কী আছে তলিয়ে দেখবার যেমন প্রবল ইচ্ছা হয় মানুষের—এক এক সময়ে হয়ে থাকে—সেইরূপ অতলস্পর্শী ইচ্ছা আমায় উত্তাল করে।

"অমন চেহারা দেখা যায় না। ইয়া নাক, ইয়া মুখ, ইয়া টানা চোখ—আর ইয়া ইয়া গোঁফ!—"

"শুনেচি, হাজার বার শুনেচি তোমার গোঁফের কথা—" আমি ঝাঁঝিয়ে উঠি: "খুব হয়েছে! তোমার প্রশংসাপত্র তার গোঁফের ডগায় গিয়ে ঝুলিয়ে দাওগে!"

"আর যেমন লম্বা তেম্নি চওড়া। রোদপোড়া তামাটে চেহারা, কিন্তু তাহলেও লালিত্য আছে বেশ। দেখলে মনে হয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানই ওর কাজ—এই ভাবে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার করে—"

"মেয়ে মানুষদের—সেই কথা বলো!" আমি বলি। এম্নিতেই সূক্ষ্ম কথাটা, যতটা সুতীক্ষ্ণ করে বলা যায়, গলায় শানিয়ে ধারালো করে বলবার চেষ্টা করি।

"তাও বল্‌তে পারো।" কল্পনা বলে, "তাও বোধহয় বলা যায়।—" এক বাক্যে আমার কথায় সায় দিতে ওর দ্বিধা নেই—"কিন্তু ভেবে দেখলে, মেয়েদের প্রতি পক্ষপাত, এক মেয়েরা ছাড়া, পৃথিবীতে আর কার নেই—শুনি তো?" সায় দেবার সাথে সাথেই সাফাই দেবার সে চেষ্টা করে।

আমার আপাদমস্তক জ্বল্‌তে থাকে। "বেছে বেছে বেড়ে এক বন্ধু পাক্‌ড়েছো বটে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—বখাটে—বদ্‌ —বিচ্ছিরি—"

"তোমাকেও তো আমিই বেছে নিয়েছি।" কল্পনা উদাহরণ দেয়।

"তখন তুমি ভালোমন্দ বাছতে পারতে। জ্ঞানগম্যি ছিল তোমার।" আমার বুকে কে যেন হাতুড়ি পেটে—আর বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের মতো গর্‌মাগরম কথা অগ্নিগর্ভ অন্তস্থল থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে—"সেসময়ে তোমার রুচি এতটা নীচে নামেনি।"

"মোটের ওপর হয়তো একথা বলা যায়। তোমার মোটর না দেখেই তোমাকে তো পছন্দ করেছিলাম।"

আমার বে-কার্‌ জীবনের উল্লেখে প্রাণে ব্যথা লাগে।—"থাক্‌, শুনি তারপর। তারপর কদ্দূর গড়ালো শোনা যাক্‌। বলো—বলে যাও—থামলে কেন? তারপর?"

"তারপর? তারপর আর কি? রাস্তা দিয়ে আস্‌ছি, কত কী ভাবতে ভাবতে ফিরছি, এমন সময়ে বৃষ্টি নাম্‌ল। সেই লোকটি সেই সময়ে সেই পথ দিয়ে নিজের গাড়ীতে যাচ্ছিল, আমি ভিজ্‌ছি দেখে, আমার পাশে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ী দাঁড় করালো—এই আর কি।"
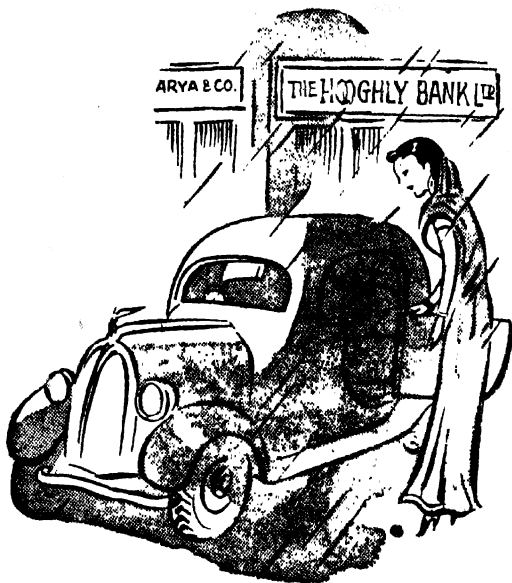
পাশে এসে গা ঘেঁষে গাড়ী দাঁড় করালো

"শুধু এই ?"

"এর বেশী আর কী ? গাড়ী দেখে আমি চোখ তুলে তাকাতেই আমাদের—আমাদের—কী বল্‌ব ? ঠিক ভাষাটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"চারি চক্ষের মিলন।" ভাষ্য করে দিলাম।

"হ্যাঁ, ওই কথাটাই বটে। তোমরা লেখকমানুষ, চট্‌পট্‌ তোমাদের কথা যুগিয়ে যায়, হ্যাঁ, ওই যা বল্লে, ওই-ই বটে! ও তাকালো—আর আমি তাকালুম—ও অবশ্যি আগে থেকেই তাকিয়েছিল। আমি তাকাতেই—ও হাস্‌লো।"

"হাস্‌লো! উঃ, কী স্পর্দ্ধা!" দাঁতে দাঁতে চেপে বলি: "তারপর? এই সব হাসিখুসির পর—তারপর কী হোলো?"

"তারপর, স্বভাবতই, আমিও একটু হাস্‌লাম।" হাসিমুখেই বল্ল কল্পনা।

"স্বভাবতই? উঃ, তোমার স্বভাব যে এরকমের তা এতদিন পরে টের পেলাম। তারপর? তারপর?"

"তারপর আর কি? সে গাড়ীর দরজা খুলে আমায় উঠ্‌তে অঙ্গুলিনির্দেশ করল আর আমি গিয়ে উঠে বস্‌লাম।"

"বাঃ বাঃ! যে-কেউ এসে তোমাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবে আর অম্‌নি তুমি সুড় সুড় করে' তার গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বে? একটা চোর, ছ্যাঁচোড়, রাজ্যের বখাটে, ভবঘুরে, গাঁটকাটা, বাট্‌পার যেই হোক—কেবল তার একটা মোটর থাক্‌লেই হোলো?"

"নিশ্চয়! কেন উঠবনা? বৃষ্টি পড়ছিল যে—!"

"আহা! তারপর—" আমি কটুকণ্ঠে বিদ্রূপ করি, "তারপর গাড়ীর মধ্যে আরামে যেতে যেতে তোমার করুণাপাত্র নেহাৎ ভালো আর যেসব মেয়েরা ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে রাস্তায় হাঁটছিল তাদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে কৃপাকটাক্ষ করছিলে বোধহয়?"

"ঠিক ধরেছ! তাদের বোকামি দেখে সত্যিই আমার হাসি পাচ্ছিল। বোকা নয় তো কী? আমাকে লাভ করার আগে, ওই লোকটি, ওদেরকেও গাড়ীতে উঠবার জন্যে সেধেছিল নিশ্চয়।"

আমার দম আট্‌কে আসে।—"উঃ, কী সর্বনেশে লোক! যাকে পাচ্ছে তাকেই ডাক্‌তে কসুর করছে না—কী ভয়ঙ্কর মেয়ে-হ্যাক্‌ড়া! বাপ্‌!"

এবং, যদিও যাকেই ডাকছে তাকেই পাচ্ছে না (কেননা, কল্পনার কথাতেই, অনেকে ওর খর্পরে পড়ার চেয়ে বৃষ্টিতে ভেজাটাও বেশি বাঞ্ছনীয় মনে করতে দ্বিধা করেনি) তবু, আমার কল্পনার নাগাল পেতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে আমি আঁৎকে উঠি। আমার হৃদয় প্রায় বিদীর্ণ হবার মত হয়।

"এমন একটা বিচ্ছিরি লোকের সঙ্গে এক গাড়ীতে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে তোমার একটুও বাধলো না? পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে তুমি—আমার তুমিই যে কি করে এতখানি হীন হতে পারো, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।" ভগ্ন কণ্ঠে আমি বলি।

"হীন হলাম কেন শুনি? এর মধ্যে হীনতা কোন্‌খানে, বুঝিয়ে দাও তো আমায়!" কল্পনা প্রতিবাদ করে: "কেন, আমি তো আর অম্‌নি আসিনি, আমি তো তাকে চুকিয়ে দিয়েছি।"

"কী দিয়ে? চুমু দিয়ে নাকি?" আমার কণ্ঠের আরো বেশি ভগ্নদশা।

এই অভাবিত এবং অভাবনীয় জগৎসিংহের প্রাদুর্ভাবে, আমি ভেঙে পড়ি। ওস্‌মানের মতো রোষান্বিত হয়ে উঠতে চাই, কিন্তু রাগ পুরুষের লক্ষণ হলেও, রাগ আমার হয় না কিছুতেই। মনের মধ্যে কোথায় যেন আমার এক কাপুরুষ আছে সে কিছুতেই যেন রোষ-কষায়িত হতে জানে না। উলটে আমার কেমন কান্না পায়। মনের মধ্যে অশ্রু ছলছল্‌ করতে থাকে—সেই অশ্রুর ছলনা যেন গানের সুরে গুম্‌রে উঠতে চায়। অশ্রুত রাগে।—

"একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে—
বসেছো ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে…।"

কিন্তু আজ নিজে fool সেজে সেকথা ভাবাই বৃথা! বাহুল্য মাত্র!

রাগের বদলে আমার মনে জাগতে থাকে অন্য কথা। আবার ফের নতুন করে নিজের দয়িতাকে অপরিচিতা কিশোরী জ্ঞান করে নব নব আয়াসে, ছলে-বলে-কৌশলে, তার দেহমন জয় করতে হবে নাকি? নিত্য নতুন প্রয়াসে সদ্যোদ্ভিন্না কুমারীকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মধুপের কবল থেকে পুনঃ পুনঃ ছিনিয়ে আনতে হয়? সেই অক্লান্ত পরিশ্রম আর অসাধ্য-সাধনা—পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে এতদিন পরে এই বয়সে ফের পেরে উঠব কি?

ভাবতেই আমার হাতে পায়ে খিল লাগে। চার ধার অন্ধকার দেখি। কিন্তু রমণীর মন প্রত্যহই নতুন করে জয় করবার—তার সহস্র বর্ষই কি, আর একটি বর্ষাই বা কি? দেবযানীদের জন্যে চিরকালের এই কচ-কচি। প্রতিদিবসের এই জয়ন্তী উৎসবে পেছপা হলে, এক বিবাগী হয়ে বনে যাওয়া ছাড়া, আর তো কোনো উপায় দেখিনে।

কল্পনার মুখে কথা নেই। সেই মারাত্মক বাক্যটা বল্‌বে কি বল্‌বে না, বোধহয় ভাবছে ও!

'সেই—সেই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।' হয়তো এই কথাটাই ও বল্‌তে চায়। আয়েষার মতো আয়েস করে বলবার জন্যে ভালো করে ভেঁজে নিচ্ছে। গানের সুরের মতো যাতে বল্‌তে পারে: কানের ভেতর দিয়ে মর্মভেদ করে প্রাণের মধ্যে সটান যাতে চলে যায়।

শক্তিশেল বুক পেতে নেবার জন্যে আমি তৈরি হতে থাকি।

"চুমু? চুমু দিয়ে কেন?" অবশেষে ওর মুখ খোলে: "চুমু তো সে চায়নি। তাছাড়া, চুমু দিয়ে শোধ করতে চাইলে সে রাজি হোতো কিনা সন্দেহ। আমি তাকে চার টাকা পাঁচ আনা দিয়ে চুকিয়ে দিয়েছি। চার টাকা তার ভাড়া, ট্যাক্সিভাড়াই চার টাকা; আর পাঁচ আনা উপরি দিলাম—ওর বক্সিস্।"

কবিতা-রান্না

রাত্রিশেষের পাণ্ডুর চাঁদ দেখেচ কখনো তুমি ?
রাত্রি যখন আস্তে আস্তে যায় ?
দেখেচ কি তুমি থেকে কভু বুনো সরকারী বাংলায়
পর্বতমূলে অরণ্যকূলে কোনো ?
শুনেচ কি ঘনো ঘনো
আকাশের চাঁদ তাকায়ে হঠাৎ হায়নার হায় হায় ?...

দেখেচ কি তুমি ? আমি তো দেখিনি উক্ত চন্দ্রটিকে।
দেখব কি করে' ? তখন আমি কোথায় ?
নিজ শয্যায় হয়ত তখন নিদ্রায় অচেতন !
স্বপ্নেও দেখা দেয়নি সে চাঁদ (মেমরি আমার ফিকে)
যদি দেখে থাকি দেখেচি কল্পনায়।
হায়না সে চাঁদ দেখিয়াছে কি না জানে শুধু হায়নাই—
এবং তাছাড়া চাঁদের প্রতি যে ভালোবাসা তার কেমন
সেই জানে ; কভু ভুলেও সেকথা আমারে জানায় নাই।

আর হায়নার কথা বলো যদি ভাই, কিবা যে হায়না ডাকে
শুনিনি কখনো সত্যি বল্‌তে গেলে।
দূর অরণ্য দূরে থাক্—কভু পা দেব যে তার দিকে
অতীব সুদূরপরাহত মোর ; বল্‌তে লজ্জা পাই,
হেন কলিকাতাসক্তি আমার, সরার শক্তি নাই :
সহরের এই জনারণ্যই যা নেশা লাগায় আমাকে !

তবে কি না, যদি কবিতা লিখতে হয় কোনো কবিকেই,
তোমাকে কিম্বা আমাকে—কবিতা এলে—
মানবে একথা, (ইতিমধ্যেই না ফেলে থাক্‌লে লিখেই,)
হায়নার সাথে হায় হায় বেশ মেলে ?

কবিতার সাথে কোনোই তফাৎ নেই ভালো রান্নার—
তরি-তরকারি-মশলা-আনাজে বাঁধুনি সে রাঁধুনির—
বাবুর্চি-বাহাদুরি—
নোলা-সক্‌সক্‌কর।
শব্দে গন্ধে মিলায়ে মিশায়ে বিস্তর ভুর্‌ভুরি—
মক্কা সে রসনার
রন্ধন সুকবির।
মশ্‌লা আনাজ্‌ নুন ঝাল্‌ আর ফোড়ন্‌ সম্বরার
কিছু কমবেশি হবার যো নেই,
হলে পরে কান্নার,
সে কবিতা লক্কর।

তবে কি না কথা এই,
ডাক্‌ রোস্‌ট্‌ খেয়ে মনে জাগে যদি মানসের সরোবর
হিম-অরণ্যপার :
সগোত্র তাহা লীরিক্‌, সনেট আর মহাকাব্যর—
সে রান্না কবিতার।

মৃন্ময়ী

সকল আলো গোপন করে' ফেল্‌লে কেমন করে' ?
ওগো ও মৃন্ময়ি ?
নিজের মাঝে নিবিড় করে' রাখলে আপন করে'—
ওগো ও মৃন্ময়ি ?
যে-আলো ছিল উল্কাগতি আত্মহারা
শূন্য-পথে শুদ্ধ ক্ষতি—ছন্নছাড়া—
বল্‌গা দিয়ে আলগা আলোয় বাঁধলে কেমন করে' ?
ওগো ও মৃন্ময়ি ?
ধরলে তারে তুলনাহীন ধূলোর স্বপন পরে
ধরায় পরাজয়ী !

যে-আলো ছিল রিক্ত লোকে অজস্র অব্যয়ে
শূন্য-হিসাব-খাতায়
ক্ষুণ্ণ হয়ে, বারে বারে ঘুরে আসার ভয়ে
না-খরচের যাঁতায়,
কোন্‌ বাঁশীতে ভুলিয়ে তারে কে বা জানে
মায়াজালে জড়িয়ে আনো এই উজানে !—
সেই অধরের পরশ-লাভের লোভে শিহর হয়ে
তোমার গাছের পাতায়
জাগো বুঝি ? পাঠাও সাড়া কুলায়-বিহর হয়ে
তোমার পাখীর গাথায় ?

সেই আলো কি দেয়নি ধরা আলোর অকূল বেয়ে

তোমার কালো গাঙে ?

সেই আলো না নব নব মুকুল হয়ে ধেয়ে

কুসুম হয়ে ভাঙে ?

ছড়িয়ে গেল তোমার তৃণয় তৃণয়

সবুজ হয়ে ওই সে আলো কি নয় ?

সেই আলো মোর দুঃখসুখের চোখের জলে নেয়ে

রামধনুতে রাঙে ?

সেই অধরের ছোঁয়া সে কি আমার অধীর স্নেহে

আন্ অধরে নামে ?

সকল তৃণ ফুল হয়ে কি কখনো ত্রাণ পাবে ?

পাবে আলোর দিন ?

বন্দী আলো মুক্তি লাভের কভু কি গান গাবে

শুধে' ধূলোর ঋণ ?

ধূলোর থেকে আলো-হওয়া এই যে আমি

ধূলো-আলো-এক হওয়া এই অঢেল দামী—

আবার আমি শূন্য হয়ে হারিয়ে যাবো না কি—

আত্মক্ষয়ে জয়ী ?

ফের কি মোরে বাঁধবে ফিরে তোমার বাহুর ফাঁকি,

ওগো ও মৃন্ময়ি ?

গুব্‌রে পোকা

গোবরের ভেতরেও রয়েছে যে মধু
তার স্বাদ জানে শুধু গুব্‌রে পোকারা।
পদ্মের মধ্যে তো মরুভূমি ধূ ধূ—
সেথা হায় অসহায় গুব্‌রে পোকারা।
পৃথিবীর তাজা ঘাস খেয়েছিল গরুরা অবশ্য,
তা থেকে গোবর-সার : তাই করে' নস্য
ওদের থিসিস্‌-বার : ওরা তো নমস্য—
গুব্‌রে পোকারা।
গরুও পেল না টের নিজের যে-সারগর্ভতার—
আপন দানের মহিমার—
অপার রহস্য!
মজে আছে সে-মজায় গুব্‌রে পোকারা।

গোবরের দরবারে পাত্তা নাহিক মধুপের,
আদর বাড়ে না কোনোকালে।
গো-ভীর সুরভি তার কোনদিনো পেলো না সে টের,
ব্যর্থ হোলো সকালে বিকালে।

ব্যর্থ হোলো? ব্যর্থ হায় হোলোই তো ফের,—
কোথায় যে ত্রুটি ছিল, নাকে কিম্বা বাঁকা নজরের!—

ফুল ছাড়া ভুলেও সে করল না মধুর খোঁজের
চেষ্টা কোনো মূল্যবান মালে।
গুবরে পোকার তাতে যায় আসে না ঢের,
দীর্ঘশ্বাস পড়ে যা আড়ালে!

তবু আজ আমি ভাবি, মধু কি করিল একচেটে
ফুলে ফুলে মৌমাছি যারা?
নাহয় নিলাম মেনে, মাধুর্য পায়নি এত খেটে
গুবরে পোকারা।
(যদিও মানা তা শক্ত সেকথা বলতে বাধা নেই,
জাহাজে বাণিজ্য ছিল, ছিল না আদৌ আদাতেই!)
পদ্মের কোরকতলে মাধুরির গলা সাধাতেই
মধুপের মাধুকরি শেষ!
পদ্মের মৃণালে হায় ছিল যেই মধুর উদ্দেশ—
যে মাধুরি ছিল নিরুদ্দেশ,
কিছু তার পেল কভু রেশ
সে-একরোখারা?
ডাঁটাতেই নয়, ছিলো কাঁটাতেও মধু বাঁধা যেই,
(জীবনের কোন্ ধাঁধা এই!)
পেলো তার রহস্যলেশ
মধুপ ওরফে সেই রসিক বোকারা?

পাত্র-পাত্রী-সংবাদ

৫।১এ পরাশর রোড, কলিকাতা
৬ই শ্রাবণ

প্রিয় রেখাদি,

দাদার বন্ধু অজামিলকে তো তুমি জানতে। অজামিল বসু, যার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক হয়েছিল। হায়, সে-অজামিল আর নেই! সেই ভূতপূর্ব অজামিলের অভূতপূর্ব এক চিঠি সম্প্রতি আমি পেয়েছি—এই সঙ্গে তোমাকে পাঠালাম—পড়লেই সব জানবে। আরও জানবে যে, অজামিলকে হৃদয় দিয়েছি বলে তুমি যে আমাকে ঠাট্টা করে' অজবুক্ বলতে, তোমার সেই কথা বর্ণে বর্ণে ফলেছে। এখন আমি কী করি বলতে পারো? তোমার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম। অজামিলের চিঠিটা ফেরৎ পাঠিয়ো। ইতি—

তোমার স্নেহের
যমুনা

সঙ্গের চিঠি :

৩৩।৩, কায়েদ আজাম অ্যাভিনিউ
করাচী, পাকিস্তান
পয়লা আষাঢ়

প্রিয় যমুনা,

আমার এই চিঠি পেয়ে তুমি কী মনে করবে জানি না। অনেক ইতস্ততঃ করে অবশেষে তোমাকে সব খুলে জানাতে বাধ্য হলাম।

সত্যি বলতে এ-চিঠি লিখতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। আগে তোমাকে লিখতে বসলে যেমন আবেগ হোতো এটা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই চিঠি লেখা আরও বেশি কষ্টদায়ক এইজন্যে যে এ পড়ে হয়তো তুমি বেশ কষ্ট পাবে। কিন্তু আমার পক্ষে সব কথা প্রকাশ না করে উপায় নেই। তোমার হৃদয়ে হয়তো একটু আঘাত দিলেও, একথা তুমি বিশ্বাস কোরো যে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এখনও অটুট। ঠিক আগেকার মতই অটল।

গত কিছুকাল যাবৎ আমি তোমার কথা ভাবছি। অবশ্যি চিরদিনই ভেবেছি—সর্বদাই তুমি আমার ভাবনার কারণ। কিন্তু এ ভাবা সে ভাবের নয়। এর মধ্যে কোনো গদ্‌গদ ভাব নেই—একেবারে গদ্যভাব। কিন্তু তাহলেও, তোমার বিষয়ে এত বেশি এর আগে আর কখনই আমি ভাবিনি। সেই দিনগুলির কথা আমার মনে পড়ে—দু'জনে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখছি। এক সঙ্গে লেকের ধারে বেড়ানোর সেই সুমধুর সন্ধ্যাগুলিও আমি ভুলি নাই। তাছাড়া—তাছাড়া—হ্যাঁ, কত কথাই তো ভোলা যায় না! মানুষ কি সব কিছু ভুলতে পারে?

সব চেয়ে আমার মনে জাগছে বিশেষ করে একটি দিনের কথা। যেদিন সকালে আমি তোমাদের বাড়ি যেতেই, তুমি আমাকে তোমার বাবার সামনে টেনে নিয়ে গেলে। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললে, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো বাবা! একেবারে বিনা নোটিশে,—বল্‌তে কি, আমি বেশ হকচকিয়েই গেছলাম। তার আগের সন্ধ্যেয় তোমাকে আমি কী বলেছিলাম আমার মনে পড়ে না, এখনো আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, যার জন্যে তোমার ধারণা হয়ে থাকবে—।

অর্থাৎ, যে-ধারণার বশে তুমি তখন ঐ হঠকারিতা করে বসেছিলে। খুব সম্ভব, আমি বলে থাকব, যদি এমনই আনন্দে আমাদের জীবনের দিনগুলি কেটে যেত! কিংবা হয়তো বা বলেছি, তোমাকে চিরদিনের মত পেলে মন্দ হয় না। অথবা, যদি আমরা একসাথে সুখের নীড় বাঁধতে পারতাম—বা, এম্নি একটা কিছু। সে বিষয়ে আমি ঠিক নিশ্চিত নই, যাই হোক্, সেটাকে তুমি আমার তরফের বিয়ের প্রস্তাব বলে মনে করেছিলে।

অবিশ্যি, তোমার এই মনে করার জন্য মোটেই আমি দুঃখিত না। যদি আমার দিকের কোনও কথায় বা বার্তায়, আচারে বা ব্যবহারে তোমার ঐ মানসিকতা সৃষ্টি করে থাকি তার জন্যও আমি অনুতপ্ত নই। ঠিক তোমার পানি-পীড়নের জন্যে কালীঘাটে মানসিক না করলেও, তুমি যে আমার মানসীই ছিলে তাতে তো আর ভুল নেই। (আমার এই pun-পীড়নে কাতর বোধ করলে আমাকে মার্জনা কোরো, অতিরিক্ত শিব্রাম্ চকর্বর্তির বই পড়ার থেকেই এই বিপদ!)

তুমি সুখী হও, আমি মনে মনে তাই চাই। তোমাকে সুখী করতে পারলেই আমি সুখী। এমনকি, আমার এই অনুপস্থিতির সুযোগে যদি তোমার জীবন-পথে আর কোনো পথচারী এসে থাকে যার তোমাকে সুখী করার ক্ষমতা আরও বেশি আছে বলে তুমি মনে করো, তাহলে তার খাতিরে পথ ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত। তোমার বিচার-শক্তির প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ না করে—কোনো কচকচি না করেই আমি সরে পড়ব। আমার দুঃখ-দহন, বেদনা, আমি একাই বহন করব—বিরহী যক্ষের মতন। তোমাকে হারানোর দুঃখ যে কম হবে

না তা তুমি আন্দাজ করতে পারো—সেকথা তোমাকে বেশি করে বলা বাহুল্য মাত্র।

তোমাকে আমি এখনও ভালবাসি। এত কথার পরে আমার মনের সেই কথাটি, আশা করি, তোমার কাছে অস্পষ্ট নয়। এখনও তোমার স্মৃতি আমার প্রাণের যথাস্থানে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে—আমাকে বিভোর করে রেখেছে। তোমার প্রতি আমার টান সেই আগের মতই অম্লান। কিছুই বদলায় নি, আমিও নিখুঁৎ আছি, কিন্তু তাহলেও, এর ভেতরে অনেক কিছুই আমার বদলে গেছে। এমন এক পরিবতন এসেছে আমার জীবনে—ঠিক তোমার বড়দার যেমন হয়েছিল প্রথম বিলেত গিয়ে। তোমার মেম্‌-বৌদি যার সাক্ষ্য এখনও বহন করছেন।

কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। প্রাণের যমুনা, শুনলে হয়তো তুমি রাগ করবে। কিন্তু রাগ করো, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তুমি দুঃখিত হলে আমি প্রাণে ব্যথা পাব। তার চেয়ে তুমি যদি আমাকে প্রাণ থেকে সাফ্‌ করে দাও, কিংবা প্রাণ ভরে' অভিশাপ দাও সেও আমার ভালো—সেও আমার সইবে। কিন্তু তোমার দুঃখ আমার অসহ্য।

আমার পরিবর্তনটা, ভারতের স্বাধীনতা-লাভের মতন, ধারণার সীমার মধ্যে এলেও এর সীমান্ত-নির্দ্ধারণ কঠিন। এক কথায় বলতে গেলে, আমি আর সেই আগের অজামিল নেই, (আর সবকিছু আমার আগেকার মতই হুবহু থাকলেও) আমি এখন মিঞা—মিঞা জামালউদ্দীন। আমি মুসলমান হয়ে গেছি। মুছলমান নয়, মুসলমান। ছাগলাদ্য উচ্চারণটা আমাদের দৈনিক আজাদ চালু করে থাকলেও, মোটেই সেটা ঠিক নয়।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম (ইছলাম নয়) গ্রহণ করেছি বলে ভেবে বোসো না যে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সমস্ত চুকে গেছে। এজন্য আমাদের পরস্পর-সম্পর্কের মধ্যে কোনো ইতরবিশেষ ঘটেছে একথা মনে করার কারণ নেই। আমার নাম পাল্‌টে গেছে বটে, অজামিলের সঙ্গে মিল এখন সামান্যই—তবুও এই গোঁজামিলের মধ্যে যতটা সম্ভব আক্ষরিক ঐক্য বজায় রাখার আমি চেষ্টা করেছি। আমি অবশ্যি গোড়ায় মীর জুমলা হতে চেয়েছিলাম, ঐতিহাসিক নামটা পেলে হয়ত বা একদা ইতিহাসে দু'নম্বর বলে স্থান লাভ করতে পারতাম কিন্তু মিঞান্ ইৎফিকার উদ্দীন বাধা দিলেন। তাঁর মতে, শহরের মধ্যে আজমীর যেমন একটাই, আফগান্-রাজই যেমন একমাত্র আমীর, তেমনি মীর বলতে হায়দ্রাবাদের উজীর কেবল মীর লায়েক আলিকেই বোঝায়। আমার আকস্মিক মীরত্বে নিজামের সঙ্গে পাকিস্তানের ডিপ্লোমাটিক খটাখটি বাধতে পারে; সেটা নিতান্ত না-লায়েকের মত কাজ হবে।

'কিন্তু কাশিম্ রাজভি? তিনি কি মীরকাশিম নন?' আমি জিগেস করেছিলাম। 'দ্বিতীয় মীরকাশিম?'

"না, তিনি সৈয়দ। অদ্বিতীয় সৈয়দ।" জবাব পেয়েছি মিঞান্ ইৎফিকার এট্ সেট্‌রার কাছে।

"কিন্তু সুরেও তো কত রকমের মীড় হয়ে থাকে মিঞা সাহেব···" তবু আমি বল্‌তে গেছি।

"সে মীর নয় বাপু, মার। তাকে আর মীর বোলো না—মার বোলো—সুরের মার। সেতো হাজার রকমেরই হতে পারে।" এই বলে মার-মূর্তি ধরে দু'কানে আঙুল গুঁজে 'তওবা তওবা' করতে

করতে মিঞান্ সাহেব মিয়ানো মুড়ির মতো আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।

অগত্যা কল্‌মা পড়ে আমি মিঞা জামাল্‌উদ্দীন হলাম। কিন্তু হলেই বা কি, নামে কী আসে যায়? গুলাব্‌কে যে-নামেই ডাকো, একই রকমের গন্ধ ছাড়বে। তোমার কাছে আমি সেই আগের অজামিলই—হাজার জামালউদ্দীন হলেও। আর, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আগের মতই অক্ষুণ্ণ—এক তিলও কম নয়। আমাকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে যে পবিত্র ইস্‌লাম নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। তুমি মুসলমান না হয়েও (উর্দু ব্যাকরণে, স্ত্রীলিঙ্গে মুসলমতী হয় কি না এখনও আমি সঠিক জানিনে) আমার সঙ্গে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারো। মর্মের বাঁধনই আমি যথেষ্ট মনে করি, তার ওপরে ধর্মের বাঁধনে তোমাকে বাঁধতে আমি চাইনে। এমনকি, করাচীতে এসেও তুমি ইচ্ছে করলে তোমার পূজো-আর্চা নিয়ে থাকতে পার, হিন্দুমন্দিরে যেতে পার—কোনও বাধা নেই। যদিও তেমন ধর্মকর্মের মতি কোনদিন তোমার আমি দেখিনি। আমি অবশ্যি মসজিদে যাই। আমার অভিজ্ঞতা খুব বেশি দিনের না, কিন্তু তাহলেও মুসলমান ধর্মকে আমি বেশ উৎসাহপ্রদ বলেই মনে করি। আমি রোজ পাঁচ উঅক্‌ৎ নমাজ পড়ি। আমার চেহারা অনেকটা ফিরেছে—স্বাস্থ্যও আগের তুলনায় ঢের ভালো এখন।

মুসলিম ধর্ম-মতে চারটে অবধি বিয়ে করা যায়, একথা হয়তো তোমার অজানা নয়। এবিষয়ে শরিয়তের অনুমোদন আছে। তদনুসারে, কিছুদিন হোলো এক মোগল-কুমারীকে বিয়ে করে আমি

ঘরে এনেছি। মেয়েটিকে তোমার ভালোই লাগবে। তোমরা দু'জনেই পাশাপাশি সুখে ঘরকন্না করতে পারবে এরূপ আশাও আমি পোষণ করি। বছর সাড়ে সতের ওর বয়েস, দেখতেও নেহাৎ মন্দ না, বিশেষ করে তার কটিদেশ—হ্যাঁ, একখানা কটি বটে! মুঘল চিত্রপটে মেয়েদের কটিতটে যেমনটি দেখা যায় ঠিক তেমনটিই। তার তুলনা হয় না, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়, কোটিকে গোটিক! এই ধরণের ক্ষীণ কটি মোগলেরা ভারী পছন্দ করতেন, এর নাকি সুবিধা অনেক, তাদের বংশধররা বলে থাকেন। বর্ত্তমান বংশধরদের কথাই আমি বলছি—মোগল-রাজত্ব গেলেও, মোগলাই রুচি তো আর যায় না। এই, এবং এছাড়াও, আরও অনেক মোগোলিক সুবিধা আছে মেয়েটার—যা সবিস্তারে চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়। মুসলমানি আব-হাওয়ায় বেড়ে উঠে, স্বভাবতই, তার কোনো আপত্তি হবে না—যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি। এবং আমার ভরসা আছে তোমার দিক থেকেও তেমন কোনো আপত্তি উঠবে না। অবশ্যি, এক পুরুষেই মোগলোচিত আদবকায়দা তোমার কাছে আমি প্রত্যাশা করি না—খাঁটি মোগল-বংশধর বলে গণ্য হতে আমাদের কত পুরুষ (এবং কতো স্ত্রী) লাগবে কে জানে! মাপসই দাড়ি গজাবার আগে তার আন্দাজ পাওয়াও মুস্কিল। যাই হোক, আমি আশা করি, তুমি অন্ততঃ তার মতই সহনশীলা হবে। হিন্দু নারীরা, সেই দময়ন্তী ইত্যাদির আমল থেকে নিজেদের দমন করে আসছেন, নিজেকে আমল না দিয়ে আসছেন। তাঁরা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমার পক্ষেও তার কোনো অন্যথা হবার কথা নয়।

আমার পক্ষ থেকে এই আমি বলতে পারি, যে আমি তোমাদের

ছু'জনকেই সমান ভালোবাসব। এমনকি, বেশিও ভালবাসতে পারি—তোমাদের দুজনকেই। পরস্পরের পটভূমিকায় তোমরা দু'জনেই প্রিয়তরা হতে পারো। বিছরূৎ উন্নিসা বিস্তর মুঘল সুবিধা নিয়ে এলেও, তোমার কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু পেতে পারি যা বিছরূতের কাছে দুর্লভ—যা তার বুদ্ধির বাইরে। সেই সঙ্গ তুমি আমাকে দিতে পারো বিছরূৎ যা বোঝে না—যা তাকে বোঝানো যায় না—যা তার দেবার সাধ্য নেই। বিছরূৎ আমার কাছে বসোরাই বিলাস, আর তুমি হবে আমার শেষের কবিতা। সে নজরুলী গজল, আর তুমি আধুনিক সঙ্গীত। গজলের মধ্যে, গজালের মত আদিম তীক্ষ্ণতা থাকলেও, আধুনিক গানও কিছু কম যায় না। ঠিকমত দাগতে পারলে তার মারও কিছু কমতি হবার কথা নয়।

এখন, এছাড়াও একটা কথা আমার বলার আছে। এতদূর পর্যন্ত আমি নিজেকে অবাধে এবং অকপটে তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি—যদি তা পেরে থাকি, তাহলে আমার শেষ কথা বলতেও কোনো সঙ্কোচ করব না। কথাটা হচ্ছে বেলুর। তোমার বন্ধু বেলুরও অনেকটা তোমার মতই ঝোঁক ছিল—আমাকে সাত পাকে জড়াবার। কিন্তু পাছে তুমি কিছু মনে কর সেই কারণে ওর প্রতি আমি তেমন উৎসাহ দেখাই নি। তোমার সামনে তো নয়ই—কখনই না। তোমাদের হিন্দু ধর্মে একাধিক পত্নীর ব্যবস্থা থাকলেও সমাজতঃ সে-বিধি চালু নয়। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। হিন্দু ধর্মের আকর্ষণ-শক্তি স্বভাবতই তাই ঢের কম। কী দুঃখে লোক হিন্দু হবে, বলো? যাই হোক, এখন আর দুঃখের কোনো কারণ নেই। তখন আমার বাড়িতে বেলুর আমদানি বাঞ্ছনীয় না হলেও—

(যমুনাতটে আর বেলুর মঠে ব্যবধান না থেকেই পারে না) এখন আর কিছু বাধা নেই। এখন অনায়াসেই আমার আস্তানাকে বেলুচিস্তান বানানো যায়—যমুনাকে জমিয়েই। আমিও তোমাদের তিনজনকে নিয়ে ত্র্যহস্পর্শে দ্বিতীয় বিহারশরীফ হতে পারি।

অবিশ্যি, তারপরও আমার কাছে আমার ধর্মের আরও চাহিদা থাকবে। আরও একটা বিবাহের দাবী—যা মঞ্জুর করতে আমি ধর্মতঃ বাধ্য। তারও একটা সুরাহা করতে পারব আমার আশা আছে। একটি পাঠান মেয়েকে আমি দেখেছি—দৈবাৎ তাকে বোরখার বাইরে দেখতে পেলাম—দেখেছি আমার প্রতিবেশী এক দোস্‌তের বাড়ী। দোস্ত হচ্ছেন মেয়েটির ফুফা। মেয়েটির বাবা গিলগিটে থাকেন—কাশ্মীরের হাম্‌লা নিয়ে মত্ত আছেন এখন—তাই মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার ফুফির কাছে। ফুফির কাছ থেকে তাকে আর ফিরে যেতে হবে না! জামাল মিঞা জমায়েৎ আছেন—জামাই হবার জন্যে। তার দ্বারা (এবং তোমাদের সৌজন্যে) পত্নী-চতুর্থী সম্পূর্ণ হলেই ধর্মানুমোদিত আমার পাত্নীব্রত্য পালিত হতে পারে।

শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান—এই চতুর্বর্ণের চার রকমের মেয়ে হলেই ভালো হোতো সব চেয়ে। চতুর্বর্গ লাভ হোতো হাতে হাতে—কিন্তু তা আর হচ্ছে কই ? শেখরা আরবের লোক—শেখদুহিতারা সব সেখানে। এবারের রমজানে আমি রোজা রাখব স্থির করেছি, রুগী থেকে রোজা, এই প্রথম! কাজেই এই মোকা ছাড়তে পারিনে। কিন্তু কবে যে আমি মক্কা যেতে পারব কে জানে! আমাদের ইসলামে, ধর্মের সঙ্গে কর্ম জড়ানো—ধর্মের খাতিরেই যা কিছু।

গাজী হবার জন্যই আমরা মারতে যাই, তার নাম জেহাদ, আর শহীদ হওয়ার জন্যই মারা পড়ি। কখনও হজে গেলে হয়তো বা কোনও শেখললনার সঙ্গে মজে যেতেও পারি, বলা যায় না। কিন্তু তা এখন আমার কাছে আরবের মরীচিকার মতই সুদূরপরাহত।

শেখের পরে সৈয়দ। কিন্তু অদ্বিতীয় কাশিম সাহেবের কোনো মেয়ে টেয়ে আছে কিনা আমার জানা নেই। কাজেই, মোগল আর পাঠান—এই দুই রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করেই এখন আমাকে কাটাতে হবে। অবশ্যি, তুমি আর বেলুও রইলে। তোমরা যে এখানে আসবে সেটা আমি ধরেই নিচ্ছি—নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে হতাশ করবে না। আমার বিশ্বাস হয়।

তোমার সঙ্গে ছলনা করছি একথা যেন তুমি ভেবে বোসোনা। কেননা, আদৌ এটা আমার ছলনা নয়। তোমাকে আমি বিয়ে করব বলেছিলাম (যদি বলেই থাকি), সে-কথা আমি রাখতেই চাই। তবে একথাও ঠিক, কেবল তোমাকেই বিয়ে করব এমন কোনও কথাও আমি দিইনি। বেলুর বেলাও আমার সেই কথা। কারও কাছেই কথার খেলাপ করার আমার ইচ্ছা নয়, একথা আশাকরি এতক্ষণে তুমি বুঝতে পেরেছো।

উত্তরদানে সুখী কোরো। তোমার চিঠির ওপরে আমার নাম ঠিকানা ইংরেজিতে স্পষ্ট করে গোটা গোটা অক্ষরে লিখবে। পাকিস্তানের পিয়নরা চিঠি খুলে পড়ে না বটে, এখনও ততটা পাকা হয়নি, কিন্তু খামের ঠিকানা পড়তেই তাদের মাস খানেক লাগে।

আমার নামটা ঠিক ঠিক লিখো। কেননা আমার নামে আরেকজন

এখানে রয়েছেন—হয়তো বা তোমার চিঠি বেহাত হতে পারে। বন্ধু হলেও, পড়শীর মতন তিনি এমন পরশ্রীকাতর যে সে চিঠি আর এ হাতে না পৌঁছতেও পারে। তিনিও জামালুদ্দিন, পূর্বপাকিস্তানী বলেই আমার আশঙ্কা, কিন্তু তিনি হচ্ছেন খাঁ। আমি মিঞা জামাল উদ্দিন, আর তিনি জামাল উদ্দিন খাঁ। মনে রেখো যে আমি খাঁ নই। এখনও হতে পারিনি, তবে আমার চার ধারেই খাঁ খাঁ। তোমার বিহনেই, বলতে কি! আজ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, বিশেষ করে আরও বেশি সেটা মালুম হচ্ছে। ইতি—তোমার অজামিল। পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

পরাশর রোড, কলিকাতা,

রেখাদি, ১০ই শ্রাবণ

তোমার জবাব পেলাম। উপদেশে ভর্তি তোমার চিঠি, কিন্তু আসল কথাই তুমি এড়িয়ে গেছ। এক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত তার কিছুই তুমি জানাও নি। যাই হোক, জামাল মিঞার চিঠিখানি যে ফেরৎ পাঠিয়েছ সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। ইতি—

তোমার স্নেহের—যমুনা।

পরাশর রোড, কলিকাতা

প্রিয় জামাল, ১৩ই শ্রাবণ

তোমার চিঠির আর কী উত্তর দেব? আমি কোনোদিনই তোমাকে মানুষ বলে ভাবিনি। আর এখন তো স্পষ্ট করেই তা জানা গেল। তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমি তোমার বোরখাধারিণীদের সঙ্গে গিয়ে বাস করব তাহলে সেটা তোমার মস্ত

ভুল—তোমার আস্পর্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার চেয়ে ঢের ভালো লোক এখানে পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যারা কলকাতার রাস্তায় ঝাড়ু দেয় তারাও তোমার তুলনায় সৎপাত্র। নেহাৎ যদি বিয়ে করতেই হয়, বরং তাদের কাউকেই—আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। ইতি— তোমার—যমুনা।

পুনশ্চঃ, আমাকে আর চিঠি দিয়ে জ্বালিয়ো না।

৩৩।৩, কায়দে আজম অ্যাভিনিউ
করাচী—সতেরই আগষ্ট

দোস্ত জামাল খাঁ,

তুমি নাকি ঢাকা গেছ, তোমার বৌয়ের কাছেই জানা গেল। গেছ ভালই, কিন্তু আমার বৌকে নিয়ে যে গা-ঢাকা দেবে তা আমি ভাবতে পারিনি। অবশ্যি, গতকাল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্মরণীয় তারিখ গেছে, তাই ভেবে হয়ত আমার একটু সতর্ক থাকাই উচিত ছিল—কিন্তু কাকের মাংস কাকে খাবে তা কে জানত!

হপ্তাখানেক হোলো আমার পাঠানী স্ত্রীকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার শ্বশুর সাহেব—তার বাবামশাই—এখন গিলগিটে কিংবা বেহেস্তে—কোথায় যে বলা কঠিন। এদিকে তুমি আমার মোগোল বৌকে নিয়ে গোল পাকিয়েছ—কিন্তু করেছো ভালই! যাক গে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভাবলাম, খোদার কুদ্‌রতে মুক্তি পেলাম—ভালোই হোলো। সব বাঁধনই তো কেটেছে। এখন আল্লার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—চলে যাই হজে। বেমক্কা মার খাই কেন, মক্কা যাই। যদি বিস্‌মিল্লার মর্জি হয়, বিশজনের সঙ্গে তিনিই মিলাবেন। তিনিই তো মালিক!

কিন্তু তোমার বিবি—আমার পাঠান-সহধর্মিনীর ফুফি—তিনি বলছেন তার দরকার হবে না। তিনি নিজেই নাকি শেখের মেয়ে—আরব্যের আমদানি আসল শেখ বংশের। তাঁদের বংশগত শেক কাবাব রেঁধে খাইয়ে তিনি তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন।

তোফা—তিনি আর তাঁর কাবাব—দুই-ই। তাঁর দৌলতে, জরু অভাবেও বিশেষ জরুরি অবস্থায় আমায় পড়তে হয়নি। খানাপিনাও বেশ চলছে—দু'বেলাই—মন্দ হচ্ছে না নেহাৎ। সকালের নাস্তাও জুটছে, একেবারে নাস্তানাবুদ হতে হয়নি।

আমাকে অকস্মা মোগোলের একঘেয়েমি হাত থেকে উদ্ধার করে দোস্তের কাজই তুমি করেছো—এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ! এখন তুমি যদি চাও যে আমিও অনুরূপ তোমার প্রত্যুপকার করি তাহলে জানিয়ো। আর জানাবারই বা কী দরকার? তোমার উদাহরণই যথেষ্ট। ইতি—

তোমার দোস্ত—জামাল মিঞা।

আমার শিকারোক্তি

"তখন আমি করলাম কি, কোটের হাতায় মুড়ে আমার বাঁ হাতখানা তার গলার ভেতর পুরে দিলাম। কাজটা মোটেই সোজা নয়—মজার তো নয়ই। ধারালো দাঁতের কথা ভাবো একবার!···এদিকে সে যখন আমার বাঁ হাতখানা চিবুতে থাকলো, অকাতরেই—বলতে কি, আমি ডান হাত দিয়ে তার পাঁজরায় আমার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছি। ভালুকটা একবার একটা হেঁচ্‌কি তুললো, বেশ ডাকসাইটে হেঁচ্‌কি। তুলেই ব্যস্‌—আমার পায়ের তলায় ঢলে পড়লো—যাকে বলে, পতন আর মৃত্যু।···সেই ভালুকটার চামড়া এখনো আমরা বাড়ীতে টাঙিয়ে রেখেছি।" এত বলে বক্তা থামলেন।

পুরীর সমুদ্র-তটে এক হোটেলের একটা কামরায় বসে আমাদের গুল্‌তানি চলছিল। সামনের বড়ো জানালাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি উঁকি মারছে। তার ওপারে হৈমন্তিক সমুদ্রের অলস রোমন্থন। আর এদিকে, সমুদ্রপুরীতে তটস্থ হয়ে আমরা শুনছিলাম।

সন্ধ্যে হব হব। আবহাওয়াটা এম্‌নিই যে সহজেই মজলিস্‌ জমে ওঠে, সৌহার্দ গাঢ় হয়! তার ওপরে আরেক যোগাযোগ—একটু আশ্চর্যই বলতে হবে, আসরের সকলেই এক একটি শিকারী। তাঁদের বিবৃতি থেকেই ক্রমে ক্রমে সেটা বিস্তৃত হতে লাগলো।

ভালুক-শিকারীর একটু আগে আরেক জন সুরু করেছিলেন। শুকনো আমৃশির মতো চেহারা। মনে হয় যেন বহুৎ দিন ধরে রোদে টাঙিয়ে রেখে তাঁকে শুকোনো হয়েছে। রৌদ্রপক্ক সেই ভদ্রলোক বুনো-গণ্ডার শিকারের একটা গল্প আমাদের শোনালেন। মারি তো গণ্ডার, কথায় বলে। গণ্ডারটার আবার ভাণ্ডার লুঠ করার দিকে ঝোঁক ছিল। এক গেরস্তর গোয়ালে ঢুকে তার সযত্ন-পালিত গোরুদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটা—

"কতগুলি গোরু ?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

"তা এক গণ্ডার কম না।"

"গণ্ডারে গণ্ডারে ধুল পরিমাণ।" আমি বললাম। শুভঙ্করী কষে'।

"...জোচ্চোরটা গোরুদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে কেটে ড়ছে, এমন সময়ে..."

এমন সময়ে সেই অবশ্য-শিকার্য কাণ্ডটা ঘটলো। তিনিই টালেন। তাঁর ঘনঘটা শেষ হতে না হতেই আরেক জন সুরু করলেন। ইনিও বায়ুপরিবর্তকদের এক জন। দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট দেহ। পুরীর জল-হাওয়া এঁর শ্রীঅঙ্গের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারবে বলে বোধ হয় না। একবার নদীতে চান করতে গিয়ে তার তলদেশ থেকে আধ মণের বেশি ওজনের ঘুমন্ত এক কাছিমকে—কী প্রয়োজনে বলা যায় না—কি করে তিনি টেনে তুলেছিলেন তার কাহিনী।

এমনি চলছিলো—এক জনের পর আরেক জনের আরম্ভ—বর্ণনা আর আড়ম্বর। আর অবশেষে আড়ং ধোলাই। একটার পর একটা ধারাবাহিক শিকারের পালা। প্রত্যেক ঘটনাটাই নির্জলা সত্যি—

প্রত্যেকেই দিব্যি গেলে জানাচ্ছিলেন, এমন কি, যিনি জলের তলা থেকে কচ্ছপ আমদানি করেছিলেন তিনিও। কিন্তু সবাইকে টেক্কা মারলো আনাদের ভালুক-শিকারীর কেচ্ছা। ভূয়োদর্শী এক ভালুককে এক হাতে একলা কাবু করা চাট্টিখানি নয়।

আমরা হাঁ করে শুনছিলাম।

"অবাক কাণ্ড তো!" অজান্তেই কখন মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।

"আপনার বুঝি বিশ্বেস হচ্ছে না? ভালুকওয়ালা ফোঁস্ করে উঠলেন।

"না না, বিশ্বাস হবে না কেন? বিশ্বাস খুবই হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষাও হচ্ছে, বল্তে কি।" আমি বল্লাম।

"চাই সাহস—!" আমশিপানা চেহারা জানালেন: "সাহস আসে নিয়মিত ব্যায়াম করলে। নিয়মিত ব্যায়ামে যদি ব্যারাম না আসে তাহলে সাহস আসতে বাধ্য। সাহস আর মাস্ল্—দুই এক সঙ্গে আসবে। আর বাড়তে থাকবে—সাথে সাথেই।"

এই বলে তিনি শীর্ণ বক্ষস্থলে নিজের জীর্ণ হাতটা রাখলেন:—"আর ব্যায়ামের সেরা হচ্ছে বারবেল্ ভাঁজা। সেও কিছু কম শিকার নয়।"

"আমি অস্বীকার করি না।" সবিনয়ে জানালাম।

"শিকার করাও একটা মস্ত ব্যায়াম।" সেই কুর্ম-কীর্তিধ্বজ যোগ দিলেন: "আপনি কখনো শিকার টিকার করেছেন?"

"শিকার—না—ব্যায়াম? না মশাই, কোনোটাই নিয়মিত করবার সুযোগ পাইনি। তবে একবার—"

"বনবিড়াল-টিড়াল বোধহয়?" ভালুক-শিকারী চোখ মট্কালেন।

"না না, বনবেড়ালের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো—কী বলেন? বেড়াল, আরসোলা, নেংটি ইঁদুর—এরা ভয়ানক! ভারী মারাত্মক এরা। ওদের ত্রিসীমানায় আমি নেই—"

"তাহলে কী? মাছি-টাছি?"

"মাছি নয়, মাছও না। একটা বাঘ মাত্র।"

পালে যেন বাঘ পড়লো। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওরি করলো, বুঝি বা একটু বক্র দৃষ্টিতেই।

"বা—ঘ!" ভালুকধারীর বিস্ময় বাগ মানে না।

"কি করে বাঘালেন?" বল্লেন কূর্মবীর।—"আপনার নিশানা তো খুব ভালো বলতে হয়।"

"আমার নিশানা?" আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করি: "কিন্তু আমি তো বাঘটাকে গুলি করিনি। বন্দুকই ছিলো না আমার কাছে।" আমার নিশান অবনত করতে হোলো।

"তাহলে বাঘটাকে মারলেন কিসে?" আমশী ভদ্রলোককে বেশ রাগতই দেখা গেল।

"বাঘটাকে মেরেছি আমি বল্লাম কখন্? মোটেই মারিনি। বাঘ মারবো—আমি! আপনারা পাগল হয়েছেন? সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মারতে গেলে শুনেছি ওরা ভারী ক্ষেপে যায়, এমন কি, উলটে মেরে বসে—মারবার আগেই। না, মশাই, না। ওসব হঠকারিতায় আমি নেই। বাঘটাকে আমি জ্যান্ত পাকড়েছিলাম।"

"ও! একটা ব্যাঘ্র-শিশু! তাই বলুন!" কূর্ম অবতার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

"না মশাই, শিশু নয়, আস্ত বাঘ। সাবালক বাঘ। আসামের

জঙ্গলে পাকড়ে ছিলাম। আমি তখন কলকাতায় এক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করতাম—সেই সূত্রেই।"

"কী সূত্র বল্লেন?"

"খুব মজবুত সূত্র। কাগজটা ছিলো এক দেশমান্য নেতার। তিনি সভায়-টভায় বক্তৃতা করতেন, আর আমি তার বৃত্তান্ত ফলাও করে আমার কাগজে ছাপতাম—"

"দেশনেতা রাখুন, আগে আপনার বাঘের কথা হোক্—"

"অতো ব্যগ্র হচ্ছেন কেন? ক্রমেই সে কথা আস্ছে—"

"ক্রমে নয়, আগে। কি করে পাকড়ালেন বাঘটাকে—সে রহস্য দয়া করে একটু ফাঁস্ করবেন কি?" আসল কথায় আসবার ওদের ব্যাগ্রতা।

"কেন করব না? আপত্তি কিসের? এমন কিছু বাহাদুরির কাজ নয়। গল্প লেখার চেয়ে সোজা—এমন কি, সম্পাদকতা করার চাইতেও। আরে মশাই, যদি সম্ভব হোতো তাহলে আমি এই লেখক-গিরির পেশা ছেড়ে দিয়ে বাঘ ধরার নেশাতেই ভিড়ে যেতাম। কাজটা যেমন সোজা তেমনি মজার। কিন্তু হলে কি হবে, কলকাতার আশে-পাশে বাঘ মেলে না—এই দুঃখ!"

ঢোক গিলে ঢেঁকি গিলতে সুরু করি: "কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারব আমার বাঘ শিকার এমন কিছু কাণ্ড নয়। তেমন রোমাঞ্চকর ব্যাপারও না। আপনারা হয় তো ভাবছেন, আমার একখানা হাত বা পা, অযাচিত তার মুখের সামনে ধরে দিয়েছিলাম—মোটেই তা নয়।"

"দিলেও বাঘ তা মুখে তুলতে চাইতো কি না সন্দেহ। ওই তো

রোগা রোগা হাত-পা।" ভালুকমারের তরফ থেকে বাধা এলো। —"আর যাই হোক, বাঘেদের রুচি বলে' একটা বস্তু আছে।"

"ঠিক। আপনার মতো অতো চর্বি নেই আমার। বাঘ এগুলি চর্বিত চর্বণ করতে রাজি হোতো বলে আমিও মনে করি না। তাছাড়া, এই মুষ্টিমেয় হাত-পা বেহাত হতে দিতে আমার নিজের দিকেও আপত্তি ছিল। কাজেই ওসব হাতাহাতির ব্যাপারে না গিয়ে—যখন আপনারা শুনতেই চাচ্ছেন নেহাৎ, তখন খোলোসা করেই বলি···

"ঘটনাটা এই। আসামে গিয়ে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। লোকে প্রেমে পড়ে আসামী হয়—আদালতে দাঁড়ায়—আর আমি আসামী হয়ে প্রেমে পড়লাম···তা, ঐ একই কথা। আসামের মেয়ে নয়, বাঙালী মেয়ে—কিন্তু আসামী চেহারা। এরকম যোগাযোগ যদি কোথাও দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাদের প্রেমে না পড়া কদ্দূর কষ্টকর। অবশ্যি, পড়াটাও কিছু কম কষ্টের নয়। মানে, তাদের ছোঁয়াচটাই মারাত্মক। তাহলেও··· যাক্, যেকথা বলছিলাম। নারীদের বিষয়ে তখনো আমি খুব আনাড়ি। ঠিক এখনকার মতই। কিন্তু হলে কি হবে মশাই, মেয়েটি ছিলো অদ্ভুত—যেমন দেখতে তেমনি শুনতে। সারা-শিলঙে অমন মেয়ে আর একটাও ছিলো না। আর সারা সহরটা যেন তার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

"বিশেষ করে একটি ছোকরার ঝোঁক যেন একটু বেশি রকমেরই দেখা গেল। ছোকরা আবার শিকারী। বাঘ-টাগের পিছু পিছু দৌড়োনোই ছিলো তার বাতিক। তা দৌড়োক্, আমার কিছু যায়-

আসে না। কিন্তু দেখা গেল, সেও আমার মত সেই একমাত্র মেয়েটির পিছনে রয়েছে…”

“তার শিকারের ধারাটা কিরকম? আপনার মতই না কি?” শ্রোতাদের একজন জিগেস করলো।

“না। সেই সেকেলে ধরণের। সেই সনাতন কাল থেলে বাঘ শিকারের যে মামুলি কায়দা আছে তাই। সবাই মিলে তোড়জোড় করে বাঘ মারা। বাঘ মারার সমবায়-পদ্ধতি। এক দল লোক আগে গিয়ে জঙ্গলে মাচা বেঁধে আসে, গর্ত খুঁড়ে রাখে,—তার ওপরে জাল পেতে রাখা হয়। তার পর তারা চার ধার থেকে হট্টগোল করে বাঘটাকে তাড়া করে—তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায়-বসা শিকারী বাঘটাকে গুলি করে। কিম্বা বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে হাত-পা ভেঙে মারা পড়ে। গর্তের ভেতর আধমরা অবস্থাতেও তাকে বন্দুক দিয়ে মারা যায়,—মানে, ঠিক বন্দুক দিয়ে নয়, গুলি দিয়েই।

“তবে বাঘ এক এক সময়ে গোল করে বসে। ভুলক্রমে গর্তের মধ্যে না পড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে। তখন আর উপায় কি, বন্দুক দিয়েই মারতে হয়। বন্দুক, গুলি—কিল—ঘুষি—যা হাতের কাছে পাওয়া যায়। অবশ্যি কাছিয়ে এলে, বাঘ এসবের মারামারি গ্রাহ্যই করে না। উল্‌টে বিরক্ত হয়ে বন্দুকধারীকেই মেরে বসে। তবে কি না, পারৎপক্ষে বাঘকে সেরকমের সুযোগ দেয়া হয় না—দূরে থাকতেই তার মতলব গুলিয়ে দেয়া হয়।

“চলতি কায়দা হচ্ছে এই। পদ্ধতিটা যেমন সাবেক তেমনি অমানুষিক। আমার মতে মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়। এক দল

লোক মিলে চারধার থেকে চড়াও হয়ে একটা অসহায় বাঘকে ফাঁদে ফেলা বা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে এনে মায়াজালে জড়িত করা—তাকে শিকার না বলে শিকারের জালিয়াতি বল্লেই ঠিক হয়।

"অবশ্যি, জালে আগাপাশতলা জড়িয়ে পড়লে আখেরে বাঘটার ভালোই হয়ে থাকে। তাকে আর না মেরে—বেঁধে-ছেঁদে প্যাক্ করে পত্রপাঠ চিড়িয়াখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এবং ভেবে দেখলে আসামের জঙ্গলের চেয়ে আমাদের আলিপুর জায়গা মন্দ না। ড্যাম্পো নয়, মশা নেই, কালাজ্বর হবার ভয় কম, তাছাড়া নিখরচায় খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। কিন্তু জানোয়ারের মগজে কি এসব তত্ত্ব সহজে ঢোকে? হাড়-জংলী, বুঝতেই পারছেন!

"হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম।...শিলং শুদ্ধ সবাই আমরা মেয়েটার পিছু পিছু ঘুরতে লাগলাম। না, না—দল বেঁধে নয়। ফাঁক মতো। তাক্ মাফিক্। যে যার নিজের ফাঁকতালে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সকলেই খসে পড়লো। রয়ে গেল মোটে দু'জন। সেই বাঘশিকারী আর আমি।

"সেই বাঘমারির চালচলনে, বল্‌তে কি, আমি বেশ ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম। বাঘ-টাগের দিকেই ছোকরার বেশি ঝোঁক বলে শুনে ছিলাম। কিন্তু তাদের পিছনে না লেগে মেয়েটির আশে-পাশেই তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যেত।

"ছোকরা না কি দেখতে সুশ্রী ছিল। কাউকে কাউকে একথাও বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তো তার চেহারার ভেতর শ্রীছাঁদ কিছুই পাইনি। নানান্ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকিয়েছি—কিন্তু অতো তাক্ করেও আকৃষ্ট হবার মতো কিছুই আমার নজরে পড়েনি। কাঁধের

কাছটা ভয়ঙ্কর রকম চওড়া, চোয়াড়েদের যেমন হয়ে থাকে। ফর্সা রঙ, এতো ফর্সা যে পান্‌সে বলে মনে হয়। তার ওপর গাল দু'টো গোলাপী—হুবহু মেয়েলি টাইপের—যারপরনাই খারাপ। আর বড়ো বড়ো কালো কালো বিচ্ছিরি চোখ! দেখলেই গা যেন কেমন কেমন করে। অর্থাৎ সমস্ত মিলিয়ে যদ্দূর নোংরা হতে হয়। কিন্তু আর সবার মতে সেই গুলিই ছিলো না কি তার বড়ো রকমের গুণ। এছাড়াও সে গুন-গুন করে গান গাইতে পারতো।

"আর আমার গুণের মধ্যে ছিল আমার সাংবাদিকসুলভ সর্বজ্ঞতা। সেই কাল্‌চার যার চারা নেই—যার আজ চাড় সব চেয়ে বেশি। আমার কৃষ্টি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গী। এছাড়াও, আমার গল্প লেখবার এবং তার ও আরো, গল্প করবার ক্ষমতা। ঠিকমতো জায়গায় যুতসই কথাটা বসাতে আমি মজবুত ছিলাম। কথার প্যাঁচে মারা আর মার প্যাঁচের কথায় আমার বাহাদুরি ছিলো অবিসংবাদিত। তাছাড়া, সংবাদিত বিষয়েও আমার জোড়া মিলত না। নিউটনের আপেল পড়ার ব্যাপারে আমি আলোচনা চালাতে পারতাম। জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে উপল কুড়োতে গিয়ে কি ভাবে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং কেবল নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়েই ঝুরি ভরেছেন

তা আমার অজানা ছিল না। আইন্‌ষ্টাইন যে আইনজীবী নন্‌, আইন কানুনের ধারে কাছেও না, একথাও আমার জানা ছিল। কি করে সমুদ্রের মোহনায় পলি পড়ে ব-দ্বীপ গজায় তার রহস্য ব্যক্ত করে শ্রোতাদের থ করে দেয়া আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। এক্স্‌ রে, অমিট্‌ রে এবং প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধেও বেশ দু' কথা আমি সবাইকে শুনিয়ে দিতে পারতাম।

"এবং এই ভাবেই আমাদের দু'জনের রেষারেষি চল্‌ছিল। নিজের নিজের ধারায়। তার গালের আপেলের বিরুদ্ধে আমার নিউটনী আপেল, তার মোহ: চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার মোহনাময় ব-দ্বীপ। সে গুন্‌ গুন্‌ করে গান শুনিয়ে যাবার পরেই আমি দেশ-নেতার গরম বক্তৃতার গন্‌...নে একখানা ছেড়ে দিতাম। তার গুঞ্জনের পরেই আমার গঞ্জনা। এই ভাবেই চলছিল। মোটের ওপর, দু'জনের কেউই কাউকে আমরা টেক্কা দিতে পারছিলাম

না। আর মেয়েটিও, আমাদের কার ওপরে যে তার আন্ত্রিক টান, হাব-ভাবে তার বিন্দু-বিসর্গও জানান্ দিত না।

"চল ছলো এম্'ন। এমন সময়ে আরেক ব্যক্তি এসে হানা দিলো। তার উপস্থিতিতে চিরন্তন ত্রয়ীর আমাদের চলৃতি ত্রিভুজ চ্যাপ্‌টা হয়ে চার কোণা হয়ে দাঁড়ালো! এই অভিব্যক্তিটি এক বাঘ।

"প্রকাণ্ড এক বাঘ। কোথ্ থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সহরতলীতে এসে হাজির হোলো কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তার জ্বালায় মশাই, গোরু-বাছুর নিয়ে কারু ঘর করা দায় হোলো। মাঝে মাঝে সে সহরের এলাকাতেও টহল দিতে আসত। হাওয়া খেতেই বোধহয়, কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার অরুচি ছিল না। একবার এক মনোহারী দোকানের সব কিছু সাফ্ করে নিয়ে গেল। আরেক বার এক গ্রামোফোনের দোকান ফাঁক করলো। একবার এক সন্দেশওলাকে সাবাড় করলো—তার সন্দেশ-সমেত। সন্দেশের দোকানীকে পরে অবশ্যি পাওয়া গেছ্‌ল—একটু বেহুঁস অবস্থায়—বেপাড়ার এক মদের দোকানে। কিন্তু সন্দেশগুলো আর পাওয়া গেল না। তারপর এক জনের লাউডস্পীকার নিয়ে উধাও হোলো একদিন। কিন্তু লাউড-স্পীকারে বাঘের কী দরকার—হ্যাঁ, মশাই? ও-জিনিষ বাঘা বাঘা নেতার বক্তৃতায় লাগলেও বাঘের ওতে কী প্রয়োজন? ওদের পার্টস্ অব্ স্পীচ্ তো এমনিই খুব জোরালো বলে শোনা যায়।

"বাঘের দুর্ব্যবহার বাড়তেই লাগলো দিনকের দিন। একদা সকালে সহরের একটি স্মার্ট মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না—সেই সঙ্গে কলেজী এক ছোকরাকেও—নিঃসন্দেহ সেই বাঘের কাজ। ক্রমে

সেখানকার যত কিছু ক্রাইম্ আর কেলেঙ্কারি—যার কিনারা হোতো না—সবই অবশেষে সেই বাঘে গিয়ে বর্তাতে লাগলো। সেই অঞ্চলের চোর, ডাকাত, দালাল আর ঘটক—এবং সন্দেশখোর—এদের সকলের কর্তব্যের গুরু ভার—সেই বাঘ একলা নিজের ঘাড়ে একাধারে বহন করছিলো। কী রকম ভয়ঙ্কর বাঘ ভাবুন একবার!

"বাঘ-শিকারী আমার সরিকটিও তার খর্পর থেকে রেহাই পাননি, তার গোড়ালির খানিকটা সেই বাঘের খাবার মধ্যে চলে গেছ্‌ল, সেই সঙ্গে, তার নতুন গগল্‌সের চশমাটাও। যৎসামান্য ওই দু'টি জিনিস হাতিয়েই সে অমন কীর্তিমান্ একটা লোককে কেন ছেড়ে দিল তা বুঝতে আমি অক্ষম। তাহলেও এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করবার সুযোগ আমি ছাড়লাম না। তাকে বেশ এক হাত নিলাম। মেয়েটির সামনেই তাকে যদ্দূর পারি খেলো করে দিলাম।

"ফলে আমাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল। রাগের মাথায় আমি বলে বসলাম, আমি হলে কখনই বাঘকে আমার গোড়ালি গছিয়ে পালিয়ে আসতাম না। গোড়াতেই তাকে পাকড়ে আনতাম। এমন কি, দরকার হলে, যদিও আমি কঙ্করসিক এবং অহিংস-নীতির ভক্ত, বাঘটাকে মেরে ফেলাও আমার পক্ষে কিছু শক্ত ছিল না।

"বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, জনৈক বুদ্ধিজীবি বাঙালী সাংবাদিকের কাছে এ কাজ এমন কি কঠিন? প্রত্যহ কতো রাজা উজীরকেই তো আমরা মারছি—বলে, অমন ব্রিটিশ সিংহকেই ঘায়েল্ করে ছেড়ে দিলাম! একটা বাঘ মারব, তার আবার কি! নেহাৎ ছেলেখেলা বই তো না!

"আমার এই কথার পরে যা হবার তাই হোলো। মেয়েটি বলে বসলো, আমাদের দু'জনের যে বাঘটাকে মেরে শিলঙের সবাইকে বাঁচাতে পারবে, বুঝতে হবে সেই তাকে সত্যিকারের ভালোবাসে। আর তার গলাতেই সে মালা দেবে।

"তার এই কথায় আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। চাঁদ এবং বাঘ। ঠিক করলাম সেই রাত্রেই বাঘটাকে পাকড়াতে হবে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফ্যালে বা বাঘটা নিজেই আত্ম-হত্যা করে বসে—এমন দাঁওটা ফস্‌কে যায়—সেই ভয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা আমি সমীচীন বোধ করলাম না। তক্ষুনি চলে গেলাম—আহা! আপনাকে ঠাকুর ডাকছে যে! রান্না-ঘরে আপনার জলখাবার দেয়া হয়েছে, শুনতে পাচ্ছেন না?"

"চুলোয় যাক্ খাবার।" জবাব দিলেন ভালুক-শিকারী: "পরে খাব'খন। বাঘের কী হোলো শুনি আগে?"

"হ্যাঁ। আমার পাল্লাদার তো লোক-লস্কর জোটাতে বেরিয়ে পড়লো। তক্ষুনি তক্ষুনি। সেই গর্ত খোঁড়া, ফাঁদ পাতা, জালাঞ্জলি, —সেই সব সেকেলে কায়দা-কানুন! তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আর আমি সোজা চলে গেলাম মাংসের দোকানে—সদ্যনিহত আস্ত একটা পাঁঠার যোগাড় করতে। তার পরে গেলাম এক দাবাইখানায়। সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে কন্‌সাল্ট্ করে ঘুমের ওষুধ যোগাড় করলাম। এক পাউণ্ড লুমিনল, এক পাউণ্ড ভারনল, আর এক পাউণ্ড ব্রোমুরাল কিনে সমস্ত সেই পাঁঠার কুক্ষিগত করে জঙ্গল আর সহরতলীর সঙ্গমস্থলে গেলাম। নদীর ধারে বাঘটার জলখাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম পাঁঠাটাকে। তার পর বাসায়

ফিরে আমার সাংবাদিকতা নিয়ে পড়লাম। নেতৃবরের সেদিনকার বক্তৃতার রিপোর্ট লেখা বাকী ছিল তখনো।”

“নেতা রাখুন, বাঘের কী হোলো বলুন আগে।” হাঁ হাঁ করে উঠলো সবাই।

“বলছি তো। ভোর না হতেই একটা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে সেই সঙ্গমস্থলে আমি গেলাম। বাঘের জলযোগের জায়গায়। গিয়ে দেখি, অপূর্ব দৃশ্য! ছাগলটার শুধু হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন আমাদের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল! গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। রাত্রে যারা চৌকি দেয় তেমন কোনো পাহারা-ওলাও এমন ঘুম বুঝি কখনো ঘুমোয়নি। দেখে আমার যা আনন্দ হোলো তা বুঝতেই পারছেন। তক্ষুনি আমি জানোয়ারটার হাত-পা-মুখ—আগাপাশতলা বেঁধে ফেললাম।...”

“বেঁধে ফেললেন?” সবাই হাঁ।

“হ্যাঁ, বেঁধেই তো ফেলব।” আমিও 'অবাক্ না হয়ে পারি না: “কেন, বাঁধবো না কেন?”

“বাঁধবার সময় বাঘটা হঠাৎ জেগে উঠলো না?”

“সত্যি বলতে, এক-আধটু যে নড়ে চড়েনি, তা নয়। হাই তুলবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তক্ষুনি আমার পকেটে যে মোটা খাতা ছিলো—যাতে নেতাদের বক্তৃতার নোট নিতাম—তাই দিয়ে তার মাথায় বেশ এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি। আর যেমন চোট্ খাওয়া অমনি ঠাণ্ডা।”

“নোট-বইয়ের ঘা খেয়ে—বলেন কি মশাই?”

“হবে না? বই ভর্তি ছিলো কী? তার পাতায় পাতায় উদ্দীপনা-